Sanskritir Bela-Abela

প্রথম প্রকাশ : ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক : চন্দনা ঘোষ

মুদ্রণ : গীতা প্রিন্টার্স
২১ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : শমীন্দ্র ভৌমিক

অগ্রজ প্রণব রঞ্জনকে—যিনি আশৈশব

আমার প্রেরণা

সূচি

সঙ্গীত

চলচ্চিত্র

নাটক

সাহিত্য

প্রাক্‌কথন

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও প্রাপ্তমনস্ক হয়, এমন একটা বোধ নিরেট দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে এখন। ক্রান্তিকাল কিংবা নিরীক্ষার সময়ের মত কৈফিয়তের পলেস্তারা প্রায়শই চাপানো হচ্ছে সে জীর্ণ দেওয়ালে। কিন্তু নিষ্ঠুর সত্য এই যে, সংস্কৃতি এখন নিছকই পণ্য কিংবা পিন আটকে যাওয়া রেকর্ডের মত একঘেয়ে বক্তৃতা—এখন বড়ো সুসময় নয়।

সহৃদয় পাঠক যেন ভেবে না বসেন, সেই দুঃসময়ের গ্লানি ঘোচাতে এই প্রবন্ধনিচয়ের সমাবেশ। আপন অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত এই প্রবন্ধগুলি সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েছে মাত্র। গত পাঁচ-ছ'বছরে এরা নন্দন, যুবমানস, গ্রুপ থিয়েটার, সপ্তপর্ণী, বৈঁচি প্রমুখ নামী-অনামী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে যাবার মত ঘটনা ঘটে নি। তবে সংস্কৃতি-মনস্ক কিছু মানুষ অপরিমিত উৎসাহ দিয়েছেন। উৎসাহ থেকে প্রশ্রয় এবং সেই প্রশ্রয়ের ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ প্রকাশ যার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব শ্যামল মৈত্র, সমর ঘোষ, বীরেন ঘোষ, আর্ণবিকা গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের। 'গীতা প্রিন্টার্সের' অরুণ আর তাঁর সহযোগীরা অক্লান্ত যত্ন-পরিশ্রমে গ্রন্থটির অবয়ব নির্মাণ করেছেন; ছাপা নির্ভুল এমন দাবি করার স্পর্ধা নেই, তবে এঁদের প্রয়াস যথার্থই আন্তরিক।

প্রশ্রয়দাতার তালিকায় সর্বপ্রথম নামটি অবশ্যই আমার দাদা প্রণব মুখোপাধ্যায়ের। অনুনয় চট্টোপাধ্যায় শুধু সস্নেহ প্রশ্রয়ই নয়, গ্রন্থটির নামকরণ পর্যন্ত করে দিয়েছেন। স্নেহাস্পদ শমীন্দ্র ভৌমিক সোৎসাহে এঁকেছেন প্রচ্ছদ এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন গ্রন্থটির ভূমিকা। এ ছাড়াও আছেন অপূর্ব ঘোষ, মঞ্জু সরকার, অংশু শূর, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ দাস প্রমুখ। সব মিলিয়ে এক হার্দ্য সহযোগিতার বাতাবরণে আমার প্রথম গ্রন্থ 'সংস্কৃতির বেলা-অবেলা' প্রকাশিত হল আমার একমাত্র কন্যা সুচেতনার জন্মদিনে।

গ্রন্থটি হয়ত বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে না, কিন্তু আমার জীবনে এটি একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। প্রবন্ধগুলি পড়ে কেউ কেউ আমাকে অসহিষ্ণু বলেছেন। আমরা যারা এখনকার, তারা যা চাই, তা এখনই চাই। না পেলেই অসহিষ্ণু ক্রোধে ফেটে পড়ি, এমন অভিযোগ উঠতে পারে। অসহিষ্ণুতা প্রাজ্ঞের লক্ষণ নয়। কাজেই সে অভিযোগে দায়বদ্ধ হতে আমার আপত্তি নেই। প্রবন্ধগুলি বিষয়ানুসারে নয়, প্রকাশকাল অনুযায়ী গ্রন্থিত হয়েছে। বিষয়গত সমতা রেখে যাতে পড়তে সুবিধা হয়, সে জন্য সূচিটি বিষয়ানুগ করা হল।

গ্রন্থটি বর্তমান সাংস্কৃতিক ধারার মূল্যায়নে পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করে তুলবে এমন অহংবোধ আমার নেই। কিছুটা আগ্রহও যদি সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে আমাদের সকলের পরিশ্রম সার্থক হবে। ফলবতী হবে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহদানের পরিকল্পনাও। নমস্কার।

ভূমিকা

'সংস্কৃতির বেলা-অবেলা'—গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থের নামটি দিয়েছেন বড় সুন্দর। সব ব্যাপারেই বেলা গড়িয়ে অবেলা দেখা দেয়। শুভ লগ্ন যদি বা আসে, অচিরে লগ্ন যায় পেরিয়ে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও তাই ঘটেছে। আজকের সমাজে যে কটি জিনিস সংস্কৃতির বাহন বা মাধ্যম হিসাবে পরিচিত—সংগীত, সাহিত্য, নাট্যকলা, চলচ্চিত্র—সব কটিই বলতে গেলে আজ ব্যাধিগ্রস্ত। অথচ ইদানীং কালে যুগোপযোগী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কখনো সংঘ-বদ্ধ প্রয়াসে, কখনো ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রসাদে সংগীতে নাট্যে চলচ্চিত্রে কিছু শুভ সূচনা, কিছু দুঃসাহসিক পরীক্ষা নিরীক্ষা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সে সব প্রচেষ্টা স্থায়ী হয় নি; কেন হয় নি, সেই গুরুতর বিষয়টি নিয়ে গ্রন্থকার মানস মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে অতিশয় যুক্তিপূর্ণ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। দেখে বিস্মিত হয়েছি যে সংগীত সাহিত্য নাট্যকলা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান বিশেষজ্ঞের তুল্য, অধ্যয়নও বহু বিস্তীর্ণ। খুব আনন্দের কথা যে তিনি তাঁর আলোচনা বঙ্গদেশের সীমানায় আবদ্ধ রাখেন নি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংগীতে সাহিত্যে রঙ্গমঞ্চে চলচ্চিত্রে কোথায় কি হচ্ছে তার সর্বশেষ সংবাদটিও তাঁর অজানা নয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে সব কিছু দেখেছেন; যথার্থ সচেতন মন নিয়ে দোষ গুণের পর্যালোচনা করেছেন।

সমাজ জীবনের সংস্কার সাধনই সংস্কৃতির উদ্দেশ্য। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তার সংস্কৃতি তাকে সমাজ জীবনে তার প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন রাখবে; অপর পক্ষে সমাজের প্রতি নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে তাকে অবহিত করবে। আমাদের সংস্কৃতির বাহন ক'টি খুব সার্থক ভাবে সে কর্তব্য সম্পাদন করছে কিনা সে বিষয়ে গ্রন্থকার সন্দিহান। কেন না, কোনটিরই কাজে বাঁধুনি নেই। সিনেমা থিয়েটারে সংগীত রচনা করেন একজন, সুর যোজনা করেন আরেকজন। সে সংগীতে প্রাণ থাকে না। সিনেমায় নির্দেশনা একের, প্রযোজনা অপরের—তাতেও ঠিক মেলবন্ধন হয় না; আমরা কথায় বলি, যার কর্ম তারে সাজে, কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায়, যাকে সাজে না, কাজ এসে যায় তারই হাতে। সমস্তই মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর হাতে চলে যাচ্ছে। নাটক চলচ্চিত্র এমন কি সংগীতও ব্যবসায়ীর পণ্যে পরিণত হয়েছে। স্থূল এবং সস্তা প্রমোদের পসরা নিয়ে সংস্কৃতির মাধ্যম ক'টি হয়েছে রুচি বিকারের মাধ্যম। মুনাফাখোরের মন গড়া যুক্তি—কি করব বলুন, যেমন চাহিদা তেমনটি তো করতে হবে। কিন্তু চাহিদাটি যে প্রকারান্তরে এদেরই সৃষ্টি সে কথাটি সমাজে ক'জন ভেবে দেখেছেন? নাটক সিনেমার কাহিনীতে অন্যায় উৎপীড়নের চিত্র আছে, গণ বিক্ষোভের দৃশ্য আছে, শেষ পর্যন্ত শ্রেণী সংগ্রামও আছে। কিন্তু কি করে বিক্ষোভের সৃষ্টি হল, মানুষের মন জাগল কিভাবে, সংগ্রামের শক্তিটা পেল কোথায়—অর্থাৎ সব চাইতে জরুরী কথাটা—জনমনের প্রস্তুতির কাহিনীটিই থেকে যায় অজানা। সেজন্যে সংগ্রামটা মনে হয় যেন একটা রেডিমেড জিনিস, স্বতঃস্ফূর্ত নয়। কাহিনী-রচয়িতার মনে যদি কনভিকশান বা প্রত্যয়ের জোর না থাকে তাহলে কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। আনন্দের কথা যে গ্রন্থকার সর্ব বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সংগে ব্যক্ত করেছেন।

গ্রন্থের দুটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুটিই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত—একটি 'রবীন্দ্র সংগীত ও শিল্পীর স্বাধীনতা', অপরটি 'চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ'। সংগীত এবং সিনেমা—দু'বিষয়েই আমি আনাড়ি, কাজেই বিশেষজ্ঞের মতামত আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান। গ্রন্থকার সংগীতের সমঝদার, সংগীত বিষয়ে তাঁর মতামত শ্রদ্ধার সংগে বিবেচ্য। চলচ্চিত্র সম্পর্কেও তাঁর মতামত নির্ভরযোগ্য কেন না, দেশের বিদেশের বহু চলচ্চিত্র শুধু চোখে দেখেন নি, মন দিয়ে চেখে দেখেছেন।

সংগীত বিষয়ক প্রশ্নটি বহু কালের বিতর্কিত বিষয়। ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং দিলীপ রায় প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন বহু পূর্বে। কবির

সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁদের সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। চূড়ান্ত মীমাংসা কিছু হয় নি, হয়ে থাকলেও সেটা খুব সুস্পষ্ট নয়। ফলে অভিযোগটা আগে যা ছিল এখনও তাই আছে—শিল্পীরা স্বরলিপির স্ট্রেট জ্যাকেটে বাঁধা পড়েছেন। বেশির ভাগ গানই স্বরলিপির কপি-বুক অনুবর্তন। শুনলে মনে হয় গানটা কণ্ঠস্থ, কণ্ঠ থেকে স্বতঃ উৎসারিত নয়। এ জাতীয় গান শুনে শ্রোতারা তৃপ্তি পাচ্ছেন না, এ অভিযোগ উড়িয়ে দেবার নয়। তবে এখানে একটি কথা বলবার আছে। শিল্পীর স্বাধীনতা কথাটাও খুব স্পষ্ট নয়। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুচিত্রা মিত্রকে একই গান গাইতে দিন। দুজনেই স্বরলিপি অনুসরণ করেই গাইবেন কিন্তু দেখা যাবে দুটি গান সমান শ্রুতিমধুর হয়েও একটি অপরটির সম্পূর্ণ অনুরূপ নয়, কেন না উভয় শিল্পীরই নিজস্বতা তাতে প্রকাশ পেয়েছে। স্বীকার করতে হবে যে দুজনেই স্বাধীন ভাবে গান করেছেন। তাহলে স্বাধীনতাটা কোথায়? স্বাধীনতা শিল্পীর কণ্ঠে। স্বরলিপি শিল্পীর স্বাধীনতা হরণ করে না, সে তাকে সাহায্য করে। গানের কাঠামোটি শুধু তৈরি করে দিয়েছে, তাতে প্রাণ সঞ্চার করবে শিল্পীকণ্ঠের যাদু। বলে রাখা ভালো, এ ব্যাপারে আমার কোন শুচিবাই নেই। যিনি প্রতিভাবান সুরশিল্পী তিনি স্বরলিপির এক আধটা ব্যত্যয় করলেও সুরকে কখনো বিকৃত করবেন না। দেবব্রত বিশ্বাসের ন্যায় যথার্থ শিল্পী অযথা অতিরিক্ত কিছু করতে পারেন না, তাঁর শিল্পবোধই তাঁকে সংযত রাখে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশ্বভারতীর সম্পত্তি, কিন্তু সমগ্র বাঙালি জাতির সম্পদ। সে সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব সকল বাঙালির। মানসবাবু যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তাও এই দায়িত্ববোধেরই পরিচায়ক। এটি সুলক্ষণ, যত বেশি আলোচনা হয় ততই ভালো। রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি লোকের আগ্রহ বাড়বে। এ ব্যাপারে আমার একটি মাত্র কথা বলবার আছে। সেটি হল, রবীন্দ্রসঙ্গীতটা যেন রবীন্দ্রসঙ্গীত থাকে। তাকে যেন রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে চেনা যায়। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, কথাগুলো শুনলে মনে হয় গানটা আমারই, কিন্তু গানটা শুনলে মনে হয়না আমার গান। দেখতে হবে, এ দুর্দৈব যেন না ঘটে। রবীন্দ্রসংগীতের একটা বিশেষ চরিত্র আছে। সে চরিত্রটা কি, কোথায় এর বৈশিষ্ট্য—এ ভাবনাটা মনে রাখতে হবে।

'চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি তথ্য-সমৃদ্ধ। লেখক বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন যা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। সিনেমা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কতখানি ঔৎসুক্য ছিল এবং সিনেমা শিল্প সম্বন্ধে কি ভেবেছেন, কি বলেছেন সে বিবরণ

অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। ভারতীয় সিনেমা রবীন্দ্র উপকরণ কতখানি কাজে লাগিয়েছে, তাঁর কোন্ কোন্ কাহিনীচিত্র তিনি জীবদ্দশায় দেখে গিয়েছেন, সে সব ছবি সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন কিনা, এ সব জানবার আগ্রহ আমাদের সকলের মনেই আছে। কবির মৃত্যুর পরে রবীন্দ্র কাহিনী নিয়ে বহু ছবি নির্মিত হয়েছে। সে সব ছবির কথা এবং সত্যজিৎ রায় প্রমুখ যশস্বী পরিচালকরা ঐ সব ছবি নির্মাণে কে কতখানি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, সে রোমাঞ্চকর ইতিহাস গ্রন্থকার আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। রচনাটি অনেকের কাছেই উপভোগ্য মনে হবে এবং সেই সঙ্গে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যও জানা হয়ে যাবে।

গ্রন্থটি পাঠ করে আমি লাভবান হয়েছি। লেখক ভাবতে জানেন এবং তারও চাইতে বড় কথা অপরকে ভাবাতে জানেন। মানসবাবু বয়সে নবীন কিন্তু আমার ন্যায় অতি প্রবীণকেও তিনি লজ্জা দিয়েছেন। আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের অধিকাংশ যাঁরা জেগে ঘুমোন এবং বহু ব্যাপারেই উদাসীন, আমি তাঁদেরই একজন। গ্রন্থকার যেসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন সেসব বিষয়ে আমার ভাবনাচিন্তা ছিল নিতান্তই এ্যামেচার সুলভ। গ্রন্থটি পাঠ করলে আমার ন্যায় বহু পাঠকেরই মন একটু সচকিত হবে; চাই কি, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে একটু প্রাণসঞ্চারও হতে পারে। গ্রন্থকারকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। তাঁর সুলিখিত গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আজকের জনযন্দ্ধ আনবে দ্বিতীয় স্বাধীনতা

গণসঙ্গীত : আজকের প্রেক্ষাপটে

নাচ, গান এবং বাজনার সমাহারই হচ্ছে সঙ্গীত—ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা জানিয়েছেন। সংজ্ঞাটি মেনে নিতে দ্বিধা থাকার কথা নয়। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বড়মাপের মনীষীই জনজীবনে সঙ্গীতের অসীম প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্লেটো সঙ্গীতের মধ্যে আত্মার সন্ধান করেছেন, সেক্সপীয়র জীবনের, রলাঁ যুক্তিগ্রাহ্যতার, রবীন্দ্রনাথ মহৎ প্রেম এবং ঈশ্বরের। মার্কসীয় চিন্তাবিদেরা স্বভাবতই সঙ্গীতের মধ্যে খুঁজে পেতে চেয়েছেন সাধারণ্যের সংগ্রামী জীবনের উদ্দীপনা-প্রেরণাকে। অতএব প্রায় প্রতিটি বিষয়ে যেমন, এখানেও তিনটি মতবাদ প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে—একটি স্পষ্টতই সেই শিবিরের যাঁরা মনে করেন শিল্পীর কোনো সামাজিক দায়িত্ব নেই—শিল্প শিল্পের জন্যই। আরেকটি সেই শিবিরের যাঁরা মনে করেন শিল্প এবং সমাজ কখনই বিচ্ছিন্ন নয়,

শিল্পীরই দায়িত্ব হচ্ছে সমাজকে উজ্জীবিত করার, সুস্থ জীবনবোধ ও পরিমণ্ডল গড়ে তোলবার। তৃতীয় যে মতবাদ, সেটি স্পষ্টতই ঐ দুটি মতবাদের একটি সমাহার—এঁরা শিল্পীর দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েও নিজেদের একধরনের দুর্বোধ্যতার আবরণে জড়িয়ে রাখেন, ফলস্বরূপ বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত মহলে এঁদের কদর অত্যন্ত বেশি, কিন্তু আপামর জনসাধারণ এঁদের শিল্পকর্ম সম্বন্ধে প্রায়শই অজ্ঞ ও নিরুৎসাহ থেকে যান। বঙ্গ তথা ভারতীয় সংস্কৃতির গবেষক যাঁরা তাঁরা সংগীত বিষয়ক আলোচনায় ততটা সরব নন—সাহিত্য-নাটক-সিনেমা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে ইদানিং, সংগীত নিয়ে খুবই কম। অথচ সংগীতোৎসবেরও ঘাটতি নেই। এই যে অবস্থাটা এটি কোনক্রমেই একটি দেশ বা জাতির সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক নয়। বোধহয় এর কারণ দুটি: এক, সাহিত্য-সিনেমা-নাটকের মত সংগীত ফ্ল্যাট কোনো ব্যাপার নয়, এতে চট্‌জলদি ওস্তাদ হয়ে ওঠা সম্ভবও নয়। দুই, হাস্যকর একটি চিন্তা, —সংগীত পরিবেশনের জন্য এবং শোনবার জন্য। এর জন্য কোনো আলোচনার গবেষণার আবশ্যক নেই, আরো পরিষ্কার করে বললে—সংগীত হচ্ছে ভাবের বিষয়, ভাবনার নয়। আমাদের সমাজতত্ত্ববিদেরাও এ বিষয়ে সমান উদাসীন—তাঁদের বিশ্বাসই নেই যে একটি দেশ এবং জাতির সাংস্কৃতিক চেতনা এবং উপলব্ধির গোপনতম অংশটি লুকিয়ে আছে সংগীতেরই মধ্যে। এত ব্যাপক প্রভাব আর কোন শিল্পের আছে? মাঠেঘাটে পথেপ্রান্তরে হাটেবাজারে নিরক্ষরেসাক্ষরে—সংগীত সর্বত্রই। অথচ রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে এলিটিয় লেকচার, মার্গসংগীতের ওপর খানকয়েক শিক্ষার্থীদের জন্য বই এবং লোকসংগীতের ওপর কেবলই ডক্টরেট হবার লোভে ন্যূনতম কিছু থিসিস্—এই হচ্ছে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং জনপ্রিয় শিল্প সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা গবেষণার সম্পদ।

॥ দুই ॥

ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতেই নানান শ্রেণীর সংগীতের মধ্যে গণসংগীতের দ্রুত জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি সংশয় এবং সন্দেহ দুই-ই জাগায়। কেননা অন্যান্য সাংগীতিক শ্রেণীচরিত্রের সংগে কেবলমাত্র লোকসংগীতই এর কাছাকাছি আসে—বাকি সবই হচ্ছে খ্যাতনামা হবার বাসনায়, বাজারী পত্রপত্রিকার সান্নিধ্য পাবার কামনায় এবং ধনী হবার লোলুপ ঈপ্সায় এক ধরনের নেশার মতন, ব্যতিক্রম শুধু মার্গীয় শিল্পীরা যাঁদের অনেকেই মনে করেন, সংগীত শুধু সাধনার বিষয়। দীর্ঘ সাধনার পর তাঁরা সংগীত জগতে অমর হয়ে থাকেন। এরও তীব্র ব্যতিক্রম

ঘটেছে এদেশে এখন—তাই আমেরিকার সাহেবসুবোরা রবি-আকবরের স্কুলে ভারতীয় গানবাজনা শেখেন—এদেশের তরুণরা সে সুযোগ পাচ্ছে কই ? সেখানেও সেই অর্থলিপ্সাই প্রধান।

সে যাক। আমরা বলেছি লোকসংগীতের সংগেই গণসংগীতের সাযুজ্য আছে। খেটেখাওয়া মানুষের নিত্যসাথী যে গান মাঠেঘাটে নিত্যই রচিত হচ্ছে স্বপ্রেরণায়—সরল স্বাভাবিক সে সংগীতই লোকসংগীত, তাই মাঝিমাল্লার গান আছে, আছে কামার-কুমোরের গান, আছে চাষীর গান। লোকসংগীত মূলতঃ শ্রুতিশ্রেণীর—মৌখিক রচিত এবং প্রচারিত—ফলে এর কোনো অনমনীয়তা বা শৃংখলাবদ্ধ রূপ নেই। লোকসংগীতের প্রাণশক্তি হচ্ছে এই শ্রুতি এবং প্রবহমানতা। এর মজা আরও—এর কোন অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকে না। এর সুর তাল লয় সম্পর্কে সম্যক জানবার কোন সুনির্দিষ্ট প্রণালীও নেই। তাই যখন গ্রামীণ প্রাধান্য অবলুপ্ত হল, তখন এগুলো রক্ষা করবার জন্য কোন ইনস্টিটিউশ্যনাল প্রণালীও রপ্ত করা যায় নি। (প্রসংগত বলা ভাল: বামফ্রন্ট সরকার ফোক কালচার ইনস্টিটিউটের ব্যাপারে বেশ উৎসাহ দেখাচ্ছেন।) হালে এ রকম দু একটি ইনস্টিটিউশ্যনাল উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। শুভ সংবাদ অবশ্যই। এই যে লোকসংগীত—এক অর্থে গণসংগীতের পূর্বসূরী হচ্ছে সেই। কেন না গণসংগীত খেটেখাওয়া মানুষের সংগ্রামের সাথী শুধু নয়—জীবনসংগ্রামে শোষিত শ্রেণীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পাথেয়ও জোগায় সে। আরো সরল করে বললে বলা যায়—শ্রেণীসংগ্রামের যে সাংগীতিক হাতিয়ার শোষিত মানুষের হাতে আছে তাই গণসংগীত। আবার শুধু এটুকু বললেও গণসংগীতের চরিত্র সম্পূর্ণ হয় না—এর বৈশিষ্ট্যই হল আন্তর্জাতিকতা-বোধ। আন্তর্জাতিক না হলে তা' গণসংগীতই নয়।

লোকসংগীতের সংগে আন্তর্জাতিকতাবোধ যুক্ত হয়ে যে সংগীতের সৃষ্টি তাই গণসংগীত। আগেই বলেছি গণসংগীত এখনকার প্রেক্ষাপটে যে জনপ্রিয় হচ্ছে, তাতে সংশয় এবং সন্দেহ বৈ কিছু বাড়ছে না। সেটি পরিষ্কার করে বলা যায় এখন। আমরা দেখেছি এক ধরনের নির্লিপ্ত উদাসীনতার শিকার হয়ে সংগীত তার প্রাণবস্তু হারাচ্ছে। জলসা হচ্ছে হাজারে হাজারে—একশ্রেণীর শিল্পীরা মুনাফা লুটছেন, শ্রোতৃবৃন্দ শোষিত হয়েও বুঝতে পারছেন না তাঁদের কষ্টার্জিত আয়ের অংশ ব্যয় করে কি আনন্দ, কি শিক্ষা তাঁরা পেলেন। আসলে যাকে আমরা আধুনিক গান বলি তার সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকায় এ কাণ্ডটি

ঘটে যাচ্ছে নিয়ত। এখানেও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে পারেন নি—কারণটি সহজবোধ্য—এসব অপসংস্কৃতির গান নিয়ে আবার আলোচনা কিসের! এই উপেক্ষাই কাল হয়েছে—অবস্থাটা এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সংগীত হিসেবে আধুনিক সংগীতের তেমন গুরুত্ব না থাকলেও সামাজিক সমস্যা হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ এই গান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশের প্রিয় গান এবং বুদ্ধিজীবীরা এই সংখ্যাগরিষ্ঠাংশের গানকে অপসংস্কৃতিমূলক কুরুচিকর অখাদ্য বলে উড়িয়ে দিয়ে এসেছেন—এই কাজটা সোজা সরল বলে। কিন্তু এর শিকার যে যুবকশ্রেণী, যে গরিব ছাত্র এবং তাদের অভিভাবককুল—সে ব্যাপারটা উপেক্ষণীয় কখনই নয়। গত পঞ্চাশ বছরের সাংগীতিক বিবর্তন এই কথাই বলে যে সুরকার ও গীতিকার একজন হলে তাতে সংগীত প্রাণ পায়। এখন আবার অ্যারেঞ্জার শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। বিভিন্ন যন্ত্রের অনুষঙ্গ ব্যবহার করে গানকে রসগ্রাহী করার বদলে এঁরা সেটাকে মেকানাইজ্‌ড্‌ করে তোলেন এবং অহেতুক মাত্রাপতন ঘটান। গীতিকারের গান লেখাও এখন সোজা। কোনও মতে দু'লাইন সঞ্চারী দু'লাইন অন্তরা লিখতে পারলেই হল। গীতিকারের অন্তর্নিহিত ভাব বোঝেন না সুরকার, সুরকারের সুরের মূলে আবেদন বোঝেন না তাঁর অ্যারেঞ্জার, ফলে গান রসবিহীন হয়ে পড়ছে। তা'ছাড়া পাশ্চাত্যের কুপ্রভাবে উদ্ভট সুর ও বাণী প্রায়ই বাজার মাত করছে—যৌন আবেদন এবং অতীব হাল্কা চটুল কথা ও সুর যার মূল সম্পদ। এগুলোই নিয়ত গোগ্রাসে গিলছি আমরা।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর মতন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, তা ছাড়া তাঁর অর্থাভাবও ছিল না, ফলে সংগীত-বাণিজ্যের শিকার তাঁকে হতে হয়নি। অথচ অমিত প্রতিভাধর নজরুল ইসলাম রেকর্ড কোম্পানীর চাহিদায় সংগীত রচনা করেছেন, সিনেমা থিয়েটারের প্রয়োজনেও তাঁকে সংগীত সৃষ্টি করতে হয়েছে—তাই তাঁর সংগীতে কখনও কখনও শৃংখলার অভাব লক্ষ্য করা যায়। এদেশের সংগীত নজরুলের সময় থেকেই রেকর্ড কোম্পানীসমূহ, রেডিও, সিনেমা-থিয়েটারের পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ধনতন্ত্রের অবিসংবাদী ফল হিসেবে শ্রোতৃবৃন্দ এখানে ক্রেতার ভূমিকায়, সংগীত পণ্যসামগ্রী।

প্রায়শই সংগীতের ঠিকাদারেরা বোঝায়—কি আর করার আছে, জনসাধারণ চান বলেই এসব করতে হয়। আসলে কৌশলে যেমন করে চটুল হিন্দি বাংলা ফিল্মের নেশা মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তেমন করে এই

ঠিকাদারশ্রেণীর লোকেরা একটি জনরুচির শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে সমাজকে ঠকাচ্ছেন। আজকের দিনে সাংস্কৃতিক রুচিকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারা হচ্ছে সিনেমা এবং রেকর্ড কোম্পানীসমূহ। এই সাংগীতিক অবক্ষয়ের জন্য যতটা দায়ী গীতিকার সুরকারেরা, তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থা, যেখানে একটি শক্তিশালী সামাজিক ক্ষমতাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। এর মোকাবিলা করা সামান্য কাজ নয়—গোটা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে মুনাফাবাজদের সরিয়ে দিতে না পারলে আমাদের সাংস্কৃতিক অবক্ষয় চলতেই থাকবে। মুনাফাবাজ এই সংগীত-ব্যবসায়ীদের হাতে যাঁরা নিঃশেষিতপ্রাণ হতে না চাইবেন—ন্যূন কয়েকজন তেমন ব্যক্তিই আমাদের ভরসার কেন্দ্রস্থল। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দশক আমরা ভুলিনি—কয়েকজনের সদিচ্ছা যদি সাংগঠনিক শক্তির সাহায্য পায়, ক্রমশঃ নিজেই একটি সংগঠন হয়ে পড়ে, তখন তার শক্তিকে ব্যবসায়ীরাও উপেক্ষা করতে পারে না। এখানেই এসে পড়ে সমান্তরাল সংগীতের কথা (Parallel Songs)। সেই সময় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সমস্ত বাধার প্রাচীর টপকে জনসাধারণের সামনে তার স্বর্ণঝুলি থেকে ছড়িয়ে দিয়েছিল অমূল্য সব সাঙ্গীতিক অবদান—যার রেশ আজও চলছে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়, সলিল চৌধুরী, পরেশ ধর, হেমাঙ্গ বিশ্বাসেরা যে গান বেঁধেছিলেন তাতে করে ভারতীয় সংগীতে একটি নূতন আশাসঞ্চারী দিগন্তের উন্মোচন হয়েছিল—সে ধারা কিছু ম্লান হলেও, আজও অব্যাহত—অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও গণসংগীত আজ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে দ্রুত।

গণসংগীত জনপ্রিয় হলে আনন্দিত এবং আশান্বিত হবারও কথা, তা' হওয়া যাচ্ছে না দুটি কারণে। এক : গণসংগীতের মধ্যে ভেজাল ঢুকছে—শৌখীন মজদুর এবং সস্তা বাহবার লোভ ছড়াচ্ছে দ্রুত। দুই : গণসংগীত-শিল্পীদের আচরণে বৈপরীত্য—ব্যতিক্রম যাঁরা তাঁদের সংখ্যা নগণ্যই। এই দুটি বিষয় ব্যাখ্যা করা দরকার। আমরা এখন এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত যে গণসংগীতের সঙ্গে অন্য সব সংগীতশ্রেণীর যে স্বাতন্ত্র তা' শুধুই এর সংগ্রামী অস্তিত্বের জন্যই নয়, এর বাণী এবং সুরের সহজিয়া ভাবের জন্যও অর্থাৎ খেটেখাওয়া অল্পশিক্ষিত-নিরক্ষর মানুষদের সংগীত এটি। এখন দেখা যাচ্ছে খুব দ্রুত একশ্রেণীর লোক এই সংগীতের বাহক হয়ে উঠছেন—এঁদের অনেকেরই শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাস নেই—এঁদের গানও সুতরাং কেমন একধরণের রোম্যান্টিক আবেদন সম্পন্ন। বিভিন্ন স্কেলে হারমনাইজ করে যন্ত্রের অনুষঙ্গে বিষয়টি

মনোরম এবং আবেদনগ্রাহ্য হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কোথায় যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছে—ফাঁকটা আন্তরিকতার। এই কলকাতাতেই এখন নিত্য জন্ম নিচ্ছে 'কয়ার' সঙ্গীতের দল—এতে চর্চা ও প্রচলন বাড়ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই ফাঁকি থেকে যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস স্থিরীকৃত হল না, আমি গণসঙ্গীত গাইছি—এটা অসম্ভব। ফলে 'কয়ার' গুলোর অপমৃত্যুও ঘটছে—লিটল ম্যাগাজিন যেমন জন্মাচ্ছে আর মরছে রোজ। এঁদের দৌড় রবীন্দ্রসদন বা ইতিউতির ভাল স্টেজ / হলেই সীমাবদ্ধ। বিদেশযাত্রার লোভেও তৈরী হচ্ছে অনেক কয়ার, ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে অনেকে যাচ্ছেনও এদেশ-ওদেশ। গণসঙ্গীতের ব্যাপারটা তাই গৌণ থেকে গেল—যাঁদের জন্য গান তাঁরা শুনলেন কই? যাঁদের জন্যে গণসঙ্গীত তাঁরা ঐরকম স্টেজ আর আলো পাবেন কোথায়? গরুর গাড়ীতে করে অজগাঁয়ে এইসব গণসঙ্গীত শিল্পীরাও নিশ্চয়ই যাবেন না। তাই আশংকা অবশ্যই অমূলক নয়—কি হবে এই গণসঙ্গীতের ভবিষ্যত? ক্রমশঃ গণসঙ্গীতও পণ্য হয়ে যাচ্ছে, ক্রমশঃ তা এলিট্ ক্লাবের বিষয় হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় ব্যাপারটাও একই রকম সত্যি। শিল্পী—গণসঙ্গীত যিনি গাইবেন—তাঁকে অবশ্যই আদর্শ চরিত্রের লোক হতেই হবে। পয়সার লোভে যিনি বিচলিত তাঁর জন্য এ গান নয়। আমরা তো এখন প্রায়ই এই ধরনের গণসঙ্গীত শিল্পী ও গোষ্ঠীকে গণসঙ্গীতের চার-হাজারী দশ-হাজারী মনসবদারী নিতে দেখছি নানান অনুষ্ঠানে। গণসঙ্গীতশিল্পী অর্থ-শিকারী হলে তাঁর আদর্শের আর কি থাকে?

গণসঙ্গীত সুরের কারিকুরিতে বিশেষ আবদ্ধ নয়—বাণীই এর প্রধান—সেখানেও ভেজাল। এই ভেজালও ঢুকছে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস না থাকার দরুণ। ফলে প্রায় আধুনিক গানের চেহারা নিয়ে নিচ্ছে গণসঙ্গীত—আর এর একধরনের জনপ্রিয়তাও সে কারণেই ক্রমবর্ধমান। শিল্পীরাও দেখছেন পরিস্থিতি অনুকূল—প্রগতিবাদীও হওয়া যাচ্ছে আবার অর্থযশও হচ্ছে—অতএব গণসঙ্গীত ধরো। এ ব্যাপারটা আশংকার এবং গণসঙ্গীতের ভবিষ্যতের পথে খুবই বিধ্বংসী।

গণসংগীতে ভেজাল বলতে কিন্তু অর্কেস্ট্রাইজেশন' বা হার্মনাইজিং পদ্ধতিতে সঙ্গীত পরিবেশনের কথা বলা হয় নি,—বলতে চাওয়া হয়েছে সুর এবং বাণীর ছন্দপতনের কথা, অসাযুজ্যের কথা—রোম্যান্টিক প্রাধান্যের কথা। এটা তো ঠিকই, যেহেতু আন্তর্জাতিক এবং সুস্থ প্রতিযোগিতায় যেতে

হবে বাণিজ্যিক সঙ্গীতের সঙ্গে, সে কারণে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যে রীতিরই হোক না কেন, অর্কেস্ট্রাইজেশন হবেই, পরিবেশনভঙ্গীকে আকর্ষণীয় করে তুলতেই হবে। তার মানে এই নয় যে আর সব কিছু জলাঞ্জলি দিতে হবে। যেখানে সম্ভব নয় সেখানে অবশ্যই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সহজ পরিবহণযোগ্য যন্ত্রানুষঙ্গ নিয়ে অনুষ্ঠান করতে হবে, এবং বলে রাখা ভাল, গ্রামীণ সংস্কৃতি এখনও মধ্যবিত্ত শহুরে সংস্কৃতির চেয়ে অনেক বেশি সুস্থ, তাই প্রতিযোগিতার কথা সেখানে না ভাবলেও চলবে। যাকে আমরা অপসংগীত বলি তার সঙ্গে গণসংগীতের প্রতিযোগিতা মূলত শহরেই সীমাবদ্ধ, তাই শহরে যথাসম্ভব আকর্ষণীয় করে আদর্শের প্রতি স্থিতধী থেকে গণসঙ্গীত পরিবেশন করাই বাঞ্ছনীয় হবে।

শেষ কথা এই যে, গ্রামীণ সংস্কৃতি যেহেতু এখনও অনেক বেশি সাবলীল সেহেতু আমাদের উচিত গ্রামেগঞ্জে সাংগীতিক এই অংশটিকে জনপ্রিয় করে তোলা, সেখানে স্কোয়াড করা, চর্চার ব্যবস্থা করা। কুসংস্কৃতি বড় দ্রুত ধায়, —অতএব সময় থাকতেই এগুনো ভাল।

চলচ্চিত্রের ভালমন্দ : কিছু ভাবনা

কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, হালফিল শহর কলকাতার স্বস্তিকর ঘটনাটি কি ? আমার উত্তর—স্বস্তিকর সেই ঘটনাটি অবশ্যই ভালো ছবির টানে মুখরিত দর্শকবৃন্দের সুদীর্ঘ কিউ। শহর কলকাতা বহুদিন যাবতই সুস্থ সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণা করে আসছে। তার গঠনের মধ্যেই কলকাতার দ্বিমুখীনতার পরিচয় স্পষ্ট—একাংশ অংশতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চাকুরে, ওরই মধ্যে কিছু বুদ্ধি-জীবী, একাংশ উচ্চবিত্ত এবং বাকি গরিষ্ঠাংশই দরিদ্র কিংবা বেকার শ্রেণীভুক্ত, যাঁদের মধ্যে একদল উৎসাহী বিভিন্ন ধরনের কর্মী আছেন। এরকম একটি সামাজিক কাঠামোই কলকাতার ভিত্তি, যেটি আবার ব্যাপ্তি লাভ করেছে বহুধা-বিভক্ত সংস্কৃতির টানাপোড়েনে ; কোলকাতার শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ লোকই অবঙ্গভাষী—যথার্থ অর্থেই কলকাতা একটি কস্‌মোপলিটন শহর।

তাই সংস্কৃতির যে অংশটি ছেলেভোলানো ওয়ার্লড মেডইজির নামান্তর, সেটিও যেমন অগণিত জন-উপস্থিতি পেয়ে থাকে, তেমনই জীবনসচেতন রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসমন্বয়ী সাংস্কৃতিক অংশটিও ব্যাপক গণসমর্থন পেয়ে থাকে। এবংবিধ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই কলকাতায় পরস্পর বা কখনও একই সাথে অন্তত ছয়-ছয়টি ছবির জয়জয়কার ঘোষিত হল—যে ছবিগুলোর মধ্যে থীমগত একটি আন্তর্সমতা লক্ষ্য করা গেছে—দরিদ্র এবং নিপীড়িত মানুষদের বঞ্চনার প্রতি নির্মাতাদের সহমর্মী দৃষ্টি ছবিগুলোকে যথার্থভাবেই বিশ্লেষণাত্মক চেহারা এনে দিয়েছে, বলতে দ্বিধা নেই, এই প্রথম একগুচ্ছ ভারতীয় ছবি সত্য কথা বলার চেষ্টা করল।

ঘটনাটি অবশ্যই রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসমন্বয়ী জীবনসচেতন সাংস্কৃতিক তথা জাতীয় জীবনের পক্ষেই উল্লেখনীয় সংবাদ—এই যে শহর কলকাতায় একই সাথে 'আক্রোশ', 'অ্যালবার্ট পিন্টো কা গুস্সা কিঁউ আতা হ্যায়', 'শোধ', 'হীরক রাজার দেশে,' 'একদিন প্রতিদিন' এবং কিছু পরেই 'চক্র'-র মত ছবিগুলি ব্যবসায়িক অর্থেই সফল হল। এই ছবিগুলো স্বাদে-গোত্রে প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম ; প্রত্যেকটি ছবিই বিশেষ একটি বক্তব্যকে তুলে ধরে এবং এদের একত্রিত একটা আবেদনও থেকে যায় ; এই যে সামাজিক অবস্থা, এটিই নানা সমস্ত অন্যায় অবিচারের। 'আক্রোশে' হরিজন নিধনের কারণ সন্ধান, 'অ্যালবার্ট পিন্টোয়' রাগের উৎস সন্ধান, 'শোধে' ক্ষুধার নগ্নরূপ ও তজ্জনিত সামাজিক বিশ্লেষণ। 'হীরক রাজার দেশে'র ফ্যানটাসির মধ্যেও সামাজিক পটপরিবর্তনের আভাস, 'একদিন প্রতিদিনে' নিম্ন মধ্যবিত্ত / মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের সমস্যা ও তার গভীরে অনুপ্রবেশ—এসবই রাজনৈতিক সচেতনতার আভাস দেয়। এই একগুচ্ছ ছবি, এই প্রথমই ঘোষণা করল—মেলোড্রামার অতি নাটকীয়তায় নয়, বিশ্লেষণাত্মক প্রচেষ্টায় সামাজিক যাকিছু নিপীড়ন এবং বৈষম্য—সবের মূলেই রাজনীতির খেলা চলেছে। উঁচুদের ভোগবিলাস এবং কামনা-লালসা চরিতার্থ করার জন্যই নীচুদের সংগ্রাম—যা' প্যারাডক্সিক্যাল মনে হয়, যখন বলা হয়, 'বেঁচে থাকার সংগ্রাম'।

এমন কোন ছবির একক প্রদর্শনে সাফল্যলাভ এর আগেও ঘটেছে—কাছাকাছিই 'কলকাতা-৭১' এর সাফল্যের কথা মনে পড়ছে, ধর্মতলা জুড়ে কেবল দর্শকেরই লাইন। তার সাথে একই সাথে এতগুলি ছবির একত্রিত সাফল্য লাভের দৃষ্টান্তে বিস্তর ফারাক আছে। আমার প্রথম কথায় ফিরে আসি—

স্বস্তিকর সেই ঘটনাটি হচ্ছে জনমানসের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের ইঙ্গিত। কেন না, এখন আর এই জাতীয় ছবির সাফল্যলাভ ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচিত হবে না।

স্বাভাবিক যে প্রশ্নটা সঙ্গতভাবেই উঠবে সেটি হচ্ছে—বহু তারকারঞ্জিত নাচগান মারদাঙ্গা সম্বলিত তথাকথিত হিন্দী ছবিরও তো' তুঙ্গে বৃহস্পতি (হিন্দী ছবি বলতে এখন আর হিন্দীভাষার ছবি শুধু বোঝায় না, ঐ সব বিশেষত্ব নিয়ে নির্মিত যে কোনো ভাষার ছবিকেই বোঝায়)। আমরা এর আগেই দ্বিমুখীনতার কথা বলেছি—

সেটা ছাড়াও বলা চলবে আরেকটি বিষয়: দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনটা শুধুই ইঙ্গিতবহ, ভবিষ্যতের ঘটনা-নির্দেশকারী। যেমনটি নাটকের ক্ষেত্রে—শ্যামবাজারী থিয়েটার আর গ্রুপ থিয়েটার—দুধরনের নাটকই একটি অসম প্রতি-দ্বন্দ্বিতার মধ্যে আছে—দুধরনের নাটকই প্রচুর দর্শক টানছে। তফাৎটা শুধু এই, যেখানে শ্যামবাজারী থিয়েটার লোক-ভোলানো হরেকরকম সওদা-ফিকিরের সন্ধানে, সেখানে গ্রুপ থিয়েটারসমূহ তাঁদের নিম্নবিত্ত সামর্থ নিয়েও জনমানসে জীবন সচেতনতার সংগ্রামী পথ নির্দেশ করে যেতে বদ্ধপরিকর।

এমনই ব্যাপার ছবির ক্ষেত্রেও। মাল্টিস্টারার ছবির পাশাপাশি তাই অখ্যাত নবীন পরিচালক-কলাকুশলী-অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বক্তব্য-প্রধান ছবির সাফল্যলাভ একসময়ে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল। গত কয়েকমাসের ঘটনা প্রমাণ করছে: না, তা' আরো সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিতবহ। 'আক্রোশ', 'অ্যালবার্ট পিন্টো', 'শোধ', 'হীরকরাজার দেশে', 'একদিন প্রতিদিন', 'চক্র' এসব ছবির সাফল্যলাভ পরিবর্তিত জনমানসেরই ইঙ্গিত। এসব ছবিগুলোই জনগণের মূল সমস্যা নিয়ে কিছু বলতে আগ্রহী হয়েছে এবং সন্দেহ কি রাজনৈতিক প্রসঙ্গও এসে পড়েছে ফলস্বরূপ। ছবিগুলোর সাফল্য প্রমাণ করছে যে দর্শক-বৃন্দ এইসব ছবির বক্তব্যসমূহের দ্বারা প্রভাবিত।

এই যে জীবনসচেতন শৈল্পিক ছবিগুলো ব্যাপক সাফল্য অর্জন করল তার পরিপ্রেক্ষিত একটা নিশ্চয়ই আছে। মোটামুটিভাবে সেটি হচ্ছে, কলকাতা ও শহরতলীর ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের প্রাথমিক সাফল্য অর্জন। ১৯৭৭ এ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলের পরে পরেই ফিল্ম-আন্দোলনটি তার সঠিক চেহারা পেতে থাকে, যদিও একথা কখনই বলা যাবে না, ফিল্ম-আন্দোলন সফল। তবে সরকারী আনুকূল্যে এই আন্দোলনটি প্রসার লাভ করছে, তা'

বলা যায়। পশ্চিমবঙ্গে এখন মোট তেত্রিশটি সিনে ক্লাব আছে, তার বাইশটিই কলকাতা ও শহরতলীতে—অনেক আন্দোলনের মত ফিল্ম-আন্দোলনও শহর-নির্ভর হয়ে পড়ছে, ফলত এই যে ফিল্মের বিস্তর প্রসার এমন কি গ্রামে গঞ্জেও, তা' নিছকই পর্যবসিত হয়েছে কাগুজে প্রতিশ্রুতিতে : দক্ষিণ-ভারতে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন উপহার দিয়েছে একগুচ্ছ প্রতিভাধর নবীন পরিচালক; ফিল্ম সোসাইটি সেখানে ছবি তৈরীর খরচাও জুগিয়েছে। এই দৃষ্টান্তটি সংশ্লিষ্ট সকলেরই মনে রাখা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে নিহিত রয়েছে ফিল্ম-আন্দোলনের মূল শক্তি। দক্ষিণী ছবির এখন প্রধান দুটি ধারাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে বেশ প্রতিষ্ঠিত—মেদবহুল অসংখ্য টাকায় নির্মিত সেক্স-ভায়োলেন্সের চূড়ান্ত ব্যবসার এক শ্রেণীর ছবি—সংখ্যায় বোম্বাইও পরাস্ত। পাশাপাশি কিছু ভাল ছবি, যা ফিল্ম-আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট পরিচালকবৃন্দের অবদান। বোম্বাইয়েও সেক্স-ভায়োলেন্স এবং ভালো ছবি-করিয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। পশ্চিমবঙ্গ, এটি আশার কথাই, নাটকে সেক্স-ভায়োলেন্স যথেষ্টই মিশ্রিত হচ্ছে, ফিল্মে কিন্তু অন্তত সেসব ব্যাপারে আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিয়েছে। চল্লিশ দশকের গল্প ও আঙ্গিকের অনেক বাংলা ছবি এখনও হচ্ছে, একটাকা-র প্রসাদ-গুণে তা দিব্যি সফলও হচ্ছে, কিন্তু সেক্স বিতরণ সেসব ছবিগুলোও করে না। সেন্টিমেন্ট এবং মেলোড্রামায় বাঙ্গালীর চিরদিনের আসক্তিই হয়ত এসব ছবির পুনঃপুনঃ নিমার্ণের কারণ।

ফিল্ম সোসাইটির মাধ্যমে ছবির জগতে এসে সংগ্রামী চেতনা ও শৈল্পিক কীর্তির জন্য বিস্তর স্বীকৃতি লাভ করেছেন এমন পরিচালকের সংখ্যা ভারতে অনেক : স্বয়ং সত্যজিৎ রায় সে তালিকার শীর্ষে। আছেন : ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, হরিসাধন দাসগুপ্ত, চিদানন্দ দাসগুপ্ত, রাজেন তরফদার। নবীনদের মধ্যে : বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত, শংকর ভট্টাচার্য, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, গৌতম ঘোষ, সৈকত ভট্টাচার্য, বিপ্লব রায়চৌধুরী, রাজা দাশগুপ্ত, মানস ভৌমিক। আছেন আদুর গোপালকৃষ্ণ, গিরিশ কাসারবল্লী, জব্বর প্যাটেল, রবীন্দ্র ধর্মরাজ, গিরীশ কারনাড, বি ভি করন্থ, এম. এস. সথ্যু, শ্যাম বেনেগাল, গোবিন্দ নিহালনী, অবতার কাউল·· আরো অনেকেই। অসম্পূর্ণ এই দীর্ঘ তালিকাটিই বলে দেবে ভারতের চলচ্চিত্রের ধারাটি কোন্ পরিচালকবৃন্দের মুষ্টিবদ্ধ।

গোল বাধে আসলে সেখানে—পরিচালক তো অনেকই হল, এ'দের ছবি করার টাকা জোগায় কে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মুহূর্তে অগ্রগামী অনেক

পরিচালকের আর্থিক ভরসাস্থল, কিন্তু অন্যত্র? প্রযোজক পেতেই এইসব নবীন প্রবীণ পরিচালকেরা গলদঘর্ম, সৃষ্টির উন্মাদনায় নিত্যই বাধাপ্রাপ্ত, অবশেষে আত্মসমর্পণ···। সুখের কথা, এমনতরো ঘটনা বিশেষ ঘটে নি। আসলে প্যারালাল সিনেমার মত কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না হলে ভাল ছবির জন্য সিনেমা হলও একদিন পাওয়া যাবে না। কে না জানেন, হাউস মালিকেরাও তাঁদেরই গোত্রভুক্ত—যাঁদের বিরুদ্ধে এইসব ছবিগুলর জেহাদ্! সরকারী হল যত হয়, ততই ভাল; ফিল্ম সোসাইটিগুলোরও উচিত নিজেদের হল তৈরীর চেষ্টায় নামা। কোলকাতার 'সিনে সেন্ট্রাল' এ ব্যাপারে পথিকৃৎ। লক্ষাধিক টাকা তাঁরা তুলে ফেলেছেন হলের জন্য। আসলে ময়দানে নামতে হলে কোমর কষেই নামা উচিত। ফেডারেশন অব্ ফিল্ম সোসাইটীদের কাজকর্ম তেমন গোছালো নয় যাতে করে ঈপ্সিত ফল অর্জিত হতে পারে। ফেডারেশন এখন প্রদর্শকের কাজ করে মাত্র। এতদিনে তার নিজস্ব একটি প্রজেক্টরও নেই, ফিল্মসংগ্রহও শূন্য। পঁচিশ বছর বয়সী এক যুবার এই অথর্বতা আসলে নেতৃত্ব দেবার অক্ষমতা থেকেই এসেছে, অন্তর্কলহ এবং বিতন্ডা তো আছেই। ফেডারেশনকে এ সব থেকে মুক্ত করতে হবে। এবং অবিলম্বে। রাজ্য সরকার তো সাহায্যে সর্বদাই আগুয়ান্—অনুদান দেওয়া হলো বছর দেড়েক আগে ১৭,০০০ টাকার একটি ফিল্ম-অ্যানালজি বের করবার জন্য, দশজন সম্পাদক নিয়োগ করেও অদ্যাবধি ফেডারেশন সে বই প্রকাশ করতে পারলেন না। এই ধরনের সাংগঠনিক তৎপরতার অভাব সত্যই দুঃখজনক।

পাশাপাশি ব্যক্তিগত আগ্রহেই বেরিয়েছে অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা সত্যজিতের সমাজচিন্তা নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থটি। এজন্য তিনি ভারত সরকারের পুরস্কারও লাভ করেছেন। আসলে নিষ্ঠার অভাবেই যা' কিছু ব্যর্থতা, আর সংযুক্তিতেই আসে সাফল্য, সব ব্যাপারেই। প্যারালাল বা বিকল্প প্রদর্শন ব্যবস্থার কথা আজকাল শোনা যাচ্ছে—যার মূল বিষয় হচ্ছে, প্রথাগত দর্শকদের সমান্তরাল আরেকটি প্রণালী তৈরী করা, যাতে করে ভাল ছবিগুলো গুদামবন্দী হয়ে না থাকে। অবশ্যই এর জন্য প্রচলিত আইন পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে, কেন্দ্রের বাধা আসতে পারে, যেমন এসেছে 'বাংলা ছবির বাধ্যতামূলক প্রদর্শন' বিলে—তবুও বিষয়টি নিয়ে ভালরকম নাড়াচাড়া হক—এমন তো নয়, আমরা যা চাইব, টপাটপ তা মিলে যাবে। পরিপ্রেক্ষিতটা এই বিষয় নিয়ে দানা বাঁধুক—জনগণ জানুন অবস্থাটা,—ভাল পরিচালকেরাও তখন আর অসহায় বোধ

করবেন না। কায়েমী স্বার্থ একদিন না একদিন পরাজিত হবেই। বিকল্প প্রদর্শন ব্যবস্থা ফিল্ম সোসাইটিরা যে গ্রহণ করেন না, তা তো নয়, ভাড়া করা প্রজেক্টারে প্রায়শই তাঁরা ফিল্ম দেখান। বিষয়টার মূল বীজ নিহিত রয়েছে ওখানেই। ফেডারেশন এটিকে ব্যাপ্তি দিতে পারেন। গ্রামে গঞ্জের মানুষের জন্য এখনও সার আর বীজের মত সিনেমা বিনি পয়সায় পাওয়া যায় মাত্র, সরকারী সহায়তা নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন জেলায় ভাল ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন, সুফল অবশ্যই ফলবে।

সবচেয়ে আশংকাজনক ঘটনাটি হচ্ছে, স্কুল কলেজের ছাত্ররাও কুরুচিপূর্ণ ছবির অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। এর বিষময় ফল আমরা পাচ্ছিই। অভাব / সস্তা প্রমোদের জন্যই যে এরা এসব দেখে তা কিন্তু নয়—বিকৃত এক সুখ সন্ধানেই এরা অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। নারী অপহরণ, ডাকাতি, ধর্ষণ, খিস্তিখেউড়, অসম্মান করার একটা প্রবণতার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে এদের মধ্যে। স্মাগলার-হিরোর পদাংক অনুসরণে জীবনও নষ্ট হচ্ছে অনেকের—সম্ভাবনাময় জীবনও। দেশই ত' আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ছাত্রদের মধ্যে এই যে অরাজনৈতিক (?) শৃংখলা-হীনতা, এই নিয়ে কিন্তু দেশের কর্তাব্যক্তিরা চিন্তিত খুব কম—তাঁরা চিন্তিত কেবল ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হওয়ায়। যাদের মধ্যে ন্যূনতম রাজনৈতিকবোধ জন্মে গেছে, পাওনা-গণ্ডার হিসেব তাঁরাই চাইবেন, অতএব তাঁদেরই জব্দ কর, হেমা-অমিতাভ'র অনুরক্তরা দৃষ্টির বাইরেই থাক।

দর্শকদের মানসিকভাবে গড়ে তোলাও তাই অন্যতম প্রধান কাজ, যে কাজে ফিল্ম সোসাইটিসমূহ কিছু সফল হয়েছেন বলে দাবী করা হয়, যদি হয়েও থাকে তাও একেবারেই শহরাঞ্চলে, আসলে ফিল্ম সোসাইটিগুলোও তো সেই একই সামাজিক কাঠামো থেকে জন্ম নিয়েছে—মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, শিক্ষিত ছাত্র, এবং কিছু বুদ্ধিজীবীর সমাহার--এই ফলস্বরূপ কোন কোন ক্ষেত্রে এইসব সোসাইটি সিনিক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, কোনটি মধ্যবিত্তসুলভ থিয়োরী সর্বস্ব হয়ে পড়ে, কোনটি হয়ে পড়ে সৌখীন বা মর্যাদার গণ্ডীতে আবদ্ধ। তাই এখনও কোন সোসাইটির সেমিনারে পঞ্চাশজনের বেশি লোক হয় না, সাধারণ-সভায়ও তাই ঘটে। অর্থাৎ সাধারণের মধ্যে এর জন্য মনস্ত্ববোধ বা গভীরতা—সে ব্যাপারটা এখনও ঘটেই নি। ছবি দেখ, বাড়ী চল।

ফিল্ম সোসাইটিগুলোর একার সামর্থে খুব বেশী নির্ভরশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়—ফিল্ম সম্বন্ধে ছাত্রজীবন থেকেই চেতনার স্তর উন্নত করবার জন্য বিদেশের

নানান পাঠ্যক্রমের মত এখানেও তা পাঠ্যবস্তুর অন্তর্গত করা উচিত। স্কুলের উঁচু ক্লাসের এবং সবে স্কুল পেরুনো ছেলেদের দিকে নজর দেওয়া উচিত সর্বাগ্রে—এটিই টারনিং পয়েন্ট, সেই মোড়—যেখানে ঠিক হয়ে যায় কে কোন দিকে যাবে। মাসে অন্তত একটি ভাল ফিল্ম দেখানো কোনও স্কুল কর্তৃ-পক্ষেরই সমস্যা হবে না। আগ্রহ বাড়াতে সেমিনার বা আলোচনাও করা যেতে পারে।

যদি আমরা লেনিনের কথা স্বীকারই করি যে ফিল্মই হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী গণমাধ্যম, তাহলে আর দেরি করা উচিত হবে না। কলে-কারখানায় সাপ্তাহিক কার্যসূচীতে ফিল্ম দেখানোর ব্যবস্থা করা উচিত। গ্রামে-গঞ্জেও শুধু ধান-পাট-সার নিউজরীল নয়। আরো কিছু দেখানো যেতে পারে—গল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান ফিল্মেই সহজতম। শহরে আর বিশেষ কিছু হয়ত করে ওঠা যাবে না, এত কিছুর পরেও যাঁরা উন্মার্গগামী, তাঁরা জ্ঞানপাপী, যাঁরা এখনও জেগে ঘুমোচ্ছেন না, এখন বরং স্বদেশের সেই গ্রামবাসী আর শ্রমিকদের জন্যই চেষ্টা করা যাক, আর চেষ্টা করা যাক, অল্পবয়সী ছাত্রদের জন্য। গোড়া শক্ত হলে সুফল ফলবেই।

ফিল্মের গানের ভালমন্দ

১৯৩২ সালে ফিল্ম কথা বলতে শুরু করার পর থেকেই ভারতবর্ষে ফিল্ম মাধ্যমটিকে নানাবিধ উপাদানে সমৃদ্ধ করে ধীরে ধীরে ব্যবসার করতলগত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। সে প্রচেষ্টার ক্ষীণ ধারাটি আজ, অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন, ধনী ব্যবসায়ীদের সহায়তাপুষ্ট হয়ে স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে এবং ক্রমশঃ বিপজ্জনক রেখার সীমাটি অতিক্রম করে চলেছে। ফিল্ম মাধ্যমটি এখন জনমানসে সবচেয়ে প্রভাবশালী, কারণ সর্বকনিষ্ঠ এই মাধ্যমটির অসম্ভব জনপ্রিয়তা। ফিল্মের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু জনমানসে গঠনমূলক কিংবা চেতনা উদ্দীপক কোনও প্রভাব কোনও শিল্প মাধ্যমই ফেলুক, এটাই শাসককুলের অভিপ্রেত নয়, কিংবা বলা চলে তাঁরা যাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, সেই ব্যবসায়ী শ্রেণীর মনঃপূত নয়। স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসামুখী ফিল্ম মাধ্যমটি এখন

নৃত্যগীত সংলাপ এবং প্রায়শঃই অর্থহীন এক অসম্পূরক অবোধ গল্প পরিবেশনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্যই বাণিজ্যিক ফিল্মগুলোর এমন দশা হওয়ায় প্রযোজক কিংবা ফিল্মের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কোন ক্ষতিবোধ নেই আদৌ, বরং নগদ পয়সা রিটার্ণ পাওয়ার এক সীমাহীন লোভের নিগড়ে বাঁধা পড়ছে ফিল্ম। যতই তেমনটি হচ্ছে, ততই প্রমোদ উপকরণের নানাবিধ উপকরণসমূহ জেঁকে বসছে ফিল্মের বুকে। তাই অর্থহীন প্রয়োগচিন্তা, অসংলগ্ন গল্প; তাই পুরুষদের মারদাঙ্গা, অর্ধবসনা নারীর হৈ হৈ উদ্দাম নৃত্য, অসংলগ্ন গান-বাজনা যত্রতত্র।

ভারতীয় বাণিজ্যিক ছবির অবস্থাটা সামগ্রিকভাবেই যখন এমনতরো, তখন তারই প্রমোদ তরণীর অন্যতম প্রধান উপাদান গানের অবস্থাটা যে আদৌ মানগত কিংবা প্রয়োগগত দিক থেকে আনা হবে না তা' বলাই বাহুল্য। এটা নিশ্চিত-ভাবে সত্য যে আলাদাভাবে গানেরই একটা সুতীব্র আকর্ষণ আছে, ফিল্মের চেয়ে এর পরিধিও অনেক বড়। সুতরাং ব্যবসার পরিধিও বড়। ব্যবসায়ীরা এ কথাটা ভাল ভাবেই জানেন। জানেন বলেই দেশের তথাকথিত সফল সঙ্গীত পরিচালক-গায়ক-গায়িকা-বাজিয়েদের হস্তগত করে ফেলেন মোটা দক্ষিণার বদলে। পরিবর্তে তাঁদের নির্দেশমত নায়িকার জন্য বাথরুমে গাইবার জন্য গান, নায়কনায়িকার জন্য বৃষ্টিতে সপসপে ভিজে গাইবার জন্য গান—পিতৃশোক মাতৃশোক বন্ধুশোক ভগবদ্ভক্তি জন্তুজানোয়ার-প্রীতি—নানান ধরনের সিচুয়েশনের গান রচনা করছেন গীতিকার সঙ্গীতকার এবং গায়ক-গায়িকাবৃন্দ। হোটেল নর্তকীর কামনা-উদ্দীপক নৃত্য ইদানীং হিন্দী ছবির একটা প্রধানতম শর্ত। সম্ভবতঃ সেন্সর সার্টিফিকেট পেতে হলে ওটার অতীব প্রয়োজন, তাই উহু আহু জাতীয় শীৎকার চীৎকারের সুড়সুড়ি জানানো এক-আধখানা গানও বাধ্যতামূলক এবং সঙ্গীত পরিচালকবৃন্দের বাজীমাৎ করবার ক্ষেত্রই হচ্ছে এই গান—যেমন অর্থহীন হায়-হুই দিয়ে এর কথা, তেমনই ইলেকট্রনিক যন্ত্রের কর্ণবিদারী অনুষঙ্গের বাহারী কাজকর্ম তাতে তাৎক্ষণিক একধরনের বিকৃত আনন্দ বহুজনে পেতেই পারেন এতে, এবং, এর জন্য একটি তীব্র লজিক পেশ করা হয়ে থাকে। সেটি এ'রকম—"মনুষ্যজীবন এখন অতীব সমস্যাসংকুল এবং বিভিন্ন কর্মভারের সাফল্যে-অসাফল্যে ভারাক্রান্ত। জীবনযাপনের মানও হইয়াছে যান্ত্রিকগতি সম্পন্ন, এই গতিময়তার সহিত পাল্লা দিবার জন্যও এইরূপ সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে হইতেছে, তিন মিনিটের

একখানি গান মারফত যতটা সম্ভব রিলিফ বিতরণ করিয়া মনুষ্য চিত্তবিনোদন করাই এইরূপ সংগীতের উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া জনরুচি ত আছেই। জনসাধারণ চাহিলে আমরা কি করিতে পারি?"

লজিকটা সংগীত ব্যবসায়ীদের মস্তিষ্ক-উদ্ভূত এমন ধারণা করা ভুল হবে। আসলে সংস্কৃতির সবক'টি বাহনকেই যাতে শাসকশ্রেণী তাদের সুবিধামাফিক পথে চালিত করতে পারেন এর জন্যই অতি সুকৌশলে রচিত হয়েছে এসব যুক্তিজাল, যা অতি প্রত্যক্ষভাবেই হাস্যকর, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের লজিককে ধোঁকা দিয়ে চলেছে অবিরত। গতিময়তার যুগে গানও অভিনয় হোক্, আপত্তি নেই—কিন্তু গানের যে সাবেকীয়ানার বংশধর আমরা (তা' খোদ বিদেশীরাই অধিগত করে নিচ্ছেন আকুল আগ্রহে), তার গতিময় অংশটুকু কাজে লাগানোর চেষ্টা কোথায়? এবং সে অংশটুকুর পারিধিও যথেষ্ট বিস্তীর্ণ। ভারতীয় মার্গসংগীতের আলাপ-বিস্তার পর্যায় দুটির শেষাটতে বিলম্বিত, মধ্য এবং দ্রুত লয়ের ব্যবহার সর্বজনবিদিত। সদিচ্ছা থাকলে এসবের উপযুক্ত ব্যবহারে যেকোনও গানই রসগ্রাহী হয়ে উঠতে পারে। টুইস্ট সাম্বা চাচাচা রক্-এর যুগও কিন্তু দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে, এসে গেছে ডিস্কো—আসলে এ সমস্ত সংগীতের কোনও আলাদা জাত নেই—কোন মিশ্রণের ফারাকে যা তফাত, তাও খুব হয় কোথায়—কোথাও অনুষঙ্গ জোরে বাজবে, যেমন বিড্ডুর ডিস্কো—একটু মিষ্টি মিষ্টি ভাব আছে—সুর এবং কথার দৈন্য ঘোচাবার প্রচেষ্টা হল রেকর্ডিংয়ের আধুনিকতম কায়দাকানুন মাফিক—যন্ত্রানুষঙ্গ এবং কন্ঠের সাউন্ড সাবলিমিটি রাখা হল একই বিন্দুতে প্রায়, তাই ওতে গান যতখানি মূল্যবান, তারও চেয়ে অধিকতর মূল্যবান যন্ত্রানুষঙ্গ, কেন না যন্ত্র নিখুঁত সুরে কথা বলে এবং প্রতিবারই নিখুঁত হয়, বিশেষতঃ ইলেকট্রনিক যন্ত্র।

ভারাক্রান্ত মানুষকে যদি গানের মাধ্যমে কিছু দিতেই হয়, তবে তা' এত হাল্কা-চটুল হবে কেন? এতে অ্যালোপ্যাথির কড়া ট্যাবলেটের সাময়িকী ভাবটা রয়েই যায়—সাময়িক প্রশমনে বড় অসুখ একদিন দেখা দেবার আশংকা থেকে যায়—এবং তা' যখন হয়ে পড়ে ডাক্তারের সাধ্য কি রোগীকে বাঁচায়? সংগীত ব্যবসায়ীরা সমাজচেতনার পরিচয় রাখবেন, এটা খুব বেশি আশা করা কি? আর জনরুচি বলে কোনও বিষয় নেই। জনরুচি নিয়ন্ত্রণ করা হয়,—তৈরি করা হয়; সেও সেই একটি অভিসন্ধিকে ঘিরে। আধুনিক বিজ্ঞানের মনস্তত্ত্বই হচ্ছে চাহিদা সৃষ্টি করা। যা' এখনও গর্ভজাত, তার সম্বন্ধেই

বিজ্ঞাপনের চটক, রেডিও-সিনেমা, হোর্ডিংয়ের মারফত সুতীব্র প্রচার —এটাই বিশ্বশ্রেষ্ঠ, আধুনিকতম। মজা এখানেই যে, এই যুক্তি বেশ কিছুদিন পরে আমাদের ইচ্ছেকেও নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে—আমরা মোহাবিষ্ট হয়েই ক্রেতা হয়ে পড়ি। স্নো-পাউডার ব্যবসায়ীরাই ত' এ ব্যাপারে বেশ পোক্ত আর যাঁরা 'সাইকোলজি'র ব্যবসায়ী তাঁরা দক্ষতর—এই সাংস্কৃতিক ব্যবসায়ীরা। সিনেমার গান আর রেকর্ডের গানে এখন আলাদা কিছু নেই। সিনেমার গানের রেকর্ড বিক্রির লভ্যাংশেই বেশ কয়েকটা ফিল্ম মুনাফা অর্জন করেছে, এমন দৃষ্টান্ত হাজারো। সিনেমার গান ছাড়া বাংলার কিছু পুজোর গান, বসন্ত-বন্দনা (তাও বোধহয় বন্ধ আছে এখন।), রবীন্দ্রনাথের গান, নজরুলের গান ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত লগ্নে কিছু আলাদা রেকর্ড প্রকাশিত হয়ে থাকে। মুখ্যতঃ সিনেমার গানই রেকর্ড কোম্পানির বিজনেস্, সিনেমার পরীক্ষামূলক (?) বেশ কিছু গান বাজারে বেরুল, এর মধ্যে যেগুলো জনপ্রিয়তা অর্জন করল, তাই হয়ে গেল 'মডেল'। বছর কয়েক তাই চলবে মডেল হিসেবে। লোকে যখন এগুলো সম্বন্ধে অনাগ্রহী হয়ে পড়বে, তখন নতুনতর ব্যবসায়িক চিন্তা করা হবে। তাই জনরুচির এই কাল্পনিক শিখণ্ডির যুক্তিটি মেনে ওঠা সম্ভব নয়। এ রকম গান চাই বলে কোনও গানের জন্য জনসাধারণ দাবী জানিয়েছেন বলেও ত শোনা যায়নি।

পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমাদের ফিল্মী দুনিয়ার পার্থক্য অনেক, তার মধ্যে প্রধানতম: ফিল্মে আবহ এবং গানের ব্যবহার। পাশ্চাত্য কেন, বহু প্রাচ্য ছবিতেও আবহ গানের ব্যবহার ভারতীয় ছবির সাধারণ মান থেকে উন্নত; উন্নত এ কারণে নয় যে ভাল গান গাওয়া হয়েছে বা বাজানো হয়েছে—উন্নত যুক্তিবোধ-গ্রাহ্য প্রয়োজনের জন্য। খুব ঝাল হলে মাংসেও মানুষের অরুচি হয়। ভারতীয় ছবিতে গান থাকবেই। যেভাবেই হোক্, পাঁচ সাতখানা মায় বার চৌদ্দখানা পর্যন্ত গান থাকতেই হবে। অথচ চীনের ছবি দেখুন—খুব কম গান, অনেক ফিল্মে গান নেই বল্লেই চলে—আর সে সুরে মাদকতা নেই, আছে মানুষকে উদ্দীপিত করার আহ্বান—গানের সে বাণী আমাদের অবোধ্য, কিন্তু সুর? আবহসংগীতও উন্নততর—সে কম্পোজিশনের মধ্যে তারুণ্যের ফিচ্‌লেমি নেই, আছে উদ্দীপনা এবং অভিজাত দেশাত্মবোধ; সংগীতে নিজের ধারার বাইরে, নিজেদের যন্ত্রানুষঙ্গের বাইরে যাওয়াটাই অন্যায়—কারণ তাহলে তো শিল্পটিকেও সে পর্যায়ে যেতে হয়। ফিল্মের পটভূমি আমার দেশই।

থাকল, অথচ আমি বিলিতী কিংবা আমেরিকান যন্ত্রানুষঙ্গে আবহ কিংবা সুর রচনা করছি—এ বিষয়টি সংগীতকারদের শিক্ষার অভাবকেই প্রকটিত করে। এঁরা পেশাদারীত্বের দায়ভার মুক্ত হন মাত্র, সৃষ্টি আশা করাই ভুল এঁদের কাছ থেকে। পাশ্চাত্য ছবিতে এমনটি হয় না, ওখানে বরং অধিকাংশ ছবিতে গানই থাকে না। যেটিতে থাকেও বা, তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য—যেমন সাউন্ড অব মিউজিক—যেমন এর গানের বাণী তেমনই সুরের চমৎকার প্রয়োগ। সাতটি গানে সুর তাল এবং যন্ত্রানুষঙ্গের প্রয়োগ চমৎকৃত না করে পারে না। এ রকম সুর রচনার পেছনে সৃষ্টিশীল মনোভাব কাজ না করে পারে না।

ভারতীয় ছবিতে গান অতএব জাঁকিয়ে বসা এক অমোঘ অথচ অর্থহীন অস্ত্র যা কেবল ব্যবসায়ীদের পকেট ভরাচ্ছে। একটি ফিল্মের প্রদর্শন বন্ধ হয়ে গেলেও তার গান থেকে যায়—একটা রেকর্ডিং ইনকামের ব্যবস্থা, মন্দ কি? কিন্তু সেই ইনকামেও যথেষ্ট প্রবঞ্চনা আছে; ধনতন্ত্রের অবিসম্বাদী ফল হিসাবে তা' থাকতেই হবে। যেমন সংগীতকার এবং শিল্পী প্রচুর অর্থ আয় করেন, যন্ত্র-শিল্পী কিংবা অ্যারেঞ্জার তার ধারে কাছেও যান না। অথচ আপাত দৃষ্টিতে সফল ঐ গানের পেছনে অ্যারেঞ্জার আর যন্ত্রীদেরই অবদান সর্বাধিক। তাঁদের ঐ রেকর্ডিং ফীতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এখন সংগীত পরিচালকবৃন্দের অধিকাংশই অ্যারেঞ্জার-নির্ভর হয়ে পড়েছেন, এ কথা আর গোপন নেই। কোনও মতে দু'চার লাইন সুর খাড়া করে অ্যারেঞ্জারের হাতে দিয়ে দেওয়া—তিনি এবার তাতে যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহারের রীতি প্রয়োগবিধি ঠিক করে রেকর্ডিং করাবেন। এতে ক'রে ভাল গান পাওয়া অসম্ভব। কেন না কোনও সুস্থ চিন্তা এতে কাজ করছে না। গীতিকার গান দিলেন সুরকারকে, সুরকার অ্যারেঞ্জারকে—এ ভাবে তিন হাত ঘুরে যে কম্যুনিকেশন গ্যাপ হল, তা আদৌ ভাল গানের উপযোগী কি?

যাকগে, ভারতীয় ফিল্মী গান নিয়ে আবার আলোচনা কিসের! আমরা বরং বীঠোফেন রবীন্দ্রনাথে মশগুল থাকি, ততদিনে সংস্কৃতির এই প্রধানতম বাহনটি আরো গোল্লায় যেতে থাক—উচ্চমধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা যদ্দিন এ সব ভাবতে থাকবেন, তদ্দিন ত' সত্যিই কোন সুরাহা আশা করা যায় না। শ্রেণী চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে বলতেই হয়, অমন সুযোগ আমরা যে যার ক্ষেত্রে নিয়েই নিচ্ছি, তাই সংগীতকার-গীতিকারদের অর্থ-যশলোলুপতা বা ভৃত্যসুলভ মনোভাবকে ধিক্কার দিয়েই বা কি হবে? এটা আসলে সামাজিক কাঠামোরই

যুটি—ধনতন্ত্রের সর্বক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে, এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই—সংগীত এ সমাজে পণ্য মাত্র; শ্রোতারা ক্রেতার ভূমিকায় আর যাঁদের এনে দেবার কথা ছিল গুচ্ছ গুচ্ছ সুরের জাগতিক মূর্ছনা, তাঁরাই এখানে বিক্রেতার ভূমিকায় —ব্যবসায়ীদের খেলার পুতুল হয়ে অনেক প্রতিভাধর সংগীতকারও জাতমান খোয়াচ্ছেন, উপায় কি, অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে যে ঐ পতাকাতলে যেতেই হয়। গানের অবক্ষয়ের জন্য গীতিকার-সুরকারেরা যতটা না দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী সামাজিক• কিছু শক্তি যাঁদের ইচ্ছেয় রাষ্ট্রও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

তবুও এরই মধ্যে, অস্বীকার করা যায় না যে বেশ কিছু শিল্পীর গান আশারও সঞ্চার করতে সক্ষম। যতদিন সিনেমা শিক্ষিত রুচিকে পরোয়া করেছে ততদিন তার গানও অশালীন বা শ্রুতিকটু হয়ে পড়েনি—আমরা মুক্তি, উদয়ের পথে, অগ্নিপরীক্ষা, অসমাপ্ত, শাপমোচন কিংবা একদিন রাত্রের উদাহরণ মনে রাখতে পারি। ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে হিন্দীর দাপট ক্রমশঃ বর্ধমান —সে ভাষারও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গান আমরা পেয়েছি—দো বিঘা জমিন, নাগিন, আনারকলি, গংগা যমুনা, বরসাত, মধুমতী শ্রেণীভুক্ত আরো বেশ কিছু ছবিও পাওয়া যাবে। নৌশাদ, রোশন, মদনমোহন, শ্রীরামচন্দ্র, শচীনদেব বর্মনেরা অমিত প্রতিভাধর সংগীতকার। ব্যতিক্রমের চেষ্টা এঁদের ছিল কিন্তু শংকর জয়কিষণ কিংবা সলিল চৌধুরীর মত আন্তরিক চেষ্টা এঁরা করেননি। ফিল্মীগান বা এর আবহের যে ধনবান্ দিকটি তা' কিন্তু শংকর-জয়কিষণ এবং সলিল চৌধুরীরই দেখিয়ে দেওয়া পথ। কিন্তু বদলে গেল মতটা এবং পথটাও, ঝাঁটাকাঠির শব্দ আর তীব্র ইলেকট্রনিক অনুষঙ্গে আবহ এবং গান এখন ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংগীতের অনুপম দিক যে হারমোনাইজেশন এবং বিপরীত সুরের সহাবস্থান—সলিল এবং জয়কিষণেরা তা' সিনেমার মত প্রশস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন, হয়ত অর্থবাহী হয়ে ওঠেনি সবসময়, তাতে ক'রেও কিন্তু অর্কেস্ট্রার বাহারী সুপরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের মত গুণাবলী একটুও নষ্ট হয় না। ওগুলোর আলাদা একটা মেজাজ আছে, সিনেমা ছাড়াও তার মূল্য অপরিসীম, বিশেষ করে ভারতীয় বাণিজ্যিক ফিল্মে সুরের আধুনিক প্রয়োগের দিক থেকে। রবীন চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্ত, অনুপম ঘটকেরাও সফল—কিন্তু বেশী কাজ করে হেমন্তবাবু এবং নচিকেতা ঘোষ কেমন যেন রিপ্লেড্ হয়ে যাচ্ছিলেন।

বাণিজ্যিক ছবির গান-এর ব্যাপারে আমরা গীতিকারদের দায়ও এড়াতে পারি না। আমার এক বোম্বাইপ্রবাসী যন্ত্রীবন্ধু একবার জানিয়েছিলেন যে আনন্দ বক্সী নামক এক গীতিকার এখন ব্যস্ততম বোম্বাইয়া গীতিকার, যিনি একটি সিগারেট ধরিয়ে তা' শেষ করবার আগেই গান লিখে ফেলেন। অবস্থাটা অনুমান করুন। পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ে গান লিখেছেন একজন কবি, আহা রবীন্দ্রনাথও বোধকরি অমন সৃষ্টি-ভাণ্ডার ছিলেন না। যাই হোক, মেশিনের মতো গানও লেখা হচ্ছে এখন, ফলে চল্লিশোধর্ব শব্দই ঘুরেফিরে গীত রচনায় এসে যাচ্ছে, কেননা পয়সার জন্যই লেখা হচ্ছে চিন্তা বা সৃষ্টির তাগিদে নয়। সমাজের প্রতি এ সব লোকের কোন দায়িত্ববোধ নেই, তাই বাংলাতেও 'এদিকে এসো···প্লীজ' যুক্ত গান লেখা হচ্ছে, যে বাংলায় কবিতা লেখা প্রায় সব লোকেরই অভ্যেস। শৈলেন্দ্র সেদিক থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন যাঁর গানের শরীর আমাদের সুস্থ ভাবনার সুযোগ দিত—'জুতা হ্যায় জাপানী' ও'র এই গানটাই ধরা যাক, সহজ সরল কথা অথচ বিশ্বভ্রাতৃত্বের কি সুন্দর প্রকাশ!

আর্ট ফিল্ম এখন ভারতেও বেশ কিছু নির্মিত হচ্ছে। কায়দা করে কেউ কেউ 'অফ বীট ফিল্ম'ও বলছেন। নামকরণ যাই হোক, সঙ্গীতের ব্যবহার এ সব ফিল্মে কিন্তু বেশ পরিণত। রবিশংকর-আলি আকবর-বাহাদুর খাঁয়েরা এখানে কম্পোজারের ভূমিকায়, তাই সুরমূর্ছনা স্বাভাবিক ভাবেই অনেক অনেক অর্থবহ এবং চিন্তার ফলশ্রুতি। পথের পাঁচালী, কাবুলিওয়ালা, ঝিন্দের বন্দী, কিংবা সুবর্ণরেখার কথা আমাদের স্মৃতিতে এখনও দেদীপ্যমান। এ সব ছবির ধরন পাশ্চাত্য মেথডকে অনুসরণ করে—ফিল্ম পরিচালকের ভাবনার অঙ্গ হিসেবে সঙ্গীত থাকে, তিনি সেটা অনেক সময় নিজেও করেন, যেমন সত্যজিৎ রায় করে থাকেন—অন্য কাউকে দিয়ে করালে অবশ্যই নিজের চিন্তা-ভাবনার শরিক করে নেন তাঁকে। অর্থাৎ গোটা ব্যাপারটাই ফিল্ম পরিচালকের নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে পরিণতি বোধটা অনেক সময় কাজ করে এখানে। আবহ উঁচু মানের হয়, প্রয়োজন ছাড়া গান ব্যবহৃতই হয় না। এতে ছবিটি যেমন সুসংগঠিত ভাবে, শৈল্পিক প্রক্রিয়ায় নিজের কথা বলতে পারে, সঙ্গীত রচনাও একটি অপরূপ বিশিষ্টতা অর্জন করে।

সত্যজিৎ বেশ কিছুদিন ফিল্ম সঙ্গীতে যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহারের রিয়ালিটি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। 'গুপী গায়েনে···' তাঁর সেই চিন্তার অবসান হয়েছে বলেই মনে হয়, ওখানে যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। চিত্তাকর্ষক হয়েছে এবং

অর্থবোধে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হয়নি। আসলে আবহসংগীত বেজে তো আমাদের জীবনও এগোয় না, তাই ফিল্মী গানে বাজনা এলে বাস্তবতা নষ্ট হবে, তা না ভাবাই ভাল। কমিউনিকেট করার বিষয়টিই প্রধান। বরং ঋত্বিক ঘটক এ ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন, তাঁর যে কোন ছবিই গান ও আবহ সংগীতের ব্যবহারে অনুপম।

সত্যজিৎ নিজেই বিশিষ্ট কম্পোজার, কিন্তু গানের প্রয়োগ তাঁর ছবিতে খুবই কম দেখেছি আমরা। ঋত্বিক সেদিক থেকে ব্যতিক্রম। গান গল্পকে বা পরিচালকের ভাবনাকে কতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, ঋত্বিকের 'কোমল গান্ধার', 'যুক্তি তক্কো', 'বাড়ী থেকে পালিয়ে', 'সুবর্ণরেখা', 'মেঘে ঢাকা তারা' —প্রায় সমস্ত ছবিই তার অজস্র উদাহরণ দেবে। আমরা কি যুকি তক্কো-র সেই দৃশ্যটি ভুলতে পারি যেখানে বঙ্গবালা বাংলার প্রতীক হয়ে ছুটছে—আবহে তখন সেই গান 'আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় ...' পর্দায় তখন বাংলার প্রকৃতি হাসছে তার জলপ্রপাতে ঝর্ণায়, মনোরম গাছগাছালীর দৃশ্যে, কোমল বনানী প্রান্তরে, মাঠে সবুজ ধানের হাসিতে। এই দৃশ্যটি ছবিটিকে পরিচালক কোন্ খাতে বওয়াতে চাইছেন, তা' বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট, কিংবা যখন রুক্ষ পুরুলিয়ার গ্রামে ছো-এর মুখোশ শিল্পী সেই বৃদ্ধটি, বঙ্গবালার মুখ দুর্গার মুখোশ—দেবব্রত ভরাট গলায় গেয়ে ওঠেন, 'কেন চেয়ে আছো গো মা...'। এগুলো তীব্র অনুভূতির বিষয়, লিখে বোঝাবার বিষয় নয়। তবু ছবিটি যাঁরা দেখেছেন এ দুটি গানের প্রয়োগ তাঁরা নিশ্চয় দীর্ঘকাল স্মরণে রাখবেন, ছবিটা ভুলে গেলেও যেতে পারেন। ঋত্বিকের এই 'থীম' সুরের বিষয়টি একজন উঁচু পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গী হওয়া উচিত। 'কোমল গান্ধার'-এ 'এসো মুক্ত করো', 'অবাক পৃথিবী' এসব গানের দৃষ্টান্তকেও ছাপিয়ে যায় প্রয়োগ নৈপুণ্যের জন্যই কেবল,— দেবব্রতর সেই অসাধারণ গানটি—'আকাশ ভরা সূর্য তারা' পর্দায় তখন সেই বাংলার চিরায়ত দৃশ্য যা ঋত্বিকের অনুভবে তীব্রভাবে আচ্ছাদিত ছিল—দূরে পাহাড়, বনানী—ওপরের নির্মল আকাশ—গায়ক এক খোলা মনেই শিল্পী। কিংবা সুবর্ণরেখার পরিত্যক্ত জনমানবহীন এয়ারপোর্টের রানওয়েতে সীতার মুখে রাগাশ্রয়ী গানটি অথবা ছবির থীম সঙ্গীতটি—'ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়'— এসবই ঋত্বিকের চিন্তাভাবনার একসূত্রী বল, যা ওঁর ছবিতে ছবিতে মণির মত ছড়ানো রয়েছে। আমরা কি ভুলতে পারি 'মেঘে ঢাকা তারা'র সেই দৃশ্য —রুগ্না ক্ষয়ে যাওয়া নীতা, ওর স্বপ্নকে ঘিরে অনিশ্চিতের নিত্য দোলা,

আপোষহীন সংগ্রাম—দেবব্রত ওর সেই স্বপ্নকে বিষাদতর করে তোলেন, আমরাও কেমন যেন কষ্ট পেতে থাকি নীতার জন্য,—সেই গানটিই মুখ্য ভূমিকা নেয়—'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে' ...এক নিঃসীম বেদনার আর্তি ছড়িয়ে দেবব্রত নীতার জনাই যেন গানটি গেয়ে ওঠেন—তার দুঃখের শরিক হয়ে পড়ি আমরাও।

'ঋত্বিকের ছবিতে গান যেভাবে নাট্যভাবনার অন্তর্গত হয়ে পড়েছে—সেটা পৃথিবী জুড়ে কোনও পরিচালকের ছবিতেই হয়ে ওঠেনি। আসলে যে অনন্য অনুভবশক্তি থাকলে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করা যায়, তাদের জ্বালা-যন্ত্রণা প্রতিকারের শপথের অংশীদার হওয়া যায়, ঋত্বিকের তা' ছিল। ছিল বলেই তাঁর ছবির মতই, গানও অনুপম প্রয়োগ মাধুর্যে বিশিষ্টতম হয়ে উঠেছে। ঋত্বিকেব ছবিতে গান সফিস্টিকেশনে ভোগে না, আবহও না,—স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তা' ছবির মেজাজের সাথেই এসে পড়ে। সত্যজিৎ তাঁর ছবির ক্ষেত্রেও যেমন সফিস্টিকেশনে জর্জরিত হন, তেমন ভাবেই তাঁর মেজাজ-মর্জি মতো আবহ কিংবা গান ব্যবহৃত হয়। আরোপিত মনে হবার আশঙ্কা সেক্ষেত্রে থেকেই যায়—উপলব্ধিগত সচেতনতাই কেবল সেটুকু ধরে উঠতে পারে। 'গুপী গায়েনে...' এ সবের ঊর্ধ্বে তিনি ছিলেন, তাই গান ভাল লাগে সেখানে। একই পদ্ধতির 'হীরক রাজার দেশে'-র গান নিশ্চয়ই তেমন হয়নি, অথচ সংগীত বিষয়ে ভারতবর্ষে সব চেয়ে গুণী কয়েকজনের মধ্যে সত্যজিৎ অন্যতম। তাঁর সফিস্টিকেশন জনসাধারণের অন্তর স্পর্শ করতে পারছে না, তাঁর গান আবহও তাই, যদিও মান অসম্ভব উঁচু। আবহ কিংবা গান ব্যবহারে মৃণাল সেন এঁদের দু'জনের থেকে অনেক কম চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন। আর আনন্দশংকরের আধা-বিলিতী আধা-দিশী সংগীত রচনা কতটাই বা একটা ছবিকে সাহায্য করতে পারে?

ঋত্বিক এক্ষেত্রে অন্ততঃ শ্রেষ্ঠতম আসনটি দাবি করতে পারেন।

আধুনিক গানের ভবিষ্যৎ কোন পথে

স্থান : কোলকাতার একটি খ্যাতনামা রেকর্ডিং স্টুডিও। বিষয় : সংগীত গ্রহণ, অবশ্যই আধুনিক। কুশীলব জনা তিরিশেক। বুস্টম্যান, রেকর্ডিস্ট, মাল্টিচ্যানেল কন্ট্রোলার, এয়ার কন্ডিশনার, হেডফোন—এরই মাঝে জনা বিশেক যন্ত্রী, একজন গায়িকা, বংশদন্ডপ্রায় কিছু একটা হাতে জনৈক অ্যারেঞ্জার ঘর্মাক্ত ঐ 'শীততাপে'ও—ব্যস্তসমস্ত তিনিই সবচেয়ে বেশি। হারমোনিয়ম নিয়ে মাজা-ঘষা যিনি করছিলেন, জানা গেল তিনিই সুরকার। তিনি সুর দিয়েছেন, বাকি যন্ত্রীরা সব 'কাজ' করতে এসেছেন। অ্যারেঞ্জার মশাই যন্ত্রীদের বোঝালেন, এখানে একটু প্যাথস্ মারতে হবে; আর ক্যাচিংটার রিদম্‌টা একটু সফট্ হবে। সুবিধামতন 'জায়গায়' কাউন্টার 'পুশ' করতে হবে। যন্ত্রীরা সবাই ঘাড় নাড়লেন। ওঁরা বুঝেছেন।

গান মনিটর হল। সুরকার ভদ্রলোক কিছু বোঝাতে চাইলেন। অ্যারেঞ্জার মশাই যন্ত্রীদের ফের নির্দেশ দিলেন—প্যাথস্ নয়, ওখানে একটু ক্র্যাশ্ মিউজিক হবে। যন্ত্রীদের অনেকের কাছেই সুরের অনুলিপি কিংবা গানটিও নেই! অনেক লিখতে হয়…! গান টেক হলো। চলে যাবে,—সবাই বললেন। আরেকটা টেক্? রেকর্ডিস্ট্ তীব্রভাবে ঘাড় নাড়লেন,—উঁহু, আজ আরো পাঁচখানা গানের অ্যালটমেন্ট আছে, আর এ যা হয়েছে বেশ হয়েছে। অতএব গানটি রেকর্ড হয়ে গেল, দু'তিনমাস বাদে শোনবার পালা আমাদের।

এই হচ্ছে একটি আধুনিক গানের জন্ম-ইতিহাস। লক্ষণীয় যে গীতিকার ভদ্রলোক স্টুডিও-র ধারেপাশে নেই। ওঁরা থাকেনও না। অনেক সময় সুরকারও থাকেন না, ক্যাসেটে সুর চালান হয়ে যায়। দৃষ্টান্তটির উপস্থাপনা এটা বোঝাবার জন্যই যে গীতিকার সুরকার শিল্পী—কারোরই সামান্যতম ভাবনা বা অভিনিবেশ নেই গানটির জন্য। বাণিজ্যিক জগতে এসবই সম্ভব—সবটাই সংখ্যাভিত্তিক কিংবা পরিমাণভিত্তিক—গুণগত মানভিত্তিক ভাবনা আদৌ নেই। তাই একটি গানের সৃষ্টির পেছনে কোনও তাগাদা, কোনও অনুধ্যান কাজ করে না। সবাই শুধু 'কাজ' করে যান।

অথচ শিল্প-সাহিত্যের সবচেয়ে সক্রিয় মাধ্যমটি হচ্ছে গান এবং তার মধ্যেই জনপ্রিয়তম যা 'আধুনিক' নামে বিশিষ্ট। ফিল্মের প্রভাব অনস্বীকার্য কিন্তু যান্ত্রিক অসঙ্গতিহেতু তা' সর্বত্র প্রদর্শনযোগ্য নয়, কিন্তু দু'চার ব্যাটারীর রেডিও অজ পাড়াগাঁয়েও অনায়াসলভ্য এখন এবং ফলতঃ গানও। এমন নজিরও বহু মিলবে যে ফিল্মের প্রদর্শন বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু তার গান সদর্পে বেজে চলেছে। রেডিও-র প্রচারসূচীর সিংহভাগই গান। রেকর্ড কোম্পানীসমূহও অন্ততঃ নব্বুই ভাগ গানের ওপর নির্ভরশীল। সিনেমাওয়ালারাও গুটি ছয়েক গান ছাড়া সিনেমা বানাচ্ছেন না। কাজে কাজেই রেডিও রেকর্ড সিনেমা আজকের জনমানসের সাংস্কৃতিক রুচিবিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখনীয় ভূমিকা পালন করে। 'রুচিবিকাশ' বিষয়টি অবশ্যই ঘটছে না, কিন্তু এই তিনের নিয়ন্ত্রণের বাইরেই বা যাওয়া যাচ্ছে কৈ? অক্টোপাশের মতই এঁরা ছেঁকে ধরে আছে সামাজিক 'রুচিবিবর্তনের কাঠামোটিকে। পরিবর্তনের যে কোনও সুস্থ ইঙ্গিত বৃথাই আছড়ে পড়ছে এই তিনের সুরক্ষিত দেয়ালে।

•এবংবিধ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই লালিত হচ্ছে 'গান'—লালনপালনের মুখ্য ভার রেকর্ড কোম্পানীর, বিস্ময়করভাবেই রেডিও-র নয়। এটা তো প্রমাণিত

সত্য যে আমরা অহর্নিশই রেকর্ডের গান নানান শিরোনামে বাজতে শুনছি রেডিও থেকে। যেন একটা চুক্তিই হয়ে আছে—আমি রেকর্ড বানাচ্ছি—প্রচারটা তোমার দায়িত্ব। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারী আওতায় লালিত রেডিও প্রতিষ্ঠান এখন কেবল ব্রডকাস্ট মাধ্যমমাত্রই। এর কোনও সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপ নেই। ব্যবসাদারদের পোয়াবারো—কেন না গানের বাজারের ক্ষেত্রে তারা একচ্ছত্র মালিকানার অধিকারী, বিনি পয়সার প্রচারের জন্য তো রেডিওই আছে।

দুই

'আধুনিকতা' বিষয়টি কিঞ্চিৎ জটিল—এই অর্থে যে, এর কোনও বাঁধাধরা সংজ্ঞা নেই। আমরা বরং আপাতগ্রাহ্য মাপকাঠি স্থির করে নিই। আধুনিক অর্থে সমসাময়িকতা বোঝাবেই—যা চিরন্তন না হবারই সম্ভাবনা; এবং যেহেতু সমসাময়িকতাই এর প্রধান বিশিষ্টতা, সেহেতু পরীক্ষানিরীক্ষা ও নানান মিশ্রণের সম্ভাবনাও এখানে বেশি, কেন না শাস্ত্রীয় কিংবা লোকসংগীতের বিশুদ্ধতা নিয়ে এ গানের মাথাব্যথা নেই। আবার এ গান জমিদারদের বিলাসব্যসনের উপাদানও নয়, যেমন নয় খেউড় বা পাঁচালী। আসলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একেবারে মানানসই হয়ে ওঠা গানই আধুনিক গান।

এই যে একটা চলনসই সংজ্ঞা এতে করে আমরা স্পষ্টতঃই দেখতে পাব, রবীন্দ্রনাথই হচ্ছেন, আমাদের সাহিত্যসংস্কৃতির প্রায় সব বিষয়েই যেমন, প্রথম 'আধুনিক' সংগীতকার। তাঁর গান জমিদার-লালসা মেটানো গান নয়; মার্গ সংগীতের শুচিবাই ভাবটিও অনুপস্থিত, যেমনটি দেখি না লোকসংগীতের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। আসলে দুঃসাহস এবং এইসব নানাবিধ-সাংগীতিক রসসংমিশ্রণে, পাশ্চাত্য সংগীতও বাদ পড়েনি, রচিত হয় তাঁর গানের কাঠামো, যার বাণী একান্তভাবেই স্ব-উপলব্ধিজাত। সুর সেখানে অনুপূরকের কাজটি করে যথার্থ অম্লানতায়। সুর, বাণী এবং এই দুইয়ের অন্তর্নিহিত ভাব—এই ত্রিসঙ্গম তাঁর গানকে 'সমসাময়িকতা'র গহ্বরে নিক্ষেপের দুঃসাহস রাখে না। আপন মহিমায় অবাধেই তা' উত্তীর্ণ হয় চিরন্তন ও বিশ্বজনীনতার শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ে।

একটি ছোট্ট বিতর্ক উঠেও যেতে পারে: সমসাময়িকতাই যার প্রধান বিশিষ্টতা রবীন্দ্রসংগীতে তো তার কণামাত্রও নেই। তবে কিসের জন্য তা' আধুনিকতার প্রথম উদ্গাতার দাবী রাখবে? উত্তর একটাই, তা' হচ্ছে সমসাময়িকতা,

অল্পবিস্তর সব বিষয়কেই প্রভাবান্বিত না করে পারে না—সাহিত্য শিল্প রাজনীতি তথা সংস্কৃতিকে। চিরন্তন বা শাশ্বত হতে ত' কারো বাধা নেই। তা' ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আধুনিক গানের প্রথম উদ্গাতা বলতে কুণ্ঠা থাকার কথা তাঁদেরই যাঁরা আধুনিক গান সম্বন্ধে নাসিকাকুঞ্চন করে থাকেন কারণে অকারণে। আমরা তিরিশ দশকে রবীন্দ্রনাথকে বিরোধিতা করতে দেখেছি অনেক কবিকে—রবীন্দ্রকাব্য বিরোধিতাই তখন ছিল আধুনিক কবিতার লক্ষণ। আসলে এসব যুক্তি সচল হয়ে ওঠে না কখনই; গানের ক্ষেত্রে বাড়তি একটা ব্যাপার থেকেই যায়—সুররচনা। এটি বেশ শক্ত কাজ। তাই থরে থরে বাংলা কবিতা যতই সাজানো থাক্, সুরভাণ্ডার আমাদের তত সবল নয়।

রবীন্দ্রনাথের পর একটি সবিশেষ উল্লেখনীয় ও বিশিষ্ট ধারা আমরা পাই—অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং নজরুলের সংগীতরচনায়। উল্লেখনীয় সেই বিশিষ্টতা হচ্ছে: রবীন্দ্রনাথের পদাংক এঁরা সকলেই অনুসরণ না করলেও একটি বিষয়ে তাঁরা অভিন্ন ছিলেন। তা হচ্ছে গীত রচনা ও সুর রচনা তাঁদেরই। গীতিকার ও সুরকার অভিন্ন হলে গানের জমিটাও সোনা ফলায়। বাণী এবং সুরে লাগে না দ্বন্দ্ব অথবা ভাবপ্রকাশের যে দ্বিমুখীনতা কিংবা ত্রিমুখীনতার করালগ্রাসে আধুনিক গান সততই ভাসমান তা এঁদের গানে অলভ্য। অতুলপ্রসাদী গানে ভক্তিরস প্রাধান্য পায়, দ্বিজেন্দ্রগীতিতে ব্যঙ্গরস আবার নজরুলে এসে তা' রবীন্দ্রনাথের গানের মতই ব্যাপ্তি লাভ করে।

সত্যি কথা বলতে কি, নজরুলই এদেশে প্রথম ব্যবসায়িক আঙিনার সার্থক সুরকার। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর মত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন, তাছাড়া তিনি পারিপার্শ্বিক আনুকূল্য পেয়েছিলেন অনেক বেশি—তাই তাঁকে সংগীত বাণিজ্যের শিকার হতে হয়নি। অতুলপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে নজরুলের মত ব্যাপ্ত প্রতিভা ছিল না, অন্ততঃ সুররচনার ক্ষেত্রে—ফলতঃ নজরুলই আমাদের দেশে সংগীত বাণিজ্য সাম্রাজ্যের প্রথম শিকার, স্বক্ষেত্রে যিনি ছিলেন অধীশ্বর। অর্থাভাব এবং অমিত প্রতিভা—এই দুই কারণে নজরুলের সময় থেকেই এদেশের গান রেকর্ডমুখীন হয়ে পড়ে। অর্থসংস্থানের জন্য নজরুল রেকর্ড কোম্পানীর সুরকারের চাকুরী করেছেন—থিয়েটারের গান রচনা করেছেন—এই যে ব্যবসামুখীন সাঙ্গীতিক সাম্রাজ্য এখন এ দেশের বুকে স্ফীতকায় লোভের শিকড় গেড়ে বসে, তার শুরুই কিন্তু ওখান থেকে। চাহিদা পূরণের গান লেখা ও সুর করায় নজরুল খুবই ক্ষিপ্র পারঙ্গম ছিলেন। তাই

তাঁর গানে কিছু অসংগতি থেকে যায়, কিছু বিস্ময়কর রসভঙ্গ ঘটে। এসব মনে রেখেও বলা যায়, তাঁর নির্দেশিত পথটির পঁচিশভাগও যদি তাঁর উত্তরসূরীরা বজায় রাখতে পারতেন তা হলেও আধুনিক গান, যা এখন জনপ্রিয়তম, তার মানের এমন হতাশজনক মলিন অবয়ব দেখতে হত না।

তিন

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে রেডিও ও রেকর্ড কোম্পানির মধ্যে একটা অশুভ আঁতাত রয়েছে, যে আঁতাতের রসালো ফলটি ব্যবসায়ীরাই খেয়ে যাচ্ছেন। রেডিও-র পোষা গীতকারবৃন্দ আমি-তুমি-চাঁদতারা-কথাছিল-রাখনি ইত্যাকার মান-অভিমানের ফুসমন্তরী ছিঁচকাদুনে গান লিখছেন তাঁদের সুরকারবৃন্দও অক্ষম। তাঁরা না ব্যবসায়ী হতে পারছেন, না পারছেন সুস্থিত শিল্পাদর্শের প্রতি আস্থাবান হতে। প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীরা তাই ফিরে যাচ্ছেন, এমন কি তাঁদের বেতার অনুষ্ঠানেও, পুরোনো গানে। পনের-বিশ বছর আগেকার গানই এখন শ্রোতাদের আকৃষ্ট করছে। জগন্ময় মিত্র এখনও মুগ্ধ করেন তাঁর 'চিঠির' গানে, সুধীরলালের 'মধুর আমার মায়ের হাসি' এখনও হৃদয় ভরায়। সায়গল এখনও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। শচীনদেব বর্মনের গান শুনতে এই সেদিনও ময়দান উপচে গেছিল। শ্রোতারা সব এ যুগেরই। আসলে ভাল যা কিছু তার জন্য সময় কোনও প্রশ্ন নয়।

এতক্ষণে একটা বিষয় আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিষ্কার: শোচনীয়ভাবে মানহ্রাসহেতু অশ্রাব্য হলেও আধুনিক গানের পূর্বসূরীবৃন্দ কিন্তু সাংস্কৃতিক জগতের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব। মানহ্রাসের সবচেয়ে বড় কারণ আমরা শুরুতেই বলেছি—চিন্তা ও ভাবনার সুস্থিত বিকাশের অভাব। দাসমনোবৃত্তি এবং 'কাজ' এই দু'টিই বেশ ক্ষতিকর সৃষ্টিধর্মী কাজের পথে। সিনেমার গানের কু-প্রভাব পড়ছে আধুনিক গানেও, এর সমঝদারও কমছে তাই, প্রমাণ এইচ এম ভি 'বসন্ত বন্দনা'র রেকর্ড প্রকাশ প্রায় বন্ধই করে দিয়েছে। এই আশংকাজনক প্রেক্ষাপটের মাঝেই আধুনিক গানের ধারা প্রবাহিত অলসবিলাস ছন্দে। প্রতিবাদী অংশের ভূমিকা খুব কার্যকরী হয়ে উঠছে না। সরকারী ঔদাসীন্য (রেডিও-র মালিক: ভারত সরকার) ক্রমশঃ সংক্রামিত হয়েছে দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও। আধুনিক গানের নামেই যাঁরা নাসিকা কুঞ্চন করেন, তাঁরা আসলে একটা রোগকেই প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন—উন্নাসিকতা সব সময়েই

ক্ষতিকর—আধুনিক গানের ক্ষেত্রে আরো বেশি এজন্য যে এর জনপ্রিয়তা কিন্তু অসীম, ফলতঃ জনমানসে সুস্থ প্রভাব ফেলবার ক্ষমতাও উপেক্ষণীয় নয়। রবীন্দ্রনাথ নজরুল মোজার্ট বীটোফেন নিয়ে আসর মাতানো অবশ্যই সুস্থ লক্ষণ; পাশাপাশি একটি সম্ভাবনাময় সাঙ্গীতিক ধারার বিনাশ রোধে ভূমিকা নেওয়াতেও বা বাধা কোথায় ?

আধুনিক গানের মান হয়ত আদৌ সমস্যার বিষয় নয়, কিন্তু এর সামাজিক কুপ্রভাব কি উপেক্ষণীয় ? আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীবৃন্দ প্রশ্নটিকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে গেছেন। তাঁদের ধারণায় রবীন্দ্রনাথ-নজরুল এমন কয়েকজনের বাইরে যা গান তাই আধুনিক এবং সে কারণেই দুঃশ্রাব্য, বিবেচনার যোগ্যই নয়। ফাঁকে রোগটা বেড়ে যাচ্ছে সামাজিক সমস্যাও হয়ে দাঁড়াচ্ছে আধুনিক গান, যার কিন্তু এনে দেবার কথা ছিল রবীন্দ্র-নজরুলের সার্থক উত্তরসূর্যকে। ইলেকট্রনিক শব্দঝংকার, নায়িকাসুলভ 'উহ্ আহ্ প্লীজ' শীৎকার চীৎকারে মুখরিত হয়ে আধুনিক গান পাড়ার ছেলেদের মাথা খাচ্ছে আর আমাদের বুদ্ধিজীবীবৃন্দ ধূম্রপান করতে করতে বিঠোফেনে মগ্ন। হিমাংশু দত্ত, সুধীরলাল চক্রবর্তী, শচীনদেব বর্মণ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সলিল চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র—সুররচনায় এঁরা কিন্তু কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু গান লেখা আর সুর করার প্রতিভা সলিল চৌধুরীর মত দু' একজনেরই মাত্র ছিল। ফলতঃ এঁদের রচিত আধুনিক গানের দুর্গে থেকে গেল বহু ছিদ্র যে পথে অনুপ্রবেশ ঘটল বহু অবাঞ্ছিত জনের, ফলশ্রুতি আজকের এই হতমান বেদনাদায়ক পরিস্থিতি। সত্যি বলতে কি, বুদ্ধিজীবীদের এই সংঘবদ্ধ অনীহাই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবসায়ীদের উদর পূর্তির খাসা ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। গণনাট্য সংঘ গানের যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন তার সার্থকতার ধারায় আজও হাজারো তরুণ স্নাত, কিন্তু এইই সব নয়। প্রেরণা সৃষ্টি করার কথা থাকে বুদ্ধিজীবীদের—দেশে দেশে। কিন্তু এদেশে যখন তাঁরা সব আধুনিকী-করণের পক্ষপাতী তখন গানের এই দৈন্য তাঁদের কেন পীড়া দেয় না ভেবে পাই না। গান সম্বন্ধে গবেষণা কিংবা স্কুলপাঠ্য রচনা—এই-ই হচ্ছে মূলধন আমাদের, তাও মার্গসঙ্গীত কিংবা লোকসঙ্গীত বিষয়ক।

কবি সাহিত্যিকবৃন্দ এগিয়ে এসে গান লিখতে পারতেন। যেমনটি শুরুর চেষ্টা আমরা দেখেছিলাম প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশংকর, বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের বেলায়। গণনাট্য সংঘেরও উল্লেখযোগ্য কবিগোষ্ঠী ছিল—তাই বাংলা গানের

চেহারাটি তখন এত করুণ ছিল না। কিছু কিছু কবিতাতেও সুরারোপের ব্যর্থ চেষ্টা ইদানীং হয়েছে, যেমন জীবনানন্দের 'হায় চিল' বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর থেকে ফেরা' কিন্তু এসব ব্যতিক্রমও সফল হচ্ছে না সুরকারের চিন্তার দৈন্যে। আত্মকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীনিবন্ধ বুদ্ধিজীবীবৃন্দ সমাজের বৃহত্তর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন, ব্যবসায়ীদের ষোলআনা স্ফূর্তির সুযোগ করে দিয়ে তাঁরা নিধুবাবুর টপ্পা নিয়ে মশগুল, অন্যদিকে ধূর্ত ব্যবসায়ীদের শব্দঝংকারে, যৌনরসাত্মক কথা ও ইলেকট্রনিক সুরঝঞ্ঝনায় হাজারো তরুণ অপসংস্কৃতির বড়িটি গিলছেন —যে সামাজিক সমস্যার কথা আমরা এতক্ষণ বোঝাতে চেয়েছিলাম—এ সেই সামাজিক সমস্যার ফলশ্রুতি। আধুনিক গান মানে চিত্তবিনোদন, হৈ হুল্লোড় নাচনকোঁদন।

চার

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়, পরেশ ধর, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরীদের মত প্রতিভার সম্মেলনে পঞ্চাশ দশকে গণনাট্য সংঘের গান বাংলা গানকে সমৃদ্ধতর হবার দরজা খুলে দিয়েছিল। সৃষ্টিশীল মনের এ এক গোষ্ঠীবদ্ধ সুপ্রকাশ যাতে মানুষের চিরন্তন আশা-আকাংখা-বেদনা-প্রতিবাদ ভাষা পেয়েছিল, যাতে লুকিয়ে ছিল প্রতিবাদের কশাঘাত—সুর ও কথার সংমিশ্রণ মানুষকে আলোকিত পথ দেখিয়েছিল। এমনটি যে সম্ভব আমাদের তদানীন্তন বুদ্ধিজীবীবৃন্দ কিন্তু ভাবতেই পারেননি। যদি বলা হয় যে পরীক্ষা নিরীক্ষার দুঃসাহসিকতায় নাটকের চেয়ে গানের ক্ষেত্রেই গণনাট্য সংঘের অবদান বেশি তাহলে খুব ভুল বলা হবে না। ভরসা এই যে সেই ধারারই সার্থক ঐতিহ্যবাহী তরুণ যুবকেরা গণনাট্য সংঘকে আঁকড়ে ধরে আছেন—গণ সঙ্গীতের অভ্যুদয় হয়েছে এবং জনচিত্তজয় শুধু নয়, আপন কথাটিও সে সদর্পে বলে বেড়াচ্ছে।

এই যে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ এবং প্রতিবাদী গানের অভ্যুদয়, মালিক শাসক শোষক কেউই এটিকে ভাল চোখে দেখেন না। তাই রেডিও এ গানের প্রচারে সমুৎসুক নয়। রেকর্ড কোম্পানীও মুনাফার হার না বুঝে ব্যবসা করতে রাজী নন। তাঁরা যখন এসব গানের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন, কেবল তখনই এসব গান তাঁদের আঙিনায় প্রবেশ করল। তাই পঞ্চাশ দশকের জনপ্রিয়তম গান রেকর্ড-আকারে চলছে মাত্র এখন! প্যারালাল সঙ্সের ভূমিকা' দেশে বিদেশে বেশ বড় পরিবর্তন এনেছে। ডিস্কোর এই গানের দুনিয়া তাৎক্ষণিক,

বড় বেশি ভঙ্গুর, যেমন ভঙ্গুর প্রমাণিত হয়েছে রক এন রোল, বিটলস্ কিংবা এই জাতীয় যে কোনও মাদকী আধুনিকতা। রেকর্ড কোম্পানীই কবুল করেছেন এই সেদিন বিভ্যু সাহেবের দ্বিতীয় লং-প্লেয়িং-এর বাজার সুবিধার নয়। অথচ জনরুচির দোহাই পেড়ে এঁরাই জনরুচিকে গোল্লায় পাঠাচ্ছেন: ব্যবসায় যা হয় পাঁচরকম ফন্দিফিকির ছাড়া হল, যেটি টিকে গেল, তাও প্রচারগত কৌশলেই কেবল, সেটিই কিছুদিনের জন্য মডেল হয়ে গেল। জনরুচির গান সম্বন্ধীয় কোনও বিশেষ দাবী থাকতে পারে না। আসলে তাঁদের যা দেওয়া হয় ওরই মধ্যে ভালমন্দ বেছে অনুরাগ প্রদর্শন করা ছাড়া তাঁদের গতি থাকে না। এই একচেটিয়া মালিকানার কোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে তাই গানের নাভিশ্বাস হবার উপক্রম। শ্রোতারা এখানে ক্রেতার ভূমিকায়, শিল্পীরা বিক্রেতার ভূমিকায় 'জাস্ট প্রডাক্টস্ গুডস্'! ধনতন্ত্রের অবিসংবাদী ফলশ্রুতি প্রেরণাহীনতায় এর চেয়ে ভাল কিছু হতে পারে না।

শাসকশ্রেণীর ভূমিকা যেখানে শোষকের সেখানে গণচেতনা সম্প্রসারিত করে গণশিক্ষার পরিবাহী হয় এমন যে কোনও বিষয়ই তাদের চক্ষুশূল, তাই গণনাট্য সংঘের প্রতিবাদী ভূমিকা যখন জনসাধারণের অন্তর জুড়ে, তখনও তার ভূমিকাকে যথার্থ মর্যাদা দিতে, তাকে স্থান করে দিতে শাসকশ্রেণীর এত আপত্তি কেবল বিপত্তিরই ভয়ে। তার চেয়ে ছেলে ছোকরারা যাক্ না, বাবা তারকনাথের গুণকেত্তন শুনে নাচুক না মাদক গানে—আমরা নিশ্চিন্তে কায়েম থাকি নিজের সিংহাসনে। যেমন সংস্কৃতি-সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও, কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্যই আসলে সামাজিক দিক থেকে সমস্ত ব্যাপারটিকে আরো জটিল এবং ব্যবসায়ীদের পক্ষে আরো সুগম করে তুলেছে। আর রেডিও, টিভি, ফিল্ম ডিভিশন পত্রপত্রিকা—এত বিশাল প্রচারবাহিনী ইচ্ছে করেই সমস্ত ব্যাপারটিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। তাই গান পৃষ্ঠপোষণার দায়িত্ব বর্তায় রেকর্ড কোম্পানীর ওপর। তাই রেডিও অবলীলাক্রমে অবহেলা করে চলে গণসঙ্গীতকে, কালের বিচারে আসলে এই-ই আধুনিকতম। রবীন্দ্রনাথকে প্রচারে যারা বাধা দেয়, তাদের থেকে অবশ্য এর চেয়ে বেশি আশা করাই হয়ত অন্যায়।

অন্ধকারাচ্ছন্ন এসব দিক সত্ত্বেও আশার আলো দেখতে পাই আমরা কিছু প্রবীণ ও তরুণ শিল্পী-সুরকার-গীতিকারের নিষ্ঠায় যাঁরা আদর্শকে স্থান দিয়েছেন লোভ এবং তক্‌মার ওপরে। গণনাট্য সংঘ ও বিভিন্ন কয়্যারের সেই সব শিল্পীরা পথে-প্রান্তরে গানের আধুনিকতম পসরা সাজিয়ে গাঁয়ে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছেন;

গণচেতনাকে সংগঠিত করছেন, স্থূল আনন্দবিতরণ শুধুই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না কখনও, আজও নয়। বিকল্প সাঙ্গীতিক এই আশাটির ওপরই আমরা ভরসা করতে পারি, তুমি-আমি-চাঁদ-ফুলের আধুনিকতা দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে আবার জেগে উঠছে মানুষের গান। ঘোষিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের জয়গান।

আধুনিকতম এই সাঙ্গীতিক ধারাটির অমিলন সাফল্যেই বাংলা গানের ভবিষ্যৎ সাফল্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে। ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার খোলস ছেড়ে সমষ্টির গানে নিয়োজিত হোক্ আধুনিক গান—অত্যাচার আর অপসংস্কৃতির ভিত্ আবার কেঁপে উঠবে, যেমন চল্লিশ পঞ্চাশ দশকে কেঁপে উঠেছিল।

সাম্প্রতিক থিয়েটার ও মধ্যবিত্ত মানসিকতা

শিশির মঞ্চে সেদিন খড়্গপুরের 'আলকাপ' নাট্যগোষ্ঠীর 'শাইলক' দেখলাম। ওঁদের বিজ্ঞাপনটা বেশ নাড়া দিয়েছিল—অসম্মানজনক শর্তে আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার থেকে ঋণ গ্রহণের প্রতিবাদে শেক্সপীয়রের 'দি মার্চেন্ট অব্ ভেনিস' অবলম্বনে 'শাইলক'। নাড়া দেবার কারণ একটাই—সাম্প্রতিক বিষয়বস্তু নিয়ে কোনও নাটক অনেকদিন দেখি নি। যা দেখে আসি অধিকাংশই ফর্মুলার গল্প—প্রগতিবাদী একটা প্রলেপ অবশ্যই থাকে, কিন্তু বিষয়বস্তুর সরলীকরণে সমস্যা—তা' যতই সাম্প্রতিক হোক না কেন, সমস্যাই থেকে যায়; এক গূঢ় আস্তরণে ঢাকা পড়ে প্রেক্ষাগৃহের চারিদিকে ভাঙ্গা রেকর্ডের মত বাজতে থাকে—আমাদের হৃদয়ে তার প্রবেশ করা হয়ে ওঠে না। আঙ্গিকে বেশ চমক থাকে, উপস্থাপনায় থাকে গিমিক, প্রবল ব্যঞ্জনাময় অভিনয়, শিল্যুয়েট এবং বর্ণ-বাহারী আলোর ফিকির—শ্রমিক কৃষকও বাদ পড়ে না। কিন্তু এত মার্জিত, এত বুদ্ধিদীপ্ত তাঁরা যে তাঁদের জন্য আর সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের ডাকে সামিল হতে ইচ্ছে করে না।

শিল্পের সবক্ষেত্রে যেমন, থিয়েটারেও দুটি অবশ্যম্ভাবী শিবির দুই মেরুতে অবস্থান করে নিজের নিজের কাজ করছে। শ্যামবাজারী থিয়েটার মাড়োয়াড়ী মহাজনের মত বেওসার ফন্দিফিকির এঁটে চলেছে। নিত্য নতুন পসরা সাজিয়ে সে মোহসৃষ্টির আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে—ছিঁচকাঁদুনে বিষয়, ক্যাবারে নৃত্য, ভাঁড়ামো, নারীর নারীত্ব হরণের হেতু ক্রন্দন এবং শেষ অবধি ইচ্ছাপূরণের ন্যাকা ন্যাকা গল্পে সে সততই হাজির। ঠিক যে যে কারণে হিন্দি ফিল্ম জনপ্রিয়, তার ওপরে সে সংযোজন করে একটি মহার্ঘ বস্তু—সেন্টিমেন্ট। বাঙালীর চিরন্তন সেন্টিমেন্টপ্রিয়তা তাতে সাড়া না দিয়ে পারে না। ফলে হাউসফুল, দর্শকদের অধিকাংশই মহিলা, নবদম্পতি-শ্যালিকাকুল। অথচ এটাত' ঠিক, বাংলা থিয়েটারের বিবর্তনে ষ্টার-বিশ্বরূপা-রঙমহলের অবদান কম নয়। এখন যে এঁরা বাংলা থিয়েটারের বিশাল ক্ষতি করছেন, তা' কিন্তু আমরা অনেকেই জানি—জেনেও পতঙ্গের মত ধাই।

তাহলে অপর শিবিরটি কি করছে? সেখানেও আকালের সন্ধান পাচ্ছেন অনেকে। আশংকাটা খুব অসত্য নয়। কেন না ফি-বছর তো নয়ই, দু' আড়াই বছরেও একটা নতুন প্রযোজনা করে উঠতে পারছেন না অনেক নাট্যগোষ্ঠী। অনেক লড়াই আর পরিশ্রমে সমৃদ্ধ আত্মত্যাগী অজস্র যুবকের প্রাণশক্তি নিংড়ে নেওয়া সেই গ্রুপ থিয়েটারের কথাই বলছি। সেখানেও আসলে একই সমস্যা। বিষয়বস্তুর রকমফের নেই, থাকলেও অতি সরলীকৃত। গত কয়েকবছরে প্রতিবাদী এইসব থিয়েটারের বিষয়বস্তু মোটামুটি একই বিষয়ের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে—অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক বঞ্চনা। বিষয়টির অসামান্য গুরুত্ব স্বীকার করেও বলা যায় এর অন্তর্নিহিত গভীরতা ও জটিলতা সম্পর্কে আমাদের নাট্যগোষ্ঠীসমূহ আদৌ সচেতন নন। শ্রেণী-সংঘর্ষের একটি বিশেষ চেহারা বারবার এসব নাটকে বিধৃত হয়, একই কায়দায় এবং এত সহজ তার সমাধান যে আমরা আমাদের প্রথম উপলব্ধিতে ফিরে আসতে বাধ্য হই—এই লড়াইয়ে সামিল হতে ইচ্ছা যায় না আমাদের। ডাকটা বড় অগভীর, বড় সখের। আহ্বানটায় দায়ফুরোনো গোছের একটা দায়িত্বহীন অবিন্যস্তভাব দেখা যাচ্ছে।

ভাল নাটক যে আমরা পাই নি তা' কিন্তু নয়। 'বহুরূপী'র প্রযোজনায় রবীন্দ্রমানসিকতার প্রভাব সুস্পষ্ট। সমষ্টি সাধারণের জন্য তাঁদের নাটক নয়, যেমন নয় গ্রুপ থিয়েটার সমূহের প্রতীকী নাটকগুলিও। কোলকাতা ও শহরতলির মুষ্টিমেয় দর্শকবৃন্দের যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত এসব নাটক কিন্তু সত্যিই

জনসাধারণের গরিষ্ঠাংশের বুদ্ধির অগম্য। তাই নাটক ও মঞ্চায়নের হিসেবে এদের যতই রৈ-রৈ সার্থকতা থাক, আসলে তা' এলিট দর্শকশ্রেণীর জন্যই পরিকল্পিত ও প্রযোজিত।

অর্থনৈতিক শোষণ ও শ্রেণীসংগ্রামের যেসব নাটক আমাদের দেখে আসতে হয়, সেসব নাটকের অগভীর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং এক ধরনের প্রগতিবাদী চাতুরী আমাদের আহত না করে পারে না। নাট্যপ্রযোজনাগুলিও ক্রমশঃ পঙ্গু হচ্ছে এই অসংহত অসদাচরণে। বাংলা নাটকের বিবর্তনের ধারাটি নাড়াচাড়া করলে দেখতে পাব বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' থেকেই বাংলা নাটকে তার ঐতিহাসিক বাঁকটি নিয়েছে, সামাজিক জীবনের সমস্যা ও তার কারণ সমূহও নাটকে বিশ্লেষিত হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রভাব ফেলছে নাটকে। তখন নেতৃত্ব দিয়েছেন গণনাট্য সঙ্ঘ—পরে সেই ধারারই ছত্রাখান্ অংশে বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারের জন্ম। থিয়েটারের আঙিনায় বৈচিত্র্য প্রবাহের শুরু সেখান থেকেই—নানান্ রকমফের: সৎ নাটক, অ্যাবসার্ড নাটক, নব নাটক, গণ নাটক, থার্ড থিয়েটার, অরিণা থিয়েটার। কিন্তু সেই বৈচিত্র্য কেবল মঞ্চ আর আলোর বর্ণবাহারীতে, কেতাদুরস্ত স্মার্ট উপস্থাপনার অভিনবত্বেই; বিষয়বস্তু থেকে যায় সেই একই, যদিও তা' আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মনোযোগ আকর্ষণের বিষয়; এর কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বিষয়।

বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। এই যে শোষণ ও শ্রেণীসংঘর্ষ—কিন্তু নাট্য অবয়বে তার দৈন্যদশাই আসলে বিচলিত করে তোলে আমাদের। আমাদের দেখে আসতে হয় আইডিয়ালাইজড্ শ্রমিক চরিত্র সমূহ, যাঁরা তাঁদের আদর্শের জন্য সর্বস্ব অঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, তাঁরা হিন্দি গান শোনেন না, কাওয়ালী মুজ্‌রায় রাত কাটান না, মদ্যপান করেন না। আমাদের দেখতে হয় নিপাট ভালমানুষ, পরোপকারী রাজনৈতিক মানুষজন—নির্লোভ ও সৎ, আমরা দেখি লম্পট অত্যাচারী জমিদার-জোতদার-মালিকশ্রেণীর প্রতিভূ চরিত্রসমূহ। দেখে আসি তাঁদের আজ্ঞাবহ, ভাঁড় নায়েব গোমস্তা চাটুকার বাহিনীর চরিত্র সমূহ, গুন্ডা-বাহিনী তো আছেই। অত্যাচার তীব্রতম পর্যায়ে ওঠে বিনা বাধায় এবং কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই তার প্রতিবাদে ধেয়ে আসে সাধারণ মানুষজন। শ্রমিক সাধারণ আমাদের নাটকে যেমন টাইপড্ হয়ে গেছে, তেমনই হয়েছে মালিকশ্রেণী—এবং এভাবেই টাইপড্ হয়ে গেছে, বিষয়টিও। সীমাবদ্ধতার এই যে শেকল, তা'

ভেঙে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা যে না হয়েছে এমন নয়, কিন্তু মধ্যবিত্ত মানসিকতা আমাদের বেশি দূরে এগুতে দেয় নি। ফলে রাজরক্ত, চাকভাঙা মধু, চাঁদ বণিকের পালা, সাজানো বাগান, টিনের তলোয়ার, জগন্নাথ, মারীচ সংবাদ, দানসাগর, অমিতাক্ষর এবং আরো কিছু নাট্যপ্রযোজনা (চাঁদ বণিকের পালার মঞ্চায়ন কি অসম্ভব ? নাট্যদলগুলি ভেবে দেখুন না !), যা নিশ্চিত ভাবেই অসাধারণ হওয়া সত্ত্বেও সীমাবদ্ধতার গন্ডি পেরুনো যাচ্ছে না।

আমরা মধ্যবিত্ত মানসিকতার কথা বলেছি এবং তা' অকারণ নয়। আমাদের নাট্যপ্রযোজনায় যা কিছু সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা—তার উৎস ঐ একটিই। এই যে সরলীকরণের রাস্তা আমরা বেছে নিই, তা' এক ধরনের নিশ্চিত আত্মপ্রবঞ্চনা। জেনেশুনে লোকঠকানো এবং গিমিকের চমকে লোকের চোখ নির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। আমরা অনেকেই 'নবান্ন' দেখি নি কিন্তু পড়েছি, যে মেঠো সজীবত্ব এবং গ্রামীণ আবহাওয়ায় গ্রামীণ মানুষ জেগে ওঠেন তার একটা প্রস্তুতি থাকে, আসন্ন লড়াইয়ের ফলে উজ্জীবিত বোধ করেন দর্শক পাঠককুলও। নাটকের আসল সার্থকতা সেখানেই, এখন যেমন—শুধুই আঙ্গিক সৌষ্ঠবের প্রতিযোগিতা, সংলাপের ভারি প্রতীকী আচরণ কেটে ভেতরে ঢোকা সাধারণ বোধবুদ্ধিতে অসম্ভব। ফলটিও অতএব শূন্যই। নাট্যপ্রযোজনার এই যে মধ্যবিত্ত মানসিকতা, সেটাই কোনও বিষয়কে দানা বাঁধতে দিচ্ছে না।

এটা একটা সাংঘাতিক বিপদের সূচনা করছে, এই যে চটজলদি দুঘণ্টার মেয়াদে অর্থনৈতিক শোষণ, শ্রেণীসংগ্রাম, অত্যাচার ও প্রতিবিধানের সরলীকৃত পথটি, সেদিক থেকে দেখলে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' থেকে আমাদের এসব নাটক এক ইঞ্চিও এগোয়নি—তাঁর নাটকের তীব্র অ্যাকশন ও ক্লাইম্যাক্স বরং অনুপস্থিত। আমাদের নাট্যকারবৃন্দের একটাই বড় দোষ—বিষয় নির্বাচনের বিশালত্ব। স্বয়ং ব্রেশটও বিষয় নির্বাচনে এতটা দুঃসাহসী ছিলেন না। সমাজের নানান্ স্তরের মানুষের ম্যানারিসের বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং তাঁদের সমবেত ভীড়ের মধ্য থেকেই ব্রেশটের মূল চরিত্রগুলি অ্যালিয়েনেটেড হয় বলেই চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। নাট্যদ্বন্দ্বেরও অভাব ঘটে না। আমাদের নাট্যকারবৃন্দ মধ্যবিত্ত সুলভ আচরণ আরো একবার করেন এভাবেই—বিষয়বস্তুর বিশালত্বে। ফলে প্রতিবিধানের পথটি অতীব সরলীকৃত হতে বাধ্য হয়, সংলাপ হয় 'শ্রেণী-সংগ্রামই এনে দেবে আলোকিত সূর্যের দেশ' এমনতরো—সাধ্য কি শ্রেণী-

সংগ্রামীদের এর ভেতরে ঢোকেন। অতএব মেড-ইজি হয়েই আমাদের নাটকগুলি খুশি থাকেন এবং তাঁদের নির্মাতাবৃন্দও।

আমাদের অধিকাংশ নাটকই বিবর্তনকে অস্বীকার করে ('মা' নাটক দেখুন, গোর্কি'র পাভেল, চিত্তরঞ্জন ঘোষের অনুবাদে কোনও রকম প্রস্তুতি ছাড়াই রাতারাতি শ্রমিক-নেতা বনে যায়, চরিত্রটির কোনও ইভল্যুশন বা ডেভেলপমেন্ট ছাড়াই) সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিবর্তনের বিষয়টি অবহেলায় ডাস্টবিনে পড়ে থাকে, অথচ এই বিবর্তনের ইতিহাসই আসলে প্রকৃত শিক্ষক। প্রতিবাদী এইসব নাটক আসলে মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে ধোঁকা দিচ্ছে না—কেন না তাঁদেরই জন্য তাঁদেরই সৃষ্টি এসব নাটক। ধোঁকা দিচ্ছে ওই সহস্র শ্রমিককে যাঁরা এনে দেবেন দেশের রক্তিম সাফল্য। সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের চাবিকাঠি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যক্ষের ধনের মত আগলে আছেন—ফলে আশংকার যেটি সেটি ঘটেই যাচ্ছে—আমরা নাটক দেখছি, চায়ের পেয়ালায় তুলছি ঝড়, কিন্তু কোনও মতেই প্রভাবিত হচ্ছি না, উজ্জীবিত হচ্ছি না, সহমর্মিতাবোধ সঞ্জাত হচ্ছে না আমাদের মধ্যে। শুধুই নাটক দেখা এবং তর্কে বহুদূর যাওয়া।

মধ্যবিত্ত চরিত্র কিঞ্চিৎ জটিল। পরিচালক-নাট্যকার-অভিনেতার গরিষ্ঠাংশ নিশ্চিতভাবেই ঐ শ্রেণীর আওতায়, কিন্তু কি আশ্চর্য, বাংলা নাটকে মধ্যবিত্ত মানসিকতার কোনও অ্যানাটমি নেই, এমন কি ব্রেশ্‌টীয় এই তীব্র প্রবাহেও না। মধ্যবিত্ত চরিত্রও আইডিয়ালাইজড্‌, আমাদের নাটকে শিক্ষক পিতার বামপন্থী পুত্রের অত্যাধিক্য—বৃদ্ধ শিক্ষক অসহায় আদর্শবাদী বামপন্থী, পুলিশ তাকে মারেই—পুত্রটি নায়কবৎ, কিন্তু সবটাই ঘটে আমাদের আরোপিত মমত্ববোধ আদায়ের জন্য। এই আইডিয়ালাইজেশন অর্থহীন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে প্রচ্ছন্ন অহং, যে ক্রুরতা-ভীরুতা, যে অর্ধশিক্ষা-কুশিক্ষা-কুসংস্কার (যত পুজোপার্বণ-সবেতে তো তাঁরাই নেতা হোতা।) তার কোনও বিশ্লেষণ নেই। ভ্রষ্টাচার বলব না, এ এক ধরনের আত্মবঞ্চনা—আয়নায় মুখ দেখতে ভয় পাওয়া, কেন না আমরা আমাদের চিনি জানি।

উৎসর্গীকৃত বহু যুবক-মানুষ এই থিয়েটারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ আমাদের থিয়েটারের যে ক্ষীণ ঔজ্জ্বল্য তা' তো এসব যুবারই অবদান। আমাদের বোঝা উচিত আইডিয়ালাইজড্‌ হওয়া মানেই রক্তমাংসকে অস্বীকার করা—যে নারী বর্ষ/দশক নিয়ে এত হৈ-চৈ গেল, একটি নাটকও কি আমরা পেয়েছি বাংলা তথা ভারতীয় নারীর সমস্যা নিয়ে? আমাদের সমাজব্যবস্থায় নারীত্বের

অবমাননা সবচেয়ে বেশী এবং তা' পুরুষদের হাতে, দেশে একজন নারী প্রধান মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও, এটা যে নাটকের বিষয় হয় না তারও কারণ ঐ মধ্যবিত্তসুলভ ক্রূরতা। নাট্যকারবৃন্দ সকলেই পুরুষ এবং তাঁরাও আয়নাটি আড়াল করতে চান। এম. এ. পাস মেয়ে বিচ্ছিরি সেজেগুজে বরপণের সাংঘাতিক পরীক্ষায় পাশ করে তবে কারো ঘরণী হয়, কারো জননী হয়। দাসমনোবৃত্তি আমাদের নারীর প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে, নারী প্রগতি আসলে শরৎচন্দ্রের সময় থেকে একচুল এগিয়েছে মাত্র।* একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব অপরদিকে পুরানো মূল্যবোধের নিয়ত দ্বন্দ্বে মধ্যবিত্তসমাজের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া উচিত ছিল আমাদের নাটকে আদৌ তা' হয়ে ওঠে নি। যে পুরোনো সমাজতান্ত্রিক পারিবারিক সংগঠন মধ্যবিত্তসমাজের নিয়ন্ত্রক, যৌথ পরিবার অবলুপ্তির সাথে সাথে তার অবলুপ্তি কিন্তু ঘটে ওঠে নি ; আকারে সে ছোট হয়েছে মাত্র তাই আমাদের সমাজে মেয়েরা এখনও পুরুষদের কাছে বাণিজ্যিক সামগ্রী মাত্র। এখনও একাকিনী রাতে বাড়া ফিরতে বাধ্য হলে 'চৌষট্টি বেণ্ট' জাতীয় উপন্যাসের পাত্রী আমাদের মেয়ে-স্ত্রীরা (মৃণাল সেনকে ধন্যবাদ, 'একদিন প্রতিদিন' ছবিটির জন্য, 'খারিজের' জন্য তো বটেই।)

আমরা যারা এ বিষয় নিয়ে তর্ক তুলতে পারি তারা একটি তথ্য পেলে চমকে যাব—নারী প্রগতির এই যুগে স্ত্রীভূমিকাবর্জিত নাটকের এত চাহিদা কেন ? নাট্যগোষ্ঠীতে অভিনেত্রীর সংখ্যা এত কম কেন ? কেন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী হতে হলে হলমালিকের লালসার শিকার হতে হয় ? চমকপ্রদ আরেকটি তথ্য : আমাদের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর একত্রিত অভিনয় আইনসঙ্গত ছিল না, এখনও কি তাই আছে ? এসব জেনে এবং দেখেশুনেও আমরা নীরব আছি এবং মধ্যবিত্তদের এসব সমস্যাকে কোনও নাটকই আমল দেয় না, ফলে মিথ্যাচারের দায় থেকেই যাচ্ছে !

এই যে টুকরো টুকরো সমস্যা—মেয়েকে বেশি পড়ানোর সমস্যা, মেয়ের বিয়ের সমস্যা—আদপে মেয়ে হয়ে জন্মাবারই সমস্যা, তা' কিন্তু বিস্ময়কর নীরবতায় আমাদের মঞ্চকেই গ্লানিময় করে তুলেছে। স্থূল প্রক্রিয়ায় যদি বা এসব সমস্যা কোনও নাটকে এসেও থাকে, যেটি আদপেই আমরা দেখি না তা' হচ্ছে কোলকাতা-মুখীনতার বিরুদ্ধাচরণ, গ্রামশহরের মেলবন্ধনেই আসে সার্বিক সাফল্য ও উন্নতি, এটা ধ্রুবসত্য জেনেও আমাদের নাটক, সবকিছুর এই যে কোলকাতাকেন্দ্রিকত্ব, তাকে ধিক্কার দেয় না। ইচ্ছেয় হোক, বা না হোক্, কোলকাতাই আমাদের সমস্ত

কিছুর পীঠভূমি, এই নোংরা মিছিলময় শহর কেন যে এত দুর্নিবার আকর্ষণে বেঁধে ফেলে সকলকে, তা' আমরা নিজেরাই জানি না—কারণটি শেষ বিচারে সেই মধ্যবিত্ত মানসিকতাই, যা' নিশ্চিন্ত সুখাশ্রয় চায়, পাবে না জেনেও ভীড় করে একই মৌচাকে। কেন্দ্রিকতার এই ঝোঁক একান্তই মধ্যবিত্তসুলভ, ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে যে সাহস ও অ্যাড্‌ভেঞ্চারপ্রিয়তা আছে তা' আমাদের নেই। নাটকগুলিও এই সবের প্রতিচ্ছবি হতে পারছে না, এক অসম্পূর্ণ সমাজচ্ছবি হয়েই তারা থেকে যাচ্ছে। কেন না নিরানব্বুই শতাংশ নাটকই অভিনীত হয় কোলকাতার নিভৃত নিরাপদ মঞ্চাশ্রয়ে। বিষয়বস্তু, আগেই বলেছি, বেশি সময়েই গ্রামীণ, কিন্তু গ্রামে যাওয়া হয়ে উঠছে কই? সাধারণ মানুষের সমস্যা ও চাওয়া-পাওয়াকে ঘিরে নাটকগুলি অতএব মধ্যবিত্তসুলভ ভঙ্গিমায় স্বশ্রেণীর মানুষজনের কাছেই সগৌরবে অভিনীত হচ্ছে। অথচ এই কোলকাতা কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে নাটক হওয়া দরকার আর এর নাট্যসম্ভাবনাও সুপ্রচুর। এসবই আমাদের জানা অথচ আমরা চুপ করে বসে আছি; গ্রামমুখীন হওয়ার চেষ্টাটা শুধুই কাগজে হয়ে আছে। এটাও একটা ভয়ংকর সমস্যা।

সমস্যাটা ভয়ংকর এ জন্যেই যে আমাদের নাটক আসলে বাস্তবের বিকল্প হিসেবে প্রতিভাত হয়ে উঠছে ক্রমশঃ, কেন না, শ্রেণীশত্রুর মুন্ডু চিবিয়ে, নিজেদের শতসহস্র ছিদ্রের প্রতি মুখ বেঁকিয়ে, অতিসরলীকৃত যে নাটক আমরা নিয়ত দেখতে বাধ্য হই, তা' আসলে একাধারে আত্মবঞ্চনা ও ফাঁকি দেবার প্রয়াস। তাই মধ্যবিত্ত মানসিকতার শিকার হয়ে আমরা দূরে থেকেই সব দেখতে ভালবাসি গোটা সমাজ-রাজনীতির প্রতিফলন এভাবেই হয় আমাদের নাটকে, অন্যান্য সাহিত্যে ততটা নয়, কেন না নাটকে দৃশ্য শ্রাব্যর একটা ব্যাপার থেকে যায় বলে চীৎকৃত ঢক্কানিনাদে নরক গুলজার করা সম্ভব অতি সহজে, কিন্তু সে নরকের স্রষ্টাকে আমরা এখনও ভয় পাই—পৃথিবীর এসব নাটক তার যাবতীয় গিমিক আর চট্‌জলদি সমাধান নিয়ে দ্রুত অবক্ষয়কেই ডেকে আনবে, কেন না সীমাবদ্ধতারও একটা সীমা থাকে। প্রগতিবাদী নাটকের দর্শক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—আমাদের থিয়েটারের চরিত্রলিপিতে তাঁরা অনুপস্থিতপ্রায়, কিন্তু যাঁরা জাঁকিয়ে বসে আছেন গোটা চরিত্রলিপি জুড়ে, তাঁরা এসব থিয়েটার দেখেন না। আয়রনিটা বড় তীব্র হয়ে বাজছে না কি?

একাঙ্ক নাটক : এখন এখানে

যে আধুনিক একাঙ্ক নাটকের রূপধারায় এখন আমাদের আস্থা, তার শুরু কিন্তু জার্মান নাট্যকার লেসিং-এর নাটকাবলীতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই রোমান্টিক ভাবধারায় অধ্যুষিত য়ুরোপীয় মননের ঠিক প্রাক্কালে লেসিং-এর নাটক আগত গৌরবময় দিনগুলিকেই আসলে চিনিয়ে দেয়। সভ্যতার বিকাশ মননের অগ্রগতি, জীবন-যাত্রার ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও সমস্যা, আর্থ-সামাজিক পটভূমির দ্রুত পরিবর্তন, শ্রেণীযুদ্ধ এবং সব মিলিয়ে জীবন-সংগ্রামের কথা বাস্তবতার সংঘর্ষে নাট্যকারদের আগ্রহ একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে তো বটেই, সাহিত্য শিল্প তথা সংস্কৃতির জগতে নিয়ে এল নতুন এক চৈতন্যদীক্ষা—যে চৈতন্যের উপলব্ধির স্তরে স্তরে থাকে মানুষের প্রতি মমতা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা—ফোটোগ্রাফিক বাস্তবতা নয়, বাস্তবতার সংঘর্ষ যে অবলীলায় তুলে ধরে

মানুষের শ্রেণী সম্পর্ককেই করে বিচারের মানদণ্ড, ফলে শ্রেণী-সংঘর্ষ আসে—অনিবার্য ফলশ্রুতিতে দেবদেবীর লীলাবিহার কিংবা মহিমাকীর্তন রূপ নেয় জাগতিক সমস্যায়। আদি থেকে বর্তমানে এ ভাবে উত্তরণ ঘটে প্রাচীন এক নাট্যকৃতির, লেসিং থেকে স্ট্রীন্ডবার্গ হয়ে ইয়েট্‌সের নেতৃত্বে 'দ্য বোহেমিয়ানস্'-এ পৌঁছতে যার সময় লাগে না বেশি। সেই 'বোহেমিয়ানস্', যে দল আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে একক ভূমিকায় মহান হয়ে থাকবে চিরকাল—লেডি গ্রেগরি, জন মিলিংটন সিঞ্জ, মানবিক মূল্যবোধ এবং অসাধারণ জীবন-বীক্ষায় অভিজ্ঞতার আলোকে লিখলেন 'রাইজিং অফ দি মুন' কিংবা 'দ্য রাইডার্স টু দ্য সী'-এর মত নাটক।

বস্তুতঃ, একাঙ্ক নাটক জীবনসংগ্রামী প্রত্যয়ী আশাবাদকে তুলে ধরতে শিল্পমাধ্যমগুলির মধ্যে সবচেয়ে সহায়ক, দু আড়াই ঘণ্টার নাটকে সস্তা মেলোড্রামা কিংবা কুরুচিকর ইঙ্গিতপূর্ণতার সমাবেশ ঘটানো সহজ, কিন্তু একটি ছোট্ট নাটকে বোধ করি তা তত সহজ নয়। ফলে স্পষ্টতঃই দেখা যায়, কলকাতার তো বটেই, প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যে নাটক গরিমা পেয়ে যাচ্ছে, তা হল একাঙ্ক নাটক। ব্যয় সংকোচ তথা উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা যদি এর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হয়, প্রধানতম কারণ অবশ্যই এর স্বল্পবৃত্তে জীবন চেতনার প্রকাশ ক্ষমতা, জনরুচি তথা শিক্ষাকে উদ্দীপিত করার ভূমিকার। বাষট্টি বছর আগে মন্মথ রায় তাঁর 'মুক্তির ডাকে'-র মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটকের পথিকৃত্য অর্জন করেছিলেন। 'মুক্তির ডাকে'-র আবেদন আজ হয়ত বাস্তবতার সংঘর্ষ এড়ানো নাটক হিসেবে ততটা জোরালো নয়, কিন্তু সময়ের বিচারে সেটি যে অসাধারণ এক নাট্যকৃতি, তা না মেনে নেওয়া অসঙ্গত হবে। বাষট্টি বছরের এই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা একাঙ্ক নাটক এখন এমন এক মহিমাময় রূপে বিরাজমান যেখান থেকে আমরা অনায়াসেই গর্বিত ঘোষণা রাখতে পারি—সমুন্নত চেতনা ও শ্রেণীসংঘর্ষের দৃপ্ত রূপ যে মাধ্যম অনায়াসে দিয়ে যাচ্ছে শাহরিক নাট্যবৃত্তের বাইরে, তা হচ্ছে একাঙ্ক নাটক। মফঃস্বলের অসংখ্য তরুণ যে মাধ্যমে নিজেকে রপ্ত করে যাচ্ছে শিল্পের সিরিয়াস পাঠে, তা হচ্ছে একাঙ্ক নাটক। রাজনীতি সচেতনতার শিক্ষাকে উদ্ভাসিত করে বাংলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে দ্রুত যা ছড়িয়ে পড়ছে, তা হচ্ছে একাঙ্ক নাটক।

কলকাতাকেন্দ্রিক যে সাংস্কৃতিক জীবন, এটা ঠিকই, তা' একান্তভাবে মধ্য-বিত্তের নিজস্ব। এখানকার অধিকাংশ নাটকের বক্তব্য প্রগতিশীল, কিন্তু

আয়রনিটা তীব্র হয়ে বাজে তখন যখন দেখি যাদের জন্য এসব নাটক, তারা এগুলি দেখেন না। দেখলেও গিমিকের প্রাধান্যে বুঝে ওঠেন না। একাঙ্ক নাটক সেদিক থেকেও স্বতন্ত্র—গ্রামে গঞ্জেও এখন নাটক প্রতিযোগিতার ধুম লেগে গেছে। মফঃস্বল শহরগুলিতো অনেক দিন আগে থেকেই এ জাতীয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে প্রগতি সংস্কৃতির রুদ্ধ দ্বারটি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এখানেও একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা জনমানসে সাড়া ফেলেছে। বাংলা নাটকের জয়যাত্রায় তাই একাঙ্কের ভূমিকাটা সঙ্গতভাবেই পথিকৃতের। অনেকে বলে থাকেন, লোকবল ও অর্থবল এবং উদ্যোগপর্বে যে তুলনামূলক হ্রাসত্ব, তার জন্যই একাঙ্ক নাটকের এই জনপ্রিয়তা। কথাটা অল্পবিস্তর সত্য। কিন্তু মূল সত্যটা হল মাধ্যমটির প্রকাশ-ক্ষমতা, যা স্বল্প-বৃত্তেও জীবনসংগ্রামের পাথেয় জোগাতে সক্ষম। একাঙ্ক নাটকে মনোরঞ্জনকারী অংশ বেশ কম, এর মূলধন হচ্ছে গতির তীব্রতা, বিষয়ের একমুখীনতা, প্রতীতির সমগ্রতা, স্বল্পতম ব্যাপ্তির মধ্যে বৃহত্তম সত্যকে প্রতিভাত করার বাসনা, পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্মিতা এবং এদের যোগফলে একটি সামষ্টিক সংজ্ঞানের জন্ম দেওয়া। নাচ-গান বাহারী দৃশ্যমালায় আকৃষ্ট করায় সে বিশ্বাসী নয়, সুতরাং এ নাটক পথে-প্রান্তরেও করা সম্ভব। ফলে আমরা দেখছি, প্রগতিসংস্কৃতির অনাতন বাঙ্ময় রূপটি নিহিত রয়েছে একাঙ্ক নাটকে। সুখের কথা আমাদের নাট্যসম্ভার এখন যে ধনে ধনী, তা এই ধারার সৃষ্টিতেই। বিদেশী অনুবাদ নাটকের প্রাবল্যে সে এখনও নিজের সত্তাটি হারায় নি, মৌল দেশজ ভিত্তির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই দর্পণটি—যা প্রতিবিম্বিত করবে মানুষের জয়ী হবার বাসনা, তার পথনির্দেশ সে যদি নাও করতে পারে, সহযোগী যোদ্ধার ভূমিকায় সে উদ্দীপনা রেখে যাবে প্রতিনিয়ত।

দৃষ্টান্ত বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই বাংলায় একাঙ্ক নাটক চর্চার ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে, দৃষ্টান্ত উপস্থাপনায় আমরা দেখব তার বিভাজন আসলে সাতটি উপমাধ্যমে। প্রাচীন উপকথাকেন্দ্রিক, দৃশ্যমান বাস্তববোধ-ভিত্তিক, মৌলিক ভাবনা সঞ্জাত, বিদেশী ভাবধারাপুষ্ট, প্রতীকধর্মী, আঙ্গিক-সর্বস্ব এবং প্রহসনধর্মী এই সাতটি মৌল বিভাজন কিন্তু লক্ষ্যে এক থেকে যায়। একটি আন্তধর্ম থিম এগুলি থেকে খুঁজে নেওয়া আয়াসসাধ্য নয়। আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিটি উপমাধ্যমের কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমূলক একাঙ্ক নাটকের আলোচনা করছি, যা থেকে আমাদের আরব্ধ প্রতিপাদ্যে পৌঁছুনো যাবে বলে বিশ্বাস।

প্রাচীন উপকথা কিম্বা মহাকাব্যের আখ্যানাংশ নিয়ে সাহিত্য শিল্পকৃতির বিস্তর উদাহরণ আছে। একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে যেটি বিস্ময়ের সঞ্চার না করে পারে না, তা হল, নিতান্তই স্বল্পবৃত্তে এই জাতীয় উপকথা বা আখ্যানাংশের একটি মূর্ত বিষয় হয়ে ওঠা। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহাভারতের যুদ্ধ'— একাঙ্কটির কথাই ধরা যাক। নাট্যকারের প্রতিপাদ্য বিষয় শ্রেণীবৈষম্য ও তার কারণ উদ্‌ঘাটন। এই শ্রেণীবৈষম্য কোনো রহস্য নয়, বরং এটি আর্থসামাজিক একটি ব্যবস্থার ফলশ্রুতি, সামন্ততন্ত্র থেকে অবক্ষয়ী ধনতন্ত্র যার আশ্রয়। শ্রেণীবিভক্ত রাষ্ট্র কাঠামো সর্বদা শোষকশ্রেণীর পক্ষে আচরণ করে ; শ্রেণীশত্রুকে অনায়াসে চিহ্নিত করতে পারেন নাট্যকার এবং আমরাও। নাটকটির সার্থকতা এখানে। মহাকাব্যিক যে দ্বন্দ্ব মূলত শুভ অশুভের বিমূর্ততায়, নাট্যকার অত্যন্ত আন্তরিকতায় এই স্বল্প পরিসরে তাকে রূপ দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক বীক্ষায় মাইথোপিক ইঙ্গিতময়তার একটি আশ্চর্য উদাহরণ হিসেবে 'মহাভারতের যুদ্ধ' দৃশ্যকাব্য মাধ্যমে তো বটেই, বাংলা সাহিত্যেও আদৃত হবার দাবি রাখে। অনুযোগ একটাই, ত্রি-স্তর যে ঐক্য এরিস্ততল থেকে আজ পর্যন্ত একাঙ্ক নাটকের গতিময়তার ধারক হিসেবে বিশ্লেষিত, তা' যেন খানিকটা ব্যাহত হয়েছে এ নাটকে।

আবার রবীন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'জরাসন্ধের সিংহাসন' নাটকে এ রকম উপাদানকে ভিত্তি করতে গিয়ে অসংলগ্ন হয়ে পড়েন। নাটকের মধ্যে নাটক এবং অভিনেতা-দের ইনভলভড্ হয়ে গিয়ে স্বমূর্তি ধারণ—জোতদার সেই একনায়ক জরাসন্ধের প্রতীক, খেটে খাওয়া চাষী মজুরেরা তার পার্শ্ব অভিনেতা। নাটকটির দুর্বলতা তার ক্লাইমাক্সের পরিকল্পনায়। অভিনেয় চরিত্রের নির্মোক খসে গিয়ে জোতদার ধনবান মানুষটির আত্মপ্রকাশ আমাদের কাঙ্ক্ষিত ধাক্কাটি দিতে পারে না, আসলে উপক্রমণিকার দুর্বলতায়। প্রথম থেকেই আমরা চরিত্রটি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পড়ি। তবুও শ্রেণীচরিত্রের বিশ্লেষণটি যে আশাব্যঞ্জক হয়ে উঠতে পারে, তার জন্য নাট্যকার প্রশংসা পাবেন। শিল্পসৃষ্টিতে আরোপিত হয়ে যাওয়া বক্তব্য খুবই ক্ষতিকারক। রবীন্দ্রের আরেকটি এ জাতীয় উপাখ্যানভিত্তিক একাঙ্ক, 'যোগীন যখন যজ্ঞেশ্বর' সে অনুযোগ থেকে রেহাই পাবে না। আবার যজ্ঞেশ্বরের ভূমিকায় যোগীন অভিনয় করতে করতে শিবরূপ ধারণ করে অত্যাচারীদের শায়েস্তা করল সরলীকৃত এই ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানবোধ কাজ করে নি, ফলে নাটকটি অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে।

অমল রায় অতিবাম-মনোভাবসম্পন্ন নাট্যকার। সময়ে সময়ে তাঁর নাটক তীব্র প্রচারবাহী হয়ে ওঠে, কিসের প্রচার ঠিক বোঝা যায় না 'ঘটোৎকচ'। নাটকে তিনি কিন্তু ব্যতিক্রম এখানে তাঁর বিশ্লেষণটি মহাভারতের আপাত অপাংক্তেয় চরিত্র ঘটোৎকচকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। নির্যাতিত এবং তা অকারণে,—এই শ্রেণীর প্রতিভূ ঘটোৎকচ একমাত্র নিপীড়িত শ্রেণীর হয়ে প্রশ্নবাণ ছুঁড়তে থাকে। প্রাণবিসর্জন দিয়ে সে তার পিতা ভীমের ঋণ শোধ করে এবং ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার সোপান গড়ে দিয়ে যায়—এ রকম বিশ্লেষণ আমাদের ভাবায়। শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উজ্জীবিত করে।

বাস্তবজীবনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত একাঙ্ক নাটক রচিত হয়েছে, তার অধিকাংশই খ্যাতিমান সাহিত্যিকবৃন্দের গল্পকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। প্রেমচাঁদ যেমন আছেন, তেমনিই আছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিম্বা কিষাণচন্দরের মত সাহিত্যিকেরা। 'দুধের দাম' প্রেমচাঁদের অবিস্মরণীয় গল্প, কিন্তু 'নেমকের দারোগা' অবলম্বনে 'একা নয়' একাঙ্কটি প্রশাসন ও গ্রামীণ মানুষের সম্পর্ক যে ভাবে বিশ্লেষণ করে তা' এক কথায় জাগতিক বাস্তবতার অনেক কাছাকাছি। প্রশাসনিক সততার দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রশান্ত চরিত্রটি দেবব্রত দাশগুপ্তের নাট্য-রূপায়ণেও অক্ষত আছে। প্রশান্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে একা লড়াই চালাতে চায়, তার বন্ধু পরেশ সেখানে রাজনৈতিক সংগঠন ও সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনী-য়তার অভাব বোধ করে এবং সে জন্যই 'একা নয়' 'সবাই', প্রশান্ত-র নেতিবাচক অধোগামিতা আমাদের উজ্জীবিত করে না, তাই অভিযোগ একটা থেকে যায়, প্রশান্ত-র এই অধোগামিতা কি এড়ানো যেত না? মূল কাহিনী অনুসরণ করবার দায় নাট্যকারকে এতটা ভারাক্রান্ত হয়ত না-ও করতে পারত। তবুও মৌল প্রশ্নটি কিন্তু সরবে উচ্চারিত: ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কোনো সৎ সত্তা আদৌ বেঁচে থাকতে পারে কি? অমোঘ উত্তরটা আমরা জানি না। এখানেই নাট্যকার সফল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অসাধারণ গল্প 'নমুনা' অবলম্বনে নাটকের কথা আমরা জানি। একটি 'সন্ধ্যাবেলার সূর্য', আরেকটি 'আকাল'। নটরাজ দাস-কৃত 'সন্ধ্যাবেলার সূর্য' যেখানে বিয়াল্লিশের আকালে দেখাতে চেয়েছে নগ্ন বীভৎসতা, দেবদত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীত মৈত্রের যুগ্ম নাট্যায়নে 'নমুনা' হয়েছে 'আকাল'—সে আকালে মূল দায়টা এসে পড়ে শোষকশ্রেণী ও তার তোষামুদে দলের ওপর। রিলিফ এখানে ভারসাম্য রক্ষা করে, নটরাজ সেখানে আবেগাপ্লুত

আকালের ঘোরে দুর্দিনে তিনবস্তা চালের বিনিময়ে কেশব বামুনের মেয়ে দুর্গাকে বিক্রী করতে পিছপা হয় না। 'সন্ধ্যাবেলার সূর্যে' নাটকে দুর্গা প্রতিবাদী চরিত্র হয়ে ওঠে—'আকালে' সেই রুদ্রাণী ভাবটা অনুপস্থিত। মোটের উপর, নাট্যরূপে দুটিই সফল হয়ে ওঠে, লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বস্ততায়। সমকালীন ভাবনার প্রেক্ষাপটে নাটক দুটির শরীর গড়ে ওঠে, ফলে সমঃকাল কোনো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না; এ যুগেও কেশব বামুনেরা খিদের জ্বালায় মেয়ে বেচে দিচ্ছে আরবে-য়ুরোপে—পত্রিকায় এমন খবর এখন তো আমাদের নিত্য সহচর। অভিযোগ আমাদের অন্যত্র—মানিকের কাহিনী নাট্যরূপায়িত করার পেছনে আবেগধর্মিতা যতটা কাজ করেছে, যুক্তিবাদ ততটা নয়। তাই 'আকালে' কিংবা 'সন্ধ্যাবেলার সূর্যে' আমরা যতটা আবেগতাড়িত হই, ততটা প্রতিবাদে উদ্দীপিত হতে পারি না।

কিন্তু গান্ধী-র জীবন বৃত্তান্তকে ছোট্ট ছোট্ট তুলির টানে ললিত মুখোপাধ্যায় যখন সম্পূর্ণ এঁকে ফেলেন ট্র্যাজিক মহিমায়, তখন আমাদের তাঁর মৌলিকতায় অবাক হতে হয়। স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে গান্ধী-র কলকাতা দর্শন ও তাঁর অনুগামীদের মত্ত তান্ডব কি ভাবে তাঁকেও একদিন বিদ্ধ করে ভূপাতিত করল, সেই ট্র্যাজেডিই এই একাঙ্কের প্রতিপাদ্য বিষয়। এ নাটকে মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রমিক সবাই এসে যায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে—গান্ধী পরম বিস্ময়ে দেখেন তাঁর স্বপ্নকে চুরমার হয়ে যেতে, হয়ত বোঝেনও দায়ী কাদের অবিমৃষ্যকারিতা বা ইচ্ছা। অ্যাটেনবরো সাহেব যখন 'গান্ধী' ছবি করে কোটি টাকার মুনাফা লুটছেন, এ দেশীয় শাসকবৃন্দ যখন সুভাষ-বর্জিত মিথ্যাশ্রয়ী সেই কল্প-কাহিনীকে ভরসা করে প্রচারে নেমেছেন বিশ্বজোড়া, তখন ললিতের 'গান্ধী' অবশ্যই অ্যান্টি-হিরোর ভূমিকায় অসাধারণ কাজ। একে মৌলিক ভাবনা বলতে দ্বিধা করার কথা নয়।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জানালা' সেই উন্মুক্ততার সন্ধানে ব্যাপৃত যেখানে সমাজ দূষিত নয়, একটি স্ট্যাটিক অ্যাবসার্ডের প্রতীক নয়। বদ্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন সুমতির এই ছোট্ট খুপরিতে ইন্দ্রনাথ অসাধারণ বাঙ্ময়তায় জানালাটা খুলে দেন, বাতাস ঢোকে এক ঝলক, আমরা নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে যাই। বস্তুত, 'জানালা'র মত সার্থক একাঙ্ক বড় বেশি এদেশে লেখা হয় নি। বাস্তবতার সংঘাত এখানে নাটকের মূল চালিকাশক্তি, চরিত্রগুলি সব আমাদের চেনা ভাষায় কথা বলে। মধ্যবিত্ত মানসিকতার গন্ডিবদ্ধ সীমায় নাট্যকারের অনাস্থাও সেইসঙ্গে প্রতিভাত হয়। উল্লেখ্য, চেতনা নাট্যগোষ্ঠী শুধু 'জানালা'কে কেন্দ্র করে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছিলেন এই কলকাতাতেই বছরখানেক আগে। বোধ-

হয় এমন গরিমাময় সাফল্য একালের কোনো নাটকের ভাগ্যে জোটে নি। মৌলিক ভাবনার সাথে যুক্তিবাদ মিশে গিয়ে 'জানালা'কে অসাধারণত্ব দিয়েছে এ কথা অনস্বীকার্য। সুনীল দাস যখন 'পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত' নাটকটি লেখেন তখন তাঁর পরিকল্পনায় থাকে সামাজিক পচন এবং পরিবেশ দূষণ—দু'টি বিষয়ই একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে, ফলে তা শ্যামলতনু দাসগুপ্তের 'এখুনই সময়ে'র মত অতি সারল্যে সমাধান পেয়ে যায় না। সেখানে বিবেচ্য বিষয় জোতদারী শোষণ ও ছোটচাষীদের প্রতিরোধ। যুক্তিবাদ ততটা কাজ করে না, যতটা কাজ করে আঙ্গিক বাহুল্য ও বিষয়ের সরলীকরণতা। বরং দেশজ উপাদানে ভরপুর গম্ভীরা-আশ্রিত 'নানা হে' নাটকটি অসাধারণ বার্তা বয়ে আনে আমাদের জন্যে, অত্যাচার শোষণই শেষ কথা নয়—আছে প্রতিবাদ, লড়াই। এই প্রতিজ্ঞায় আসার জন্য নাট্যকারকে অরোপিত কোনো ব্যবস্থা নিতে হয় না। গম্ভীরার স্বতঃস্ফূর্ততায় নাটকটি অত্যন্ত তীব্র গতিময় এবং সাবলীল সমাধানে পৌঁছতে তার বিশেষ আয়াস করতে হয় না। বিচারের প্রহসন নিয়ে 'বিক্রম ও আদালত' নাটক এক লহমায় বিচারের অন্তঃসারশূন্যতা ও দীর্ঘসূত্রতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এরপরে যে নাট্য-উপধারাটি সতর্ক লালনে পুষ্টি পেয়ে যাচ্ছে, তার মূল উৎস নিহিত আছে বিদেশী নাট্যাবয়বে। স্পেনের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের নাটক 'ঝড়ের খেয়া' এখনও খুবই জনপ্রিয়। প্রফেসর স্টোন এবং পল নামের ছোট ছেলেটি-র চরিত্রায়ণ এ নাটকে অসাধারণ কিন্তু কিংশুক দত্তের 'রক্তস্নাত' ততটা সফল হতে পারে না। প্রায় একই ধরনের পটভূমির যথার্থ বিকাশে তিনি সফল হয়ে উঠতে পারেন না তাঁর 'রক্তস্নাত' নাটকের মাধ্যমে। 'ঝড়ের খেয়া'য় যেখানে সংগ্রাম দেশীয় শাসক বর্গের সাথে সাধারণ মানুষের, এখানে সংগ্রাম অ্যাঙ্গোলার মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে পর্তুগাল সাম্রাজ্যবাদের। ব্রেশট্ প্রভাবিত 'খড়ির চিকে' নাটকটি অসাধারণত্ব লাভ করে বিষয়ের প্রতি অনুবাদকের অসাধারণ মমত্বে—নাৎসী অত্যাচার ও ও সুবিধাভোগী রাজনীতি সরল প্রেমকেও ভেঙে খানখান করে দেয়—এই মৌল বিষয়টি প্রতিপন্ন হয়েছে নাটকটির চরিত্র খেরো ও অ্যানার সম্পর্কের মধ্যদিয়ে। ল্যু স্যুন অনুপ্রাণিত 'খামারের গপ্পো' আমাদের সন্ধান দেয় চীনদেশীয় সমবায় আন্দোলন ও তার প্রতি সাধারণ মানুষের অপার বিশ্বাস। যে কোনও মূল্যে তারা একে বহমান রাখতে বদ্ধপরিকর। নাট্যকার দিলীপ বসুর

প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলা চলে। কেবলমাত্র তিনটি চরিত্র দিয়ে প্রায় একঘণ্টার এই নাটকটি বিষয় ও আঙ্গিকের সহধর্মিতায় আমাদের আকৃষ্ট না করে পারে না। কিন্তু মুখবন্ধে ভট্টাচার্য মহাশয়ের একক সংলাপের দৈর্ঘ্য অবশ্যই আমাদের পীড়িত করে। ল্যু-স্যুনেরই প্রবন্ধ অবলম্বনে অমল রায়ের উগ্র বাম-পন্থা বিরোধী নাটক 'বলির পাঁঠা' কেমন যেন তুঙ্গ-প্রচারধর্মিতায় রুগ্ন। প্রকৃতপক্ষে বামপন্থীর অক্লেশে নিন্দায় মুখরিত এমন নাটকের দৃষ্টান্ত প্রগতি মঞ্চে একটিই বলা অন্যায় হবে না। একাংক নাটকের প্রগতিধর্মী ইতিহাসে এ নাটকটি ব্যতায় বলে গণ্য হবে। নাটকটি প্রতিক্রিয়াশীল, বলতে বাধ্য হই আমরা। কিন্তু যখন গোপাল দাস 'এক নায়কের সন্তান' নাটকটি লেখেন সিগফ্রিড লিনৎস্ অবলম্বনে তখন আমরা প্রগতি-র সঠিক অর্থ বুঝে উঠতে পারি। ছোট ছোট হিটলারে জার্মানি দেশ তখন ভরা, হের গম্পোগরা তাদেরই একজন। তার ছেলে ইউগ্রেন প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করে। পিতা-পুত্রের স্বৈর-তন্ত্রের ভিন্নমুখী প্রকাশ একদিন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়—গম্পোগরা ছেলের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ প্রচারেও দ্বিধাবোধ করেন না। ফ্যাসিস্ত ক্ষমতার লোভ এমনই বিষময়, এমনই নরখাদক। রাজনৈতিক বোধে উজ্জীবিত করে তোলে বিষয় ও চরিত্র বর্ণনার মাহাত্ম্যে। বহু-কথিত ত্রি-স্তর ঐক্য এখানে বিঘ্নিত ঠিকই, কিন্তু উদ্দেশ্য পূরণের অভিধায় আমরা তা মেনে নিতে পারি।

প্রতীকধর্মী নাটকের মধ্যে 'স্ফিংক্স' নাটকটি ব্যঞ্জনায় অসাধারণ ছিল। কিন্তু নাট্যউপস্থাপনার দৌর্বল্যে নাটকটি আগাগোড়া ভোগে। স্ফিংক্স আসলে সেই সব শক্তির প্রতীক যা শুধু মর্মরগাথা নয়, জ্বলন্ত ইতিহাসেরও স্বাক্ষর। স্ফিংক্স এখানে কখনও জমিদার, কখনও পিতা—আদি থেকে বর্তমানে তার এই প্রতীকী চরিত্রায়নের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের অভীপ্সিত পথটি খুঁজে উঠতে পারি না আমরা। 'ভয়' নাটকটির মধ্যে প্রতীকী ব্যঞ্জনা মহত্তর সাফল্য নিয়ে আসে, কেন না নাট্যকার তাঁর উদ্দিষ্ট বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন। অন্ধ কুসংস্কার আসলে শোষণের হাতিয়ার—ভয় তারই প্রতীক, মুখ্যচরিত্রের জটায়ু নামকরণের মধ্য দিয়ে আপোষহীনতার ইঙ্গিত পরিস্ফুট হয়েছে এবং এ ভাবে নাটকটি জমে যায়। লখাইয়ের মার মত আমরাও নতুনতর বোধে আশান্বিত হই। জাগৃতি র 'সূত্রধার ও স্থাপক' কিংবা 'মৃত্যুকে পেরিয়ে' মরালিটি প্লে-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতীক না বলে রূপক বলতে পারলে খুশি হওয়া যেত। কিন্তু অ্যাব-স্ট্রাক্ট আইডিয়ার শক্ত বাঁধন ছিঁড়ে এ সব রূপক সাধারণ্যে আশ্রয়ও পাবো না বলে

বোধ হয়। অর্থহীন সংলাপের ফুলঝুরি, পুনরাবৃত্তি, বিবর্তনবাদ সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধ্যানধারণা আসলে নাটক দুটিকে ব্যর্থ করে তুলেছে। প্রতীকী মাধ্যম একাঙ্ক নাট্যধারায় বিশেষ উপযোগী নয়, কেন না যাকে বা যে অন্তর্লীন বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তার একমুখীনতার অভাব একাঙ্ক নাট্যধারার পক্ষে পীড়াদায়ক। তাছাড়া আমরা আগেই বলেছি, শহর থেকে সুদূর মফঃস্বল—এই পরিক্রমণের ব্যাপ্তি একাঙ্ক নাটকের সার্থকতা নিহিত। বিষয়ের প্রতীকী আবরণ পরীক্ষামূলক কাজ ঠিকই, যেমন রতন ঘোষের 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে' কিংবা 'সকলের জন্য', কিন্তু এরা মঞ্চে ততটা সফল বোধ করি না যতটা পাঠের অনুধ্যানে। ভারসাম্যহীন প্রয়োগে এসব নাটকে প্রায়শঃই সাধারণ্যের বোধগম্যতার বাইরে চলে যাওয়ার আশংকা থেকে যায়। সম্ভবতঃ সে কথা মনে রেখেই মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর অন্যতম সাম্প্রতিক একাঙ্কে অন্যতর প্রতীকী মাত্রা আরোপ করেন, যা একাধারে বস্তুনিষ্ঠ অথচ প্রতীকের অসাধারণ সমন্বয় হয়ে উঠেছে। নাটকটি 'ভূত', যেখানে ভূত সাধারণ মানুষের অসহায় মৃত্যুর প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ রোগের দাওয়াই ডাক্তারবাবু বাতলে দেন এ ভাবে :

ভুবন : কিছুই নেই আমার, কি দিয়ে আক্রমণ করব ?

ডাক্তার : ভূতের অভাব নেই, সব জড়ো হয়ে যান। এক ভূতের যা কর্ম নয়, তা দশ ভূতে পারে, দশ ভূতের যা কর্ম নয়, তা করবে একশ—এইভাবে বাড়ুক। ভূতের একটা ক্ষমতা আছে—তা কারুরই অজানা নয়—ভূত ঘাড়ে চাপতে পারে। এটাই আপনাদের ব্যায়াম, অ্যাকশন। ঘাড়ে চাপুন। যে ভূত গড়ে, চাপুন তার ঘাড়ে।

কোরাসে শেষ অংশ : ...এমনি করে সব আবার বাঁচুন—যে ভূত গড়ে, তার ঘাড়ে চাপুন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রতীক ব্যবহারে যে পরিপূর্ণ ম্যাচিউরিটি দেখান, দুঃখের বিষয়, প্রতিযোগিতাধর্মী অনেক নাটক সে বিষয়ে খুবই দুর্বল। একাঙ্ক নাট্যপ্রসারের কোনও রুগ্ন দিক যদি থেকে থাকে, তবে তা হচ্ছে এই—প্রতিযোগিতাভিত্তিক চটজলদি সমাধান এনে দেওয়া কিছু নাটক। প্রতীক, প্রগতিবাদ, শ্রেণী সংগ্রাম—বিপ্লব ইত্যাদি একাকার হয়ে যায় এসব তরুণ শিক্ষানবীশের হাতে। একথা সমানভাবে প্রযোজ্য আঙ্গিক সর্বস্ব থার্ড থিয়েটার অভিধাযুক্ত নাট্যোপহারগুলিতে। এসব নাটক কখনই একাঙ্ক নয়, কেন না দ্রুত বিষয়ান্তরে

চলে যাওয়া এবং অতি ঘন পট ও চরিত্র পরিবর্তন একাঙ্ক নাটকের মূল সত্তা বিরোধী। সুনীত ঘোষের 'তিলকা মাঝি' কিংবা 'রং করা মানুষ'-এর মত নাটক দৃশ্যশ্রাব্যের বা পঠনের উপযোগী আদৌ নয়। স্পিরিটকে কেন্দ্র করে বিপ্লব বোধে জাগ্রত করা ভিন্ন ভিন্ন অভিধায়—নাট্যাকারে একে রূপ দিতে আপত্তি কোথায়? এ নিরীক্ষা শাহরিক মানসিকতার ফসল, তাক লাগিয়ে দ্রুত অঙ্গ সঞ্চালনের গিমিকে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস। এ কারণেই মাধ্যমটি তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। প্রহসনধর্মী নাটকগুলি বরং অসাধারণ কাজ করে পরিপূরকের। ব্যঙ্গের ক্ষুরধার স্যাটায়ারের ধ্বংসমুখনীতায় নয়, সূক্ষ্ম হাস্যরসবোধের বোধগম্যতায় সে যথার্থ হিউমার-ব্যঞ্জনা পায়। রাধারমণ ঘোষ তাঁর দুটি একাঙ্কে তা তুলে ধরেন। 'ভজ গৌরাঙ্গ কথা' ও 'হইতে সাবধান' নাটক দুটির প্রথমটিতে যদি মানুষের চিরন্তন দ্বান্দ্বিকতা ব্যঙ্গে প্রত্যায়িত, দ্বিতীয়টি তবে সিরিয়াস হিউমারবোধে জাগ্রত করে আমাদের। কিসের 'হইতে সাবধান'—ইঙ্গিতটা প্রত্যক্ষে ধরা দেয় আমাদের কাছে। হিউমার মানুষকে সুশিক্ষিত করে, ফিরিয়ে আনে তার চরিত্রের ব্যালান্স—'সেই লোকটি' তার নিদর্শন। সুবোধ ঘোষের 'অলীক' গল্পের ছায়ায় নাট্যায়িত এই নাটকটি নাট্যকারের (দিলীপ রায়) তীক্ষ্ন জীবনবোধের সঙ্গে সূক্ষ্ম রসবোধ যুক্ত হওয়ায় এক আশ্চর্য সাযুজ্যের পরিচয় বহন করছে। অলীক এক ঠগবাজ—জালিয়াতি তার পেশা, কেন না তার অসীম দারিদ্র্যে সে বাঁচার আর কোনো পথ পায়নি। স্ত্রীও তার কাছে অবাঞ্ছিত। পণপ্রথার শিকার এক পিতাকে দেখে সে তার মৃত কন্যাকে স্মরণ করে—নাট্যদ্বন্দ্বের শুরু হয়। সে নতুন জীবনসন্ধানে ব্রতী হয়, সঙ্গে থাকে স্ত্রী। ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে একটি চারিত্রিক উত্তরণ এখানে পরিস্ফুট, যেমনটি ঘটে যায় মনোজ মিত্রের 'টাপুর টুপুর' নাটকে। গ্রাম্য-দম্পতির কলকাতা দর্শনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের প্রতিবাদী করে তোলে, অশিক্ষিতা গ্রাম্য বধূ রুখে দাঁড়াতে পারে অসম্মানের বিরুদ্ধে। মিষ্টিমধুর সংলাপ ও ব্যঙ্গের পৃষ্ঠপোষকতায় নাটকটি একটি প্রতিবাদী চরিত্র পেয়ে যায়। প্রহসন হাল্কা চালের খেউড় নয়। মনোজ এ কথা আমাদের বুঝিয়ে দেন।

এই যে বিভিন্ন উপধারার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা একাঙ্ক নাটকের অবয়ব, তা নিশ্চিতভাবেই গণনাট্য আন্দোলনের সার্থক অনুগামী। রচনাশৈলীর বিভিন্নতায় যে আশত একতাটি বিঘোষিত, তা সাধারণ মানুষের জয়গানে মুখরিত। চল্লিশ দশকের একেবারে শেষে সাম্যবাদী রাজনীতির যে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে

উঠেছিল গণনাট্য আন্দোলনের সূচনায়, বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের ক্ষেত্রে তাকে অগ্রণী ভূমিকা এনে দিল। সাধারণ মানুষ নাটকের মুখ্য চরিত্র হয়ে উঠল, শিল্প শুধু রঞ্জনের নয়, দাবি আদায়ের মাধ্যম, তা প্রথম উপলব্ধ হল। সলিল চৌধুরীর অনুবাদ নাটক 'অরুণোদয়ের পথে' কিংবা ঋত্বিক ঘটকের অসাধারণ একাঙ্ক 'জ্বালা'-র পথ চেয়ে আজ আমরা পৌঁছেছি আশির দশকের সুকঠিন জীবনে। জীবন কোনদিনই মসৃণ ছিল না, তাই গণনাট্যের সহযোগী নাট্যসংগঠনসমূহের যেমন, তেমনই দৃঢ় ভূমিকা রয়ে গেছে প্রগতিশীল নাট্যকারদের, কেন না মাও ৎসে-তুং-য়ের এই বরাভয়ে আমাদের বিশ্বাস আছে :

We'll return amid triumphant song laughter.
Nothing is hard in this world
If you dare to scale the heights.

মাও ৎসে-তুঙ-এর কবিতা ৩৬ নং

আঞ্চলিক সাহিত্য : একটি অনুবেদন

দর্পণে না দেখলে নিজেকে দেখা হয়ে ওঠে না। সাহিত্য আসলে সেই বিশাল দর্পণ যাতে আমরা মানুষেরা নিজেদের দেখতে পাই অতি স্পষ্টভাবে। প্রতিবিম্বিত এই বিশৃঙ্খল, বহুধাবিভক্ত বাস্তববোধের বিভিন্ন চৈতন্য-স্তর ধীরে ধীরে সংগঠিত রূপ নেয় সাহিত্যিকের বীক্ষা ও যুক্তির আসঞ্জনে, যেখানে অবিরত কাজ করে যায় তাঁর একান্ত উপলব্ধি যা অভিজ্ঞতাসঞ্জাত এবং অনিরপেক্ষ। অনিরপেক্ষ এজন্য যে সৃষ্টির সেই শুরু থেকেই দ্বন্দ্ব এই দুই-য়ে : শোষক ও শোষিত। এই দ্বন্দ্বে শুধু সাহিত্যিক কেন, কোনও শিল্পীই নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। তাই সাহিত্যের প্রথম পাঠে রাজরাজড়া অমাত্যদের শাসন চলেছে। শিক্ষা ও সামাজিক চৈতন্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্থান পেতে শুরু করেছে সামাজিক অবস্থানের নীচে পড়ে থাকা জনতা—সেই জনতা যারা দেশ গড়ে দেয়

প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে, অনাহার ও নিরক্ষরতা যাদের চিরসাথী, সামাজিক তথা রাজনৈতিক উন্মেষ তাদের স্পর্শ করে না। এই না করাটার পেছনে কাজ করে যায় তাদের আর্থনীতিক অবস্থান। তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দুর্দম প্রসারের মাঝেও পৃথিবীব্যাপী নিপীড়িত গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। শহর থেকে একটু দূরেই জীর্ণ ধরিত্রী জানান দেয়, অনিরপেক্ষতা আসলে ক্রূরতা আর শঠতারই এক নাম। ন্যায়বোধ কিংবা বিজ্ঞানবোধ যদি সত্যিই কাজ করত তাহলে এ বৈষম্য থাকার কথা নয়, দ্বন্দ্বটা আসলে তাই ন্যায়-অন্যায়ের—এখানে নিরপেক্ষতা শুধুই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া, আর আমরা জানি শোষক শ্রেণীই সেই অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিভূ।

মৌলিক মানবিকসত্ত্বা প্রকাশ করাই সাহিত্যের কাজ, এমন বুর্জোয়া ধারণা শ্রেণী-নিরপেক্ষ সাহিত্যের কথা প্রচার করে। লু-শ্যুন বলছেন: এটা ঠিকই, সাহিত্যে মানুষের প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে হলে মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ আবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মানুষের চরিত্রেরা কাজ করে তাদের শ্রেণীচরিত্র বজায় রেখে; দুঃখ-ক্রোধ-আনন্দ স্বাভাবিকভাবেই মানুষের সত্ত্বাজাত প্রকৃতি নিরূপণ করে। তা বলে একজন চাষী ফাটকাবাজারে অর্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কাঁদতে বসে না। যে বৃদ্ধা রমণী পেইচিংয়ে কয়লা-ঘুঁটে কুড়িয়ে বেড়ান, তাঁর দুর্দশার কথা বোঝে কি তেল মালিকেরা? মৌলিক সত্ত্বার প্রকাশ যদি সাহিত্য হয় তাহলে তো শ্বাসাহার-নিদ্রা-মৈথুন প্রকাশ করাটাই ভাল ঠেকে!

সাহিত্যবিচারের এমন যুক্তিবাদী মানদণ্ডকে উপেক্ষা করা চলে না। আমরা দেখছি, প্রেম-প্রণয়-হিংসা-প্রতিহিংসা মানবিক সত্ত্বার এসব প্রকাশ আদৌ শ্রেণী-নিরপেক্ষ নয়, আর মানুষ কেবলমাত্র তার প্রবৃত্তি দ্বারাই চালিত হয় না, পারিপার্শ্বিকতা-প্রতিবেশ তার জীবনে কাজ করে সবচেয়ে বেশি। সামাজিক প্রয়োজনে মানুষ নিজের সুবিধার জনাই কিছু বৃত্তি, কিছু আচার-ধর্ম স্থির করে নিয়েছে। মানবসমাজের সরলতম গাঠনিক পর্যায়ের বিশ্লেষণ আমাদের দেখিয়েছে, মানুষ সর্বদা এক আপাত জটিল আচরণবিধি দ্বারা নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সেটা প্রবৃত্তিজাত প্রবণতা নয়, জৈবনিক উত্তরাধিকার তো নয়ই। বিবর্তনের ফলে যেসব আচরণবিধি সুসংহত হয়েছে; শিক্ষা তথা সামাজিকতার মাধ্যমে তা আমাদের স্বভাবের সঙ্গে ক্রমশঃ সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এ কারণেই মানুষের আচরণাবলী মানবিক চৈতন্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়, কখনই তা জান্তব প্রকৃতির দাসত্ব করে না। এঙ্গেলস বলেছেন: Man is the sole animal

capable of working his way out of the merely animal state—his normal state is one appropriate to his consciousness, one that has to be created by himself. নিয়ত পরিবর্তনশীল ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে মানুষ এটাই প্রমাণ করে এসেছে যে তার চরিত্র স্ট্যাটিক্ নয় ; স্বভাবের মৌল সত্ত্বাসমূহের সংকোচন, নিয়ন্ত্রণ ও দমন করবার ক্ষমতা তার আছে—ফলে গোষ্ঠী জীবনের আদর্শ সমূহের সংগে তার অনায়াস মিশ্রণ ঘটতে দেরি হয় না। এভাবেই মানুষ প্রগতি তথা জীবন জিজ্ঞাসার লুপ্ত সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে।

মানুষের জীবনে কোন বিষয় বিচ্ছিন্নভাবে তাৎপর্য বহন করতে পারে না। শিল্পসাহিত্যরীতিতে শিল্পীর দায় প্রাথমিকভাবে তার ফর্মের কাছে, যে ফর্ম শুধু প্রকাশ মাধ্যম নয়, যে আসলে সামাজিক ও শৈল্পিকতার মৌল গঠনরীতি হিসেবে কাজ করে। এই গঠনরীতি হচ্ছে সেই পরিমন্ডল যা একই সংগে বিশেষ বিশেষ সামাজিক দল বা শ্রেণীর অভিজ্ঞতালব্ধ চৈতন্যকে ও সাহিত্যিকের কল্পনায় থাকা ঘটনাবলীকে সংগঠিত রূপদান করে। সামাজিক অবস্থানের এক একটি দল বা শ্রেণী যখন যথার্থ বিকাশের স্তরে থাকে, তখনই সম্ভব চৈতন্য-উন্মেষের। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এই বিশেষ স্তরটিকে বিশ্লেষণ করে কোন সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টিকে বিচার করতে হবে। একজন শিল্পী এই চৈতন্য-বোধের উদ্‌গাতা ও রূপকার, কিন্তু একটি বিশেষ সামাজিক দল বা শ্রেণী, একটি বিশেষ পটভূমিকা না রাখলে খেই তথা যুক্তিগ্রাহ্যতা যায় হারিয়ে।

আমরা যে তিনটি সূত্র এতক্ষণে পেলাম, তা' হল শিল্পসাহিত্য শ্রেণীনিরপেক্ষ নয়, মানুষের প্রকৃতির বিজ্ঞানসম্মত বিবর্তন মানুষই করে আসছে, কর্ম বা অবয়বাশ্রয়ী গঠনরীতির সংগে এসব সামাজিক-রাজনৈতিক বোধ মিশে গিয়ে সাহিত্যে এই চৈতন্যের স্তরগুলিকে প্রকাশ করে। এর জন্য প্রয়োজন হয় একটি গোষ্ঠী ও তার পরিপার্শ্ব বিশ্লেষণ করা। আমরা প্রথমেই বলেছি, সাহিত্যে রাজা অমাত্যের শাসনকাল দ্রুত বিলীয়মান। সেই অর্থে পটভূমিরও পরিবর্তন ঘটছে দ্রুত। প্রত্যন্ত অঞ্চল, গোষ্ঠী জীবন ও তার মানুষেরা সাহিত্যে স্থান করে নিচ্ছে আপন অধিকারে। আর এসব উপলব্ধি থেকেই জন্ম নিয়েছে নতুন এক সাহিত্য : আঞ্চলিক সাহিত্য।

দুই

সাহিত্য, বিশেষত নাটক বা উপন্যাসের অংগনে, পটভূমি কোনও একটা

অঞ্চলকে ঘিরে সৃষ্টি করতেই হয়। প্রত্যন্ত জীবন নিয়ে লেখা যে নেই তা কিন্তু নয়। তার অধিকাংশ হচ্ছে বাস্তব সংঘাত থেকে নিরীহ এক আশ্রয়ে পালিয়ে যাওয়া। উইক্ এন্ডে বাবুদের বেড়াতে যাওয়ার মত। আঞ্চলিক সাহিত্য প্রসঙ্গে অনেকেই অনিবারণীয় ভাবে যাঁর নামটি উচ্চারণ করেন, তিনি হচ্ছেন ভিক্টোরিয় যুগের ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি। কিন্তু তাঁর তো জনতাকে 'ম্যাডিং' মনে হয়েছিল। পল্লীর শান্ত জীবন পারিবারিক ঘাত-অভিঘাত ও দার্ঢ্য নীতিবোধের মোড়কে তাঁর উপন্যাসে চিত্রায়িত। ইংলন্ডের ওয়েসেক্স অঞ্চল ঘুরে ফিরে তাঁর উপন্যাসে চিত্রায়িত হয়েছে, যেখানে হার্ডি-সাহেবের জীবনদর্শনটিও বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে প্রকৃতিকে ঘিরে : প্রকৃতি ও মানুষের এই দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষ কোনও ভূমিকা উল্লেখনীয় রূপ পেয়ে ওঠে না। তবুও এক অর্থে তাঁর উপন্যাসগুলি মাটির স্বাদ বয়ে আনে, নিশ্চিতভাবে ওয়েসেক্সকে চিনিয়ে দেয়। লেক-অঞ্চলের কবি বলে ওয়ার্ডস্বার্থের খ্যাতি আছে ; কিন্তু একটি অঞ্চলকে চিহ্নিত করতে পারাটাই যে আঞ্চলিক সাহিত্যের লক্ষণ নয়, তা আমরা ক্রমশ উপলব্ধি করব।

গ্রামীণ মানুষজনদের দীনহীন ভেবে তাঁদের চরিত্র ও ঘটনাবলীর উপযুক্ত বিশ্লেষণে আমাদের সাহিত্যিকেরা যথার্থ মনোযোগ দিয়ে উঠতে পারেন নি। যেকথা দিয়ে এই নিবন্ধের শুরু—দর্পণটি অস্বচ্ছ থেকে গেছে। বৃহত্তর সমাজ, গোষ্ঠী জীবন রয়ে গেছে গোচরের বাইরে। পটভূমিকা হিসেবে যদিও বা কোনও কোনও অঞ্চল, গোষ্ঠীজীবন বা বৃত্তি সাহিত্যকৃতিতে অনিবার্যভাবে এসে গেছে, চরিত্র বিশ্লেষণ রয়ে গেছে শ্রেণীনিরপেক্ষ, ফলে পটভূমিকাটি অস্পষ্ট থেকে গেছে। কোনও অঞ্চলই তার মানুষদের বাদ দিয়ে স্বকীয়তা পেয়ে উঠতে পারে না। ভৌগোলিক অবস্থানজনিত বিশেষত্ব মানুষের সামাজিক ও আর্থনীতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে অঞ্চলটির রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত তার দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে পারে না। শহরবাসীর জীবনসংগ্রাম যেমন শাহরিক মূল্যবোধ দ্বারা চালিত, প্রত্যন্ত অঞ্চলের গোষ্ঠীবদ্ধ মানব সমাজও নিয়ন্ত্রিত হয় সেই অঞ্চলের সামাজিক আর্থনীতিক পরিপ্রেক্ষিতের মানদন্ডে। শ্রেণীগত অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে না, পরিবর্তন ঘটে তার রূপের, তার সংগ্রামের চেহারার। কেন না, মানুষ অবস্থা নির্বিশেষে তার সমস্যাবলীর মোকাবিলা করবার পন্থা নির্ধারণ তথা উদ্ভাবন করার শক্তি রাখে। কাজেই শুধুমাত্র একটি অঞ্চলের নিখুঁত বর্ণনা এ জাতীয় সাহিত্যকৃতিতে যথেষ্ট নয়, এর সাথে

আকাঙ্খিত বিশ্লেষণটিও জরুরি—মানুষ ও তার পরিপার্শ্ব যার বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে আছে তার আর্থসামাজিক প্রতিবেশ। অঞ্চলটির প্রাকৃতিক বিশিষ্টতা ও গুরুত্ব পুংখানুপুংখ বর্ণনায় উদ্ভাসিত হওয়া আবশ্যক, তাতে করে অঞ্চলটি শুধু তার বিশিষ্ট কায়া নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয় না, তার নিজস্ব আর্থসামাজিক অবস্থাটির প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেয়। কেননা, আমরা আগেই বলেছি, অঞ্চলগত অবস্থান অনুযায়ী আর্থসামাজিক অবস্থানের তারতম্য ঘটে।

সাহিত্যের অংগনে এই অঞ্চলকেন্দ্রিকতা খুব হালফিলের ঘটনা নয়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপাদান এমন কি প্রাচীনতম সাহিত্যকৃতিতে পাওয়া দুষ্কর নয়। বৈদিক সাহিত্যের যে শান্তসমাহিত তপ-জীবনের গ্রামীণ ছবি আমরা পাই, যা রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছিল শান্তিনিকেতন সৃষ্টিতে—তা' কিন্তু বয়সের হিসেবে তিন হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো। নগরজীবন তখনও শুরু হয় নি বটে, কিন্তু আমাদের কাছে বৈদিক গ্রামের চেহারাটাই আদর্শ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। অবশ্যই জীবন সংগ্রামের এই বিংশ শতাব্দীয় ক্রূরতায় ব্যাপারটা অবৈজ্ঞানিক ও রোমান্টিক মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাই আমরা যদি বলি, সাহিত্যের অংগনে আঞ্চলিকতার প্রথম উপাদান পটভূমির যথার্থ বিশ্লেষণের মধ্যে নিহিত, তা হলে বিষয়টির প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এবং এই উপাদানটি, এমন কি, পুরাণেও সহজলভ্য। বাইবেলের অসাধারণ নরক বর্ণনা, নন্দন কানন তথা স্বর্গবর্ণনা—এসবের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার অভিপ্রেত স্থান বা অঞ্চলটির বিশিষ্টতা বুঝিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা রয়েছে, এও অনস্বীকার্য।

এই ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয় নি তিনহাজার বছরেও। বরং এর সাথে অন্য কিছু বিশিষ্টতা যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে আঞ্চলিক সাহিত্যের। রোমান্টিক যুগে ইংরেজী সাহিত্যে যে নবচেতনার উন্মেষ ঘটল, তাতে করে আপন অভিজ্ঞতার আলোকে লেখক-কবিকুল দেখতে চাইলেন গ্রামকে, প্রকৃতিকে—এবং পিছিয়ে থাকা মানুষজনকে। প্রাক্‌রোমান্টিক কবি বার্নস্ কবিতায় বিধৃত করলেন কৃষক জীবনের মর্মবেদনা, ডায়ালেক্ট কবিতাতেও ব্যবহৃত হল। গ্রামীণ মানুষের ধর্মভীরুতা, কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস ও সারল্য নতুনতর আলোকচেতনায় সঞ্চারিত হল। এই নতুন বোধবীক্ষার ঢেউ ভিক্টোরীয় যুগের কঠিন নীতিবোধের জগতকে আঘাত করল—টমাস হার্ডি নিখুঁত গ্রামীণ ছবিতে উপন্যাস ভরিয়ে দিলেন, কিন্তু গ্রামের এত আপন হয়েও তাঁরা রয়ে গেলেন কয়েকজনের

ডায়েরি হয়ে। ভাগ্যে বিশ্বাস ও পলায়নী মনোবৃত্তি তাঁদের সাহিত্যকৃতিকে ক্লেদাক্ত করেছে (আসলে যুক্তিবাদ থেকে যা সরে আসে, তাই ক্লেদাক্ত)। তাই 'ওয়েসেক্স' উপন্যাসরাজির স্রষ্টাও যে যথার্থ আঞ্চলিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন, একথা বলতে দ্বিধা থেকে যায়।

আমরা পটভূমির কথা বলছিলাম। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থানের নিখুঁত বর্ণনায় কোনো অঞ্চলকে ধরে রাখবার প্রচেষ্টা আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ নয়। রাঢ়ভূমির উপস্থাপনায় তারাশংকরের কৃতিত্ব সুবিদিত। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটিতে বীরভূম এভাবে চিত্রায়িত হয়েছে : "বাংলাদেশের কৃষ্ণাভ কোমল উর্বর ভূমিপ্রকৃতি বর্তমান বেহারের প্রান্তভাগে বীরভূমে আসিয়া অকস্মাৎ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। রাজ রাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা ষড়ৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া যেন ভৈরবীবেশে তপশ্চর্যায় মগ্ন।" এবংবিধ পটভূমি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও রয়েছে, যেমন 'দেনা-পাওনা'। দুটি উপন্যাসের পটভূমি বীরভূম, কিন্তু কোনটিই আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত হবার মত নয়। যেমন নয় 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম'—তারাশংকরের এই উপন্যাসযুগ্মক। কিন্তু তাঁরই 'হাঁসুলিবাকের উপকথা'য় আমরা পেয়েছি অঞ্চলগত ডিটেলস্-এর উপস্থাপনা। পটভূমিটি পূর্ণাবয়ব লাভ করেছে এর অধিবাসীদের ক্রিয়াকলাপে, চরিত্র বিশ্লেষণে গোষ্ঠীজীবনের উপস্থাপনায়। হাঁসুলিবাকের চরে কাহারপাড়া। কাহারপাড়ার জীবন্ত বর্ণনাটি লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসঞ্চিত না হয়ে পারে না এবং এইখানেই এসে পড়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বোধ—অভিজ্ঞতার বোধ। শুধু কল্পনাবিলাসী মননের বোধ কখনই মাটির গন্ধলাগা স্বাদ এনে দিতে পারে না। পটভূমির অভিজ্ঞতাসঞ্জাত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কল্পনার বিকাশ মিলিত হয়ে যে চৈতন্যের স্তরের উন্মেষ ঘটায়, তার যথার্থ পরিস্ফুটনের অভাবে আমাদের অনেক সাহিত্যকৃতিই ক্লিষ্ট। প্রকৃতির সৌন্দর্যবিলম বিভূতিভূষণকে আত্মহারা করেছে—দারিদ্র্যের দুঃখ তাঁকে পীড়া দিয়েছে, কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতির বিশ্লেষণের অভাবে গ্রামজীবন সম্পূর্ণতা পেয়ে ওঠে না তাঁর গ্রামকেন্দ্রিক সাহিত্যসৃষ্টিতে।

বরং আমাদের অবাক করে দেন বিহার-প্রবাসী সতীনাথ ভাদুড়ি পটভূমির উপস্থাপনার প্রাঞ্জল ও যুক্তিবাদী উপস্থাপনায়। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটির পটভূমি গড়ে উঠেছে দু'টি গ্রাম্য শহরতলীকে নিয়ে : তাৎমাটুলি ও ধাঙগড়টুলি। সতীনাথ বলছেন : "বাঙ্গালী উকিল হরগোপালবাবু

কতদিনই বা জিরানিয়ায় এসেছেন। এখনও ত্রিশবছর হয় নি। যেবার রেললাইন হল, বাঙ্গালী বাবুভাইয়ারা পিঁপড়ের মত দলে দলে এসে শহরের এদিকে খাড়ি করলেন। ওদিকে সাহেবদের মহল্লা, সাহেবরাই রেললাইন আনিয়েছে নিজেদের পাড়ার কাছ দিয়ে। ওদিকে তো বাবুদের দাল গলল না, ও'রা এলেন এদিকে। তখন ধাঙ্গড়রা থাকত ঐখানেই। লোক দেখলেই তারা পালায় দূরে। তাই তারা এসে বাসা বাঁধলো আজকের এই ধাঙ্গড়টোলায়।" ছোট্ট এই উপস্থাপনায় সতীনাথ পাঠকের কাছে পটভূমিটি উন্মুক্ত করে দেন, সময়েরও ইঙ্গিত পেয়ে যাই আমরা। সাহেবদের প্রতিপত্তি, বাঙ্গালী বাবুদের শহরতলীতে চলে আসা এবং ধাঙ্গড়দের আরো দূরে সরে যাওয়া—এভাবে তিনটি শ্রেণীকে প্রথমেই পরিচিত করিয়ে দেওয়া পটভূমি বর্ণনায় এক অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

রবীন্দ্রনাথ গ্রামকে দেখেছেন কবিত্বময় ভাবমণ্ডিত স্থিতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে, শরৎচন্দ্রের লেখনীতে তা সরলীকৃত, তারাশংকরে এসে তা বর্ণনা-রীতিতে উদ্ভাসিত। বর্ণনায় আন্তরিকতার অভাব নেই, অন্তত ভৌগোলিক-ভাবে চিনিয়ে দিতে পেরেছেন। যেমন, 'অরণ্যবহ্নি'। সিধু কানুর নেতৃত্বে সাঁওতালদের জাগরণ নিয়ে লেখা এই উপন্যাসের জন্য যেমন তিনি 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকার সংখ্যার পর সংখ্যা পাঠ করেছেন, তেমনিই ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার ও হাণ্টার সাহেবের বই পড়েছেন অক্লান্তভাবে—ঘুরেও বেড়িয়েছেন অঞ্চলটি। তাই পটভূমির উপস্থাপনায় 'অরণ্যবহ্নি' অবশ্যই আঞ্চলিক সাহিত্যের যথার্থ ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু একজন প্রত্যন্তবাসী গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ যখন তাঁর জীবনঘেরা অভিজ্ঞতা থেকে সাহিত্যসৃষ্টি করেন, তখন তার স্বাদই হয় আলাদা। অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর একটি উপন্যাসের জন্যই অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি নিজে ছিলেন ওই বাংলার মালো সম্প্রদায়ের মানুষ। 'তিতাস একটি নদীর নাম' তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পরিচয়ের আন্তরিক ফসল। উপন্যাস-টির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলা আছে : "আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করিবার চিত্র খুব কমই আছে। পরিচয়ের অভাবে লেখক অনেক স্থানেই মিথ্যা রোমাণ্টিক, আবার অনেক স্থলে সত্যের ছল হেতু তাঁহার দৃষ্টি বক্র, অদ্বৈতের লেখা এই মিথ্যা রোমান্টিকতা ও সত্যের ছলনা হইতে মুক্ত। তাঁর মানুষ-প্রকৃতি-আনন্দ-বিষাদ সমস্তই জীবন রসিকতার ও নিগূঢ় অনুভবের পরিচয় বহন করে।"

এই অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আইরিশ নাট্য আন্দোলনের প্রথম সারির কবি নাট্যকারেরা 'বোহেমিয়ানস্' নামের আড়ালে দিনের পর দিন বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সংগে মিলেছেন : ইয়েট্স, লেডি গ্রেগরি, জন সিঙ্গ প্রমুখ। ঐ মানুষদের কথা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে জন মিলিংটন সিঙ্গের 'দ্য রাইডার্স টু দি সী' বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। আমরা জানি, এই নাটক লেখার জন্য সিঙ্গ দিনের পর দিন আইরিশ উপকূলে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সেখানকার জেলেদের সংগে মিশেছেন, তাদের সমস্যার সংগে পরিচিত হয়েছেন। নাটকে বর্ণনার সুযোগ নেই—কিন্তু আমরা পাত্রপাত্রীর আচার আচরণ ও সংলাপের মধ্য দিয়ে বুঝে উঠতে পারি আইরিশ উপকূলের ভয়াবহতা, ঐ অঞ্চলের মানুষজনদের জীবিকা, প্রকৃতির নগ্নরূপ ও গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনসংগ্রামের কথা। পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনায় এমন নিপুণতা সহজলভ্য নয়। ন্যুট্ হামসুনের প্রায় উপন্যাসেই এই আঞ্চলিকতা রূপ পেয়েছে অসাধারণ দক্ষতায়, কিন্তু তাঁর নোবেলজয়ী উপন্যাস 'দ্য গ্রোথ্ অফ্ দ্য সয়েল' স্ক্যান্ডিনেভিয়ান গ্রামীণ পরিপার্শ্ব বর্ণনায় অনন্য হয়ে রয়েছে।

ঈশাক একজন কৃষক—হামসুনের দেখা নরওয়ের সেই উপকূলস্থিত গ্রামটি তার যাবতীয় বৈশিষ্ট নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়। তাঁর 'দ্য ওয়ানডারার' উপন্যাসটির পটভূমিও রচিত হয়েছে হামসুনের এই প্রিয় উপকূলবর্তী অঞ্চলটি ঘিরে। 'দ্য উইমেন অ্যাট্ দ্য পাম্প' উপন্যাসে ক্রিশ্চিয়ানিয়া, হামসুনের অনেকদিন-থেকে-যাওয়া উপকূলবর্তী ছোট শহরটি পরিপ্রেক্ষিত রূপে কাজ করেছে, যার "poetry, tawdriness and sheer vitality of life in Hamsun's small Norwegian coastal town—Christiania wraps up most of his creations." (Robert Bly)

বিংশ শতকীয় ইংরেজ ঔপন্যাসিক কনরাডের পটভূমিও, আমরা জানি, অনেক ক্ষেত্রেই আঞ্চলিকতার ইঙ্গিতবাহী। তাঁর 'হার্ট অফ্ ডার্কনেস্' এমনই একটি উপন্যাস। এখানে আফ্রিকার গহন অরণ্যের জীবন বর্ণিত হয়েছে মমতা ও দক্ষতার অনিবার্য সংমিশ্রণে। উপকূল-জীবন বর্ণনায় কনরাড অনন্যসাধারণ—যেমন 'টুইস্ট ল্যান্ড এ্যান্ড সী টেলসে'র গল্পগুলি। এখানে আঞ্চলিক বিশিষ্টতা, বিশেষত যা ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক, তার উপস্থাপনা অসাধারণ, এ'কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। কনরাড যখন 'আলমেয়ারস্ টলি' লেখেন, তখন তাঁর কল্পনায় থাকে এসব অভিজ্ঞতা, জীবনবোধ ও পরিমিতির মাত্রা, ফলে একটি

বিচ্ছিন্ন দ্বীপকে পরিপ্রেক্ষিতে রেখে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হতে তাঁর বাধে না। ইংরেজী সাহিত্যে এই আঞ্চলিকতার ইঙ্গিত বোধ করি প্রথম এনে দেন ল্যাংল্যান্ড, চসারীয় যুগের সাহিত্যিক, তাঁর 'পিয়ারস্ দ্য প্লাউম্যান' কাব্য গ্রন্থের মাধ্যমে। সেখানে কৃষক জীবনের মুখপাত্র হিসেবে পিয়ারস্ কাজ করে যান, ধর্মীয় ও নানাবিধ সামাজিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে চার্চের মুখোস খুলে দেন কবি। এবং এভাবেই ডু-ওয়েল, ডু-বেটেস্ট চরিত্রগুলির প্রতীক ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে নিপীড়িত মানবাত্মার উত্তরণের পথসন্ধান করেছেন তিনি।

ভারতীয় সাহিত্যে আঞ্চলিক পটভূমি রচনায় অনেকেই পারংগমতা প্রদর্শন করেছেন। ছত্রিশগাড়িয়া জীবন নিয়ে কিষাণ চন্দরের 'খিলোনা' যেভাবে ঐ অঞ্চলকে রুক্ষতা ও প্রাকৃতিক বিশিষ্টতা নিয়ে তুলে ধরে, জীবন সংগ্রামের টুকরো টুকরো ছবি ক্রমশ গোটা ছত্রিশগড়ের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে আমাদের সামনে হাজির করে, তা' এক কথায় অসাধারণ, লেখকের নিবিড় উপলব্ধি ছাড়া এ নৈকট্য সম্ভব ছিল না। প্রেমচাঁদের উপন্যাস 'গোদান'-এর আঞ্চলিক প্রতিবেশ রাজনৈতিক কারণে বৃহত্তর বাতাবরণে ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়। তা' ছাড়া, প্রেমচাঁদের গ্রামবর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের মিশেলী প্রভাব রয়েইছে। একদিকে তাকে আবদ্ধ না রেখে আইডিয়ালাইজড্ কিংবা কমন করে তোলার চেষ্টা, আরেকদিকে রয়েছে সরলীকরণ। ফলে, প্রেমচাঁদের গ্রাম বা গোষ্ঠীজীবনের পরিপ্রেক্ষিতটি আসলে প্রতিনিধিত্বমূলক, যেমন 'কফন'। সাহিত্যিক শিবশংকর পিল্লাই কেরালার উপকূলবর্তী গ্রামীণ গোষ্ঠীজীবনকে কেন্দ্র করে যে উপন্যাস-রাজি রচনা করেছেন, তা' কিন্তু বিশেষ করে ঐ অঞ্চলকেই চিনিয়ে দেয়। পটভূমি উপস্থাপনায় তাঁর 'চেম্মীন' এতই অসাধারণত্ব লাভ করেছে যে কেরালার মানুষজন তাঁকে ভালবেসে 'থাকাজী' নাম দিয়েছেন। থাকাজী পিল্লাই-য়ের নিজের গ্রাম, ওখানেই তিনি থাকেন। 'চেম্মীন' মৎস্যজীবীদের জীবন বর্ণনা করেছে, জেলে-নৌকা-ডিঙি-জাল এমন কি চেম্মীনের (বাগ্দাচিংড়ি) সূক্ষ্ম বর্ণনায় তাঁর ডিটেলস্ জ্ঞান আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। পটভূমিটি সমুদ্র উপকূলবর্তী গ্রামীন জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, এখানেই 'তিতাস' ও 'চেম্মীন' এক সুরে কথা বলে। মৎস্যজীবীদের যে ক্ষয়িষ্ণুতা প্রাকৃতিক বিপর্যয়মাত্র নয়, অর্থনৈতিক শক্তির বিমূর্ত প্রকাশ এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে যে এই ধরণের পিছিয়ে থাকা, প্রাকৃতিক মর্জির ওপর নির্ভরশীল গোষ্ঠী তার পূর্ণসত্তা বজায় রাখতে পারে না, সমাজের আর্থিক নীতি ও বাজারের টানা

পোড়েনে তার বিলুপ্তি অনিবার্য এ সত্যটি এখানেই বিধৃত। পিল্লাই ও মল্লবর্মণ জেলেদের জীবন খুব কাছ থেকে জেনেছেন, তাই বুঝেছিলেন মাছধরার মত আদিম উপজীবিকার ওপর নির্ভরশীল গোষ্ঠী মূলত বাইরের সমাজের জানা অর্থনৈতিক শক্তিগুলির সাথে প্রতিনিয়ত সংঘাত আসে এবং সেই পরিপার্শ্ব সময়ের সাথে সাথে তার স্বাধীন অস্তিত্বকে বিনাশ করে। আদিম উপজীবিকা ও গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন বলেই জীবিকার জন্য অর্থনীতি এদের সকল চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই অর্থনীতি একক পেশানির্ভর হলে গোষ্ঠীজীবনের বিনাশ অনিবার্য, তাই তিতাসের মালোরা দ্বিমুখী পেশার দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হয়, আমরা আগেই প্রতিপন্ন করেছি মানুষ নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী পন্থা নির্ধারণ বা উদ্ভাবন করার ক্ষমতা রাখে। তিতাসের মালোদের জীবিকা সম্বন্ধে অদ্বৈতর বিশ্লেষণ এ রকম: "কোনদিন কোন অদৃশ্য শয়তান যদি ইহাদের জালের গিঁটগুলি খুলিয়া দেয়, নৌকার লোহার বাঁধগুলি আলগা করিয়া ফেলে আর নদীর জল চুমুক দিয়া শুষিয়া নেয়, ইহারা মরিবে না। ক্ষেতে শস্য ফলাইবে।" শুধু জীবিকানির্বাহ নয়, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশও এখানে লেখকের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। এবং আমরা জানি, উৎপাদন বৈচিত্র ও বৃদ্ধির ওপরেই আর্থসামাজিক বুনিয়াদটি সুদৃঢ় হয়।

সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'র প্রেক্ষাপটটিও জেলেদের জীবন ঘিরে। গঙ্গা ও তার শাখানদীর কক্ষপথে তার বিস্তৃতি। 'তিতাসে'র মতই এর জীবন আবর্তিত হয় আদিম উপজীবিকা ঘিরে। এখানে সম্পর্কটা আসলে শিকার ও শিকারীর, কখনও শিকার মরছে, কখনও শিকারী নিজেই মরছে—সম্পর্কটা তাই জীবন-মৃত্যুর, যেমনটি হেমিংওয়ের 'ওল্ডম্যান অ্যান্ড দি সী'-এ আমরা দেখি। পটভূমি উপস্থাপনায় এমনতর গভীর জীবনদর্শন না থাকলেও প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্ব-পার্বতী' উপন্যাসটি পূর্বসীমান্তের অধিবাসী পার্বত্য উপজাতির গোষ্ঠীজীবনকে মোটামুটি সফলভাবে চিত্রায়িত করেছে। আদিম প্রাগৈতিহাসিক নাগা উপজাতির জীবন বর্ণনায় লেখকের সাফল্য এসেছে মূলত দু'টি কারণে, একটি, বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর সম্যক্ উপলব্ধি, অপরটি ভৌগোলিক প্রতিবেশের নিখুঁত উপস্থাপনা।

'হাঁসুলিবাঁক' আমাদের ইঙ্গিত দিয়েছিল নতুন এক জীবনের—চন্ননপুরের কারখানা সে জীবনের রূপক। বৃহৎ শিল্পস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজ

ব্যবস্থা কায়েম হতে থাকে—সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মিশেলী প্রভাবে জন্ম নেয় আরেক গোষ্ঠীজীবন। 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' উপন্যাসে গৌরীশংকর ভট্টাচার্য তাকেই পটভূমি করেছেন। মানিকপুরের শ্রমজীবন এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে, যন্ত্র এখানে মানুষের স্বাধীন সত্তার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার শক্তিপদ রাজগুরু যখন 'কেহ ফেরে নাই' উপন্যাসে কয়লাখনির গোষ্ঠীজীবনকে আঁকেন, তখন যন্ত্র সেখানে প্রতিবন্ধক হয় না, পটভূমিটি চিনাকুড়ি কয়লাখনির দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অন্ধতমসাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গসঞ্চারী সদাআতংকময় জীবন-যাত্রার কয়লাখাদের শ্রমিকদের এমন উপস্থাপনা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি' উপন্যাসেও আমরা পেয়েছি, কিন্তু এ দু'টি উপন্যাসই বাস্তবতার সংঘাত এড়িয়ে যায়। পটভূমিটি অবিশ্লেষিত হয়ে থাকে মেলোড্রামার অহেতুক প্রাধান্যে। অথচ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'পদ্মানদীর মাঝি' সৃষ্টি করেন, বাতাবরণটি অসাধারণ বাঙময় হয়ে ওঠে কেবলমাত্র লেখকের সুদৃঢ় জীবনদর্শনের জন্য, কেন না তাঁর কাছে জীবনের কোনও ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয়—প্রত্যেকটি ঘটনারই যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য রয়েছে। ফলে কুবের-হুসেনমিয়া-কপিলাদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন স্বপ্ন দেখতে পারে আশার এক দ্বীপের। পটভূমিকাটি এখানে অবশ্যই নতুনতর ব্যঞ্জনার স্বাদ বয়ে এনেছে, কেননা মানিকের চরিত্রগুলির মূলে নিহিত রয়েছে যুক্তিবাদী নৃতত্ত্বের আস্তরণে। তাঁর 'হলুদ মাটি সবুজ বন' সুন্দরবনের জীবন বর্ণনা করেছে কিছুটা গ্রন্থিহীন দুর্বল স্ট্রাকচারে, যেমনটি মনোজ বসু করেন তাঁর সুন্দরবনভিত্তিক উপন্যাস দুটিতে 'জল জঙ্গল' কিংবা 'বন কেটে বসত'তে। সেখানে মাছ ভেড়ি বহিপ্রকৃতি নিটোল সুষমায় বিধৃত কিন্তু অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যাখ্যা থেকে অনেক দূরে। এই বিশ্লেষণ অগভীর বলে সুন্দরবনের প্রকৃতি চিত্রায়নে যতটা সফল, ততটা নয় ঐ অঞ্চলের জীবন উপস্থাপনায়। সেক্ষেত্রে ফণীশ্বরনাথ 'রেণু' আমাদের অবাক করে দেন 'তিসরীকসম'-এ নৌটঙ্গী-জীবন এঁকে, চলমান জীবনে আঞ্চলিকতাকে এমনভাবে একটি গল্পে ধরে রাখা বড় সহজ কথা নয়। সুশীল জানার কয়েকটি ছোট গল্পের পটভূমি একই রকম বিস্ময়কর ; ছোট ছোট আঁচড়ে আঞ্চলিক প্রতিবেশ সৃষ্টি করেন তিনি তাঁর 'জোরু গরু গারদ' কিংবা 'নগরে প্রান্তরে'-র গল্পে। ওড়িয়া ঔপন্যাসিক রঘুনাথ পাণিগ্রাহীর 'মৃগয়া'ও আঞ্চলিক উপাখ্যান হিসেবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে বৃটিশযুগীয় সাঁওতাল সমাজের নিখুঁত আর্থসামাজিক পটভূমি অংকনে।

তিন

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই, প্রয়োজনীয় বিষয়ে ফিরে আসা যাক। একটি অঞ্চলের ভৌগোলিক বর্ণনাই শুধু কোনও সাহিত্যকৃতিকে আঞ্চলিক অভিধাযুক্ত করতে পারে এমন কিন্তু নয়, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। ডিকেন্সের লন্ডন বর্ণনায় অসামান্যতা আছে, এবং তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই তা' স্থান পেয়ে এসেছে—কিন্তু তাঁর সাহিত্যকৃতি যে আঞ্চলিক হতে পারে নি তার কারণ, সেখানে আমরা একটি বিশেষ শ্রেণীকে পরিস্ফুট হতে দেখি না। ক্যানভাস বিস্তীর্ণ ও প্রায়শ পরিবর্তনশীল শুধু এ কারণেই নয়, আসলে ঘটনাক্রমের প্রতি তাঁর অদম্য কৌতূহল ও ঘন ঘন পরিপ্রেক্ষিত বদলানোও এর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের নীচুতলার মানুষজন এসেছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকেছে উপন্যাসের প্রয়োজনে। তাঁদের শ্রেণীচরিত্রের প্রকাশ ঘনবন্ধ রূপে নেয় নি—ফলে উপন্যাসে কখনও শিথিলতা যেমন এসেছে, তেমনই ঐ চরিত্রগুলি টাইপ হয়ে থেকেছে। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসটিতে আমরা বার্মিজ জীবনযাপনের একটি পটভূমি পাই, কিন্তু সেটিতে যেমন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ'-এও তেমনই নানান্ সংমিশ্রণ এসেছে লেখকের উদ্দেশ্য পূরণের অভিধায়, ফলে পটভূমি আঞ্চলিক হওয়া সত্ত্বেও উপন্যাস দুটি আঞ্চলিক সাহিত্য এমন দাবি করতে পারে না।

এখান থেকেই আমরা দ্বিতীয় সূত্রটিতে যেতে পারি—এই যে চরিত্রের শ্রেণীনিরূপণ ও তার সামাজিক অবস্থানের যথার্থ বিশ্লেষণ, পটভূমিকার সঙ্গে যার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ—পরিপূরকের। মানুষের চরিত্র, আমরা প্রথমেই বলে নিয়েছি, গঠন করে দেয় তার পরিপার্শ্ব ও প্রতিবেশ, আর্থসামাজিক বিধিসমূহ। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষেরা নিরক্ষর, তারা তাদের মত করে জ্ঞান আহরণ করে। আবার রীতিনীতি—এমন একটা মানদণ্ড নিজেরাই খাড়া করে নেয়। ফলে চরিত্রবিকাশও এভাবে হয়। শ্রেণী চরিত্রের বিকাশে বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্য কিছুটা রুগ্নতার পরিচয় দিয়েছে। এর কারণ অবশ্য সাহিত্য তথা শিল্পের অঙ্গনে মধ্যপন্থীদের দাপট, ফলে মধ্যবিত্ত পর্যন্ত একটা কনসিডারেশন আছে। তাঁরাই বই কেনেন ও পড়েন, সবরকম বই, ফলে তাঁদের নিয়ে লেখাটা বাণিজ্যের প্রতিশ্রুতিটুকু অন্তত দেয়। আরেকটি কারণ, বৃটিশ প্রভাব, সাহিত্যে যা আমাদের গন্ডীবদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে, আগে যেমনটি বলেছি, দর্পণটি

অস্বচ্ছ থেকে গেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চল বা গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবন আমাদের রিসার্চের বিষয়বস্তু হয়েই রইল, চরিত্র হয়ে উঠল না।

না উঠলেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু ওপর ওপর দেখে যে ভুল বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা হঠাৎ করেই সাহিত্যে পাওয়া যেতে থাকল, তা কিন্তু সাংঘাতিক ক্ষতিকর। ভুল বোঝানোটা নিজের ভুল বোঝার জন্য হলে এতটা ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যেখানে সেটাই উদ্দেশ্য, সেখানে ক্ষতিটা যে বড় মারাত্মক তা বোধকরি ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। চাষী, কুমোর, কামার, নাপিত, বর্গাদার, জেলে, নাগা, সাঁওতাল চরিত্র হিসেবে খাড়া করলেই হল না—যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা কই? চরিত্রগুলি স্ট্যাটিক হয়ে থাকে, এদের বিবর্তন ঘটে না। চাকরেরা শুধুই মেম-সাহেবের প্রেমিকের জন্য চা এনে দেয়, তাকে পিয়ানো বাজাতে শোনে, মালিককে গোছা গোছা নোট গুণতে দেখে, অথবা বাগানের মালি দিদিমনির সৌন্দর্যে মাথা চুলকে অশ্লীল রসিকতা করে—ভারতীয় সিনেমার মত ভারতীয় সাহিত্যও এমন দৈন্যে বহুদিন থেকেই ক্লিষ্ট। চরিত্রগুলি রি-অ্যাক্ট্ করে না, অথচ জৈবিক নিয়মেই, যে কোনও ঘটনার রিঅ্যাকশন হতে বাধ্য।

চরিত্রবিশ্লেষণের যে মধ্যবিত্ত তোয়াজী দৃষ্টিভঙ্গি, তা' থেকেই এসেছে অবাস্তব কল্পলোকের কথকতা সৃষ্টির প্রবণতা, মিথ্যা রোমান্টিকতার জন্ম দেওয়া। আমাদের সাহিত্যে শ্রেণীবিভেদ ঘোচানো হয় বড়লোকের ছেলের সঙ্গে গরীবের মেয়ের বিয়ে দিয়ে কিংবা উল্টো প্রক্রিয়ায়। প্রেমসর্বস্ব এই উপন্যাসাবলীর মধ্যে নতুন স্বাদ অবশ্যই কিছু উপন্যাস এনে দিয়েছে, এবং সেগুলোর অধিকাংশই যে আঞ্চলিক উপন্যাস সে সম্বন্ধে দ্বিধা থাকার অবকাশ নেই। এই অক্সিজেন কিছুকাল কাজ করে যাবে আশা করা যায়। পটভূমির সংগে আর্থসামাজিক অবস্থানের যে দৃঢ় সম্পর্ক, চরিত্র তাতে নতুন ডাইমেনশন আনে না, বরং ঐ উপস্থাপনাটিকে সঠিক রাস্তায় চালিত করতে সাহায্য করে। ঢোঁড়াইয়ের কথাই ধরা যাক। সতীনাথ ঢোঁড়াইকে এমনভাবে রূপান্বিত করতে চেয়েছিলেন যাতে সে সারা দেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাৎমাটুলির যে স্তর থেকে ঢোঁড়াই এসেছে, সেখানকার সামাজিক অবস্থান কোনও নির্ভরযোগ্য সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক প্যাটার্নে ধৃত নয়। সুতরাং সে রিয়্যালিটি পরিবর্তনের দায় ঢোঁড়াইয়ে বর্তায় না। তাৎমাটুলি থেকে বিসকান্ধায় যাওয়া যেন উন্নততর একটি সমাজব্যবস্থায় উত্তরণ। একালের অর্থনৈতিক সূত্রানিবদ্ধ গ্রামজীবনের পটভূমিকায় ঢোঁড়াই ধীরে ধীরে বিহারের ভূমিকম্প দেখল, '৪২ এর আন্দোলন

দেখল—একটি প্রাকৃতিক ও একটি রাজনৈতিক ঘটনায় অভিজ্ঞতাসূত্রে সে শ্রেণীস্বার্থের ধূর্ত কৌশল শিখে নিল। কংগ্রেসী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার চৌর্যবৃত্তি, দেশপ্রেমের ভড়ং—দুয়ে মিলে তার পর্যবেক্ষণ শক্তি নিবিড় হল। সামুয়ের, রামিয়া, বোকা বাওয়া, গানহী বাওয়া, মহতো, বাবুলাল ও মা বুধনী ছাড়াও মিছিল করে গ্রামীণ চরিত্রগুলি ঘটনায় আন্তঃসূত্রে আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে। সামাজিক প্রতিপক্ষ হিসেবে সে দেখেছে তার স্বরূপ ও ছদ্মরূপ বাবুসাহেব ও লাডলি সাহেবের মধ্যে। কংগ্রেস তথা বুর্জোয়া রাজনীতির মধ্যেই যে কোথাও শ্রেণীস্বার্থের বীজ লুকিয়ে আছে, অস্পষ্টভাবে হলেও ঢোঁড়াই তা বুঝতে পারে। ঢোঁড়াইয়ের চেতনার বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয় নতুন চিন্তার আলোকে—রামায়ণের রাম সত্যরক্ষায় জীবণপণ করেছিলেন। ঢোঁড়াই এ যুগের রাম, যার কাছে সত্য রক্ষার চেয়ে সত্যের যন্ত্রণাই বেশি।

এখানেই 'হাঁসুলিবাঁকে'র থেকে 'ঢোঁড়াই' আলাদা হয়ে পড়ে। করালী জীবনযুদ্ধে পরাজিত কাহারদের নায়ক, কাহারপাড়ার অবলুপ্ত ঐতিহাসিক কারণে, করালী সেই ঘটনাপুঞ্জে হঠাৎই নায়ক হয়ে পড়ে। কিন্তু বনোয়ারী এলোকেশীর সঙ্গে তার প্রেম ও যাবতীয় মধ্যবিত্ত মানসিকতা নিয়ে উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র হিসেবে স্থান পেয়ে আসছে। কাহারপাড়ার সঙ্গে করালীর যে যোগসূত্র তা খানিকটা আরোপিত, যেমন তার পুনরায় হাঁসুলিবাঁকের চরে কাহারপাড়া গড়ে তোলার স্বপ্ন। বনোয়ারী বা করালী বা যে কেউই জানে না ইতিহাসের কোন ধারার প্রতিভূ হিসেবে তাদের ক্রিয়াকলাপ। এদের কারো কোনও প্রতিপক্ষ নেই—যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ করালীর জীবন রূপান্তর আনছে—কাহারপাড়ার জীবনবিন্যাস ভেঙে পড়ছে চন্নপুরের কারখানার হাতছানিতে। তারা "মাঠে ধুলো-কাদার বদলে মাখে তেলকালি, শাবল-কাস্তের বদলে কারবার করে হাম্বর-শাবল-গাঁইতি নিয়ে।" বরং 'গণদেবতার' দেবু ঘোষ তার প্রতিপক্ষকে চিনতে পেরেছে, যদিও সে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় খোঁজে গান্ধীবাদী কর্মকাণ্ডে—সামাজিক সংঘর্ষের চেয়ে সামাজিক হিতসাধনে তার ঝোঁক প্রবলতর।

সমরেশ বসুর 'গঙ্গায়' বিলাস একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র, এ কারণে যে সে গোষ্ঠীবদ্ধ মৎসশিকারীর জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, হিমির সঙ্গে তার প্রেম বাঁধনছেড়া, দুর্দম, গোষ্ঠীমানুষের মধ্যে এই যে গন্ডী কেটে বেরিয়ে আসার চেষ্টা, বিলাস তার খামখেয়ালী প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র। কেন না, তার লক্ষ্যে পৌঁছুবার পথ সে জানে না, নৌকো বেয়ে মাছ ধরা ছাড়া

অন্য পেশা তার জানা নেই, অথচ সে জানে, একদিন এইভাবেই সে তার শিকারের শিকার হবে। এই যন্ত্রণায় বিদ্ধ করছে স্টেইনবেকের 'টর্টিলা ফ্ল্যাট'-এর ড্যানির চরিত্রটি। ক্যালিফোর্নিয়ার মৎস্যবন্দরের রোজগারে যে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন, ড্যানি তার নেতা হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবে সে বন্ধুবান্ধবী পায় প্রচুর। বাঁধনবল্গাহীন জীবনে ফুর্তির ফোয়ারা বয়ে যায়—হঠাৎই সে আবিষ্কার করে তার পুঁজি শেষ। বন্ধুবান্ধবীরা ধীরে ধীরে সরে পড়ে। ড্যানি এখানে গোষ্ঠীনেতা—আসলে সে কিন্তু সামাজিক অবস্থানের উঁচুতে থাকা লোক-জনদের মতন নিজেকে জাহির করতে যায়, কিন্তু তার তো বাইরের সাহায্য নেই, পুরুষানুক্রমিক পুঁজি। তার বিনাশ অনিবার্য। 'অফ মাইস অ্যান্ড মেন' কিংবা 'ক্যানারী রো' গল্প দুটিতে স্টেইনবেকের এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত করছে সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি তাঁর আর্তি ও মমত্ববোধ। বলা হয়েছে : "These two stories which are in every way individual and yet are joined by their intense pity for the suffering of human beings and their obvious delight in the kindness which abounds in every man." ভার্জিনিয়ার দীন কৃষকসমাজ নিয়ে লেখা গল্প দুটি যুক্তিবাদী উত্তরণের নিদর্শন হিসেবে ভাস্বর হয়ে থাকবে।

'পূর্বপার্বতী'র চরিত্র বিশ্লেষণ প্রধানুগ নয়। সেখানে সেংহাইয়ের মত চরিত্র, যার পৌরুষ বলদৃপ্ত, মেহেলীর প্রতি যার প্রেম শুধুই জৈবিক নয়—শেষ পর্যন্ত যে সে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যেতে উদ্বুদ্ধ হয়, তা অসাধারণ প্রেমবোধ থেকেই। আবার এই উপন্যাসেই নারীচরিত্র বিপরীত প্রক্রিয়ায় উপস্থাপিত। ডাইনী নাকাপোলিবার বীভৎসতা, অনিমা চরিত্রের প্রতিহিংসাপরায়ণতা কিংবা রাণী গুইডালোর অসংবদ্ধ অথচ দৃঢ় নেতৃত্ব—সবই উদ্ভাসিত হয়েছে। খৃষ্টীয় ধর্মের প্রভাবে চরিত্রগুলি যে পরিবর্তিত হচ্ছে, তা' কিন্তু আমরা বুঝতে পারি। সমতলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে, তার ঢেউ নাগাদের বিচ্ছিন্ন জীবনেও এসে লাগছে চরিত্রগুলি—সে ভাবে রিঅ্যাক্ট করতে পারছে বলেই তারা আর স্ট্যাটিক্ থাকছে না—ক্রমশঃ চরিত্র হয়ে উঠছে। অপরিচয়ের যে রহস্যঘেরা নাগা পটভূমি .লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেন, ক্রমশঃ তা উন্মোচিত হয়। চরিত্রগুলি ঘটনাবলীসঞ্জাত রি-অ্যাকশনগুলি তাদের মত করে প্রকাশ করে এবং আমরা যে তা' বুঝতে পারি, সেখানেই এই আঞ্চলিক সাহিত্যকৃতির সাফল্য। প্রফুল্ল রায়ের 'নাগমতী' বেদেনী জীবনকে মধ্যবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা এবং বিশ্লেষণ

করা, ফলে তা' ভেল্কীবাজির শিহরণ জাগালেও চরিত্র হিসেবে তা' প্রতিনিধিত্ব-মূলক হয়ে ওঠেনি। এমনটি মনোজ বসুর 'জল জঙ্গলের' এলোকেশী বা মধুসূদনের চরিত্রেও ঘটেছে। সচেতনতা সেখানে আরোপিত মনে হবার মত মাত্রায় ব্যবহৃত। চরিত্র দুটি স্বাতন্ত্র্য পেলেও গোষ্ঠিবদ্ধ প্রত্যন্ত মানুষের মত আচরণ অনেক সময়েই করে উঠতে পারেনি। শ্রমিক জীবনের গাথা 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' উপন্যাসেও দেবজ্যোতি-অমলার সম্পর্কে যে আবেগাপ্লুত অতিরঞ্জন, তাও মধ্যবিত্তসুলভ মেলোড্রামা হয়ে যায়। শ্রমিক বস্তির অন্য মানুষজনেরাও তেমন সচল নয়, তবুও প্রথাবর্জিত চরিত্রাঙ্কনে গৌরীশংকর কিছুটা সফল হয়েছেন এ কথা বলা চলে তাঁর শ্রেণীবিন্যাসের দুঃসাহসিকতার জন্য। আকবরউদ্দীনের 'মাটির মানুষ' উপন্যাসে বিশ শতকীয় প্রভাব নিয়ে দারোগা আব্দুল লতিফ অসাধারণ প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র—চাষী দারোগা হলেও তার টান মাটিতেই, একথা লেখক বুঝিয়েছেন লতিফের চরিত্রে। তাই আতরাফ ও আশরাফ—ধর্মীয় এই গ্রাম্য কোন্দলে লতিফ জড়িয়ে পড়ে অনায়াসে। চরিত্রটি অবশ্য কখনও কখনও তার শ্রেণীর ঊর্ধ্বে উঠে যায়, সেটি লেখকের বৈজ্ঞানিক চেতনার অভাবেই হয়ত বা, তবুও লতিফের চরিত্র বিশ্লেষণ আঞ্চলিক সাহিত্যে নতুনতর স্বাদ আনে, এ' কথা বলা অতিশয়োক্তি নয়।

'তিতাস' স্মরণীয় হয়ে থাকবে মূলত নারীচরিত্রের ব্যাখ্যানে। চাষী ছুতোর জেলে গোষ্ঠীবদ্ধ এসব জীবনে নারীর স্থান একটু স্বতন্ত্র। তাদের স্টোইসিজম বিস্ময়কর অথচ জীবিকার সংগ্রামে পুরুষদের সঙ্গে তারাও সমান অংশীদার। অদ্বৈত-র বর্ণনা শোনা যাক্ : "অনন্তর মা একদিন লক্ষ্য করিয়া দেখিল, টেকোতে পাক দিতে দিতে তার গৌরবর্ণ উরুতে কালো দাগ বসিয়া গিয়াছে। এত সুতা সে কাটিয়াছে, এত সব সুতায় তারই ঘরে জাল তৈয়ার হইতে পারিত, সে জানে সারারাত মাছ ধরার পর বিহানে তার ঘরে ঝাঁকাভরা মাছ আসিত। আর সব লোকের বাড়িতে কত সমারোহ। তাদের পুরুষেরা কিসিম বলিয়া দেয়. নারীরা সেই অনুযায়ী সুতা কাটে, ভাল হইলে পুরুষেরা সুখ্যাতি করে, পাকাইতে গিয়া ছিঁড়িয়া গেলে, মিষ্টি কথায় কত গালি দেয়। নারীরা মুখ ভার করিয়া বলে যে জন ভাল সুতা কাটে তারে নিয়া আসুন। কোন্দলের পরে ভাব হইয়া ঘরখানা মধুময় হইয়া উঠে।" অনন্তর মার নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ফুটে উঠেছে মালো সমাজের সুখী গৃহকোণের ছবিটি, জীবিকার সংগ্রামেও যেখানে প্রেম অলক্ষে খেলা করে।

মানুষের চরিত্র সমাজনিরপেক্ষ নয়, শ্রেণীনিরপেক্ষ তো নয়ই। সে কারণে 'অরণ্যবহ্নি'র সিধু-কানু-রুক্নী-টুক্নীকে মধ্যবিত্ত পশ্চাদ্‌গামিতার শিকার করে ফেলেন তারাশংকর। কিরিস্তান হয়ে গেছে সিধু-কানুর বোন মানকি তার প্রেমিকা-যুগল রুক্নী টুক্নী, শুধুমাত্র এ কারণেই যেন সিধু-কানুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহের সূচনা। যে অর্থনৈতিক বৈষম্য আসলে এই বিদ্রোহের চালিকাশক্তি তারাশংকর তাকে কখনই স্পষ্ট করেন না। বঞ্চনার কথা আছে, এই মাত্র। সিধু-কানু যেন সেই মিথলজিক্যাল বীর আর ইংরেজ মানেই হচ্ছে নারীধর্ষণকারী বদমাশ, এমন ইঙ্গিতেই 'অরণ্যবহ্নি'কে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হতে দেয়নি। মধ্যবিত্ত এই দর্শন ন্যুট হ্যামসুন কিংবা সিঞ্জকে প্রভাবিত করেনি, ফলে সিঞ্জের নোরা, ক্যাথলীন বার্টলি একাংকের ছোট্ট পরিসরে পূর্ণত্ব লাভ করে, আয়র উপকূলবর্তী মৎস্যজীবীদের জীবনটি বিধৃত হয় ঐ চরিত্রগুলির বিন্যাসে আর ন্যুট হ্যামসুনের চরিত্রেরা "Sink roots into the deepest myths about the struggle to cultivate the land and make it fertile. The twin concerns of his novel—the perversion of the individual self by society : the human urge for union with the natural world. (Robert Bly) এমনটি কিন্তু টমাস হার্ডির চরিত্রেরা পারেনি। তারা প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তাকে ভাগ্যনিয়ন্তা জেনে 'টৌববল্' জেনে কিন্তু নিজেদের গঠন করতে শেখেনি। ফলে আঞ্চলিকতার চারিত্রিক উপাদান থাকলেও তা আসলে ভীতিমনস্ক হতাশবাদীর জীবনদর্শন হয়ে পড়েছে, মানুষের চরিত্রবিকাশের সঠিক তত্ত্ব হার্ডি সাহেবের আয়ত্তাধীন ছিল না, তাই 'ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড' এর গ্যাব্রিয়েল ওক কিংবা 'টেস ডা আরবারভিলস' এর টেস কিংবা 'রিটার্ন অব্ নেটিভে'র ডিগরী ভেন—এরা সবাই মাটির কাছাকাছি থেকে যায়, ঐ মাটিতে জন্ম নেয় না। কনরাডের উপকূল জীবন বর্ণনায় সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র, মার্লো এবং নার্সিসাসের 'নিগার' সত্যিকারের আঞ্চলিক চরিত্র, কেননা এদের শিকড় ঐ মাটিতেই, এদের শিক্ষা আচরণ এমন কি খাদ্যাহরণ প্রকৃতির বাতাবরণে সহজাত মানব প্রবৃত্তির পরিচয় বহন করে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি' উপন্যাসের বাতাবরণটি আগে বলেছি, সঠিকভাবেই কয়লা শ্রমিকদের বস্তিজীবনকে ঘিরে সৃষ্ট। কিন্তু ঐ বস্তিজীবন ব্যর্থ চরিত্রবিশ্লেষণে অগভীর চিন্তাভাবনায় উপস্থাপিত বলে আঞ্চলিকতার যথার্থ স্বাদ আমরা পাই না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'কয়লাকুঠি'

সম্পর্কে বলছেন : "শৈলজানন্দের গ্রাম্যজীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ, কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাত আসে নি। বস্তিজীবন এসেছে, বাস্তবতা আসে নি।" আসলে বাস্তব ও বাস্তবতার সংঘাত এক কথা নয়। ফটোগ্রাফিক বাস্তবতা খুব জরুরী নয়, যতটা জরুরী তার সংঘাত, মাণিক নিজে এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলে 'বাগ্দী পাড়া দিয়ে'র মত গল্পের সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় 'হারানের নাতজামাই'-এর মত গল্প কিংবা 'পদ্মানদীর মাঝি'র মত উপন্যাস। 'পদ্মানদীর মাঝি' নিশ্চিত-ভাবেই হেমিংওয়ের 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী'র কথা মনে করিয়ে দেয়। সেখানকার হোসেন মিঞা, 'গঙ্গা'র নিবারণ সাঁইদা আর হেমিংওয়ের সেই বৃদ্ধ মানুষটি আসলে সেই সংগ্রামের মূর্ত প্রতীকী চরিত্র, যাদের "struggle with a giant fish is an epic study of triumph and defeat, of man pitted against the savagery of nature." 'পদ্মানদী'র আঞ্চলিকতা অবশ্য ততটা চরিত্রনির্ভর নয়, কেননা, ব্যক্তিগত আশাপূরণের গার্হস্থ্য রূপটিও এখানে বিধৃত, কায়িক সংগ্রাম এদের জীবিকা, কিন্তু এরা স্বপ্ন দেখে কুতুবদীয়া দ্বীপের, শাসন সেখানে নিপীড়ন নয়, মহাজন সেখানে কালো টাঁ্যাক নিয়ে দাঁত খোঁচায় না। গ্রামের নিম্নবিত্ত ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিক চরিত্রগুলি এভাবেই তাঁর লেখনীতে জাগ্রত হয়ে রয়েছে—বাস্তবের শোষিত শ্রেণীকে জাগাবার জন্য।

চরিত্রগুলির মধ্যে আর্কিটাইপ আরোপ করা আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। টোটেম হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস ও ধর্মাচার এবং সংস্কার থেকে উদ্ভূত এক প্রতীক যা তার ধর্মীয় তথা সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের চরিত্রে এর সমান্তরাল ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয় আর্কিটাইপের মাধ্যমে। সুন্দরবনের নদীনালা বিধৌত গভীর বনাঞ্চলে দক্ষিণ রায় বা বনবিবি যদি টোটেম, 'তিতাসে' মোহিনী রাধা হচ্ছে সেই টোটেম। 'ঢোঁড়াই'এ ঢোঁড়াই চরিত্রে রামায়ণের রাম চরিত্রের সমান্তরাল ব্যঞ্জনা এনে আর্কিটাইপাল প্রয়োগ করা হয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব এজন্য বেশি যে এতে করে শিল্পী সাহিত্যিকেরা তাঁদের উপজীব্যটি সহজেই সাধারণ্যে পেঁছে দিতে পারেন কেননা পুরাণ শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সমান প্রভাবশালী। 'তিতাসে'র চলচ্চিত্রায়ণে অবশ্য জগদ্ধাত্রীর আর্কিটাইপ ব্যবহার করেছেন ঋত্বিক ঘটক, হয়ত জগদ্ধাত্রীর মত মালোদের যুদ্ধজয়ী হবার ইঙ্গিত রয়েছে ওখানে, কিন্তু আমাদের দেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব জেলে-জোলা-কৈবর্ত-ছুতোর ইত্যাকার শ্রেণীর মধ্যেই বেশি পড়েছিল। সেক্ষেত্রে অবশ্য মোহিনী

রাধার আর্কিটাইপ প্রয়োগই বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। হার্ডি বা সিঙ্গ সাহেবের রচনায় প্রকৃতি এমন প্রতীকী ব্যঞ্জনা পেয়েছে—ডেস্ট্রাকটিভ টোটেম। এঁদের প্রকৃতি ওয়ার্ডস্বার্থের সচল সর্বংসহা ঔদার্যের প্রতীকী ব্যঞ্জনা পায় নি।

চার

চরিত্রসমূহের বিকাশের পর্যায়ে যেসব কার্যকর উপাদান কাজ করে যায় অবিরত, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, কোনও অঞ্চলের বিশেষ আনন্দানুষ্ঠান, মেলা, পরব—এসবের ধারানুগ বর্ণনা তার অন্যতম। গোষ্ঠীবন্ধ যে জীবন উপন্যাসের উপজীব্য, তার একটি বিশ্বাস্য রূপ এভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরা হয়। আমরা আবার 'তিতাসে' ফিরে যাই, যেখানে আমরা সচেতন না হয়ে পারি না যখন দেখি দুর্নিবার জীবন সংগ্রামেও মালোরা জীবনকে উপভোগ করার স্পৃহা হারায় না। উন্মুক্ত আকাশের নীচে তিতাস তাদের মুখে গান এনে দেয় :

"বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের এই নদী-বিহারীদের কতকগুলি নিজস্ব সম্পদ আছে। অমনিতেই তারা শুইয়া পড়ে না। ঐগুলিকে বুক দিয়া ভোগ করিয়া নিয়া তবে নিদ্রার কোলে আশ্রয় নেয়। কোনো নৌকায় মুর্শিদা গান হইতেছে :

এলাহি দরিয়ার মাঝে নিরাঞ্জনের খেলা

শিলপাথর ভাসিয়া গেল শুকনায় ডুবল ভেলা।

কোনো নৌকায় হইতেছে বারোমাসি :

এহী ত আষাঢ় মাসে বরিষা গম্ভীর

আজি রাত্রি হবে চুরি লীলার মন্দির।

কোনো নৌকায় টিমটিমে কেরোসিনের আলোর কাছে আগাইয়া জরাজীর্ণ একখানা পুঁথি সুর করিয়া পড়া হইতেছে :

হাস্মক রাজার দেশের

উত্তরিল শেষে রে।

কোনো নৌকায় কেচ্ছা হইতেছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে গান ভাসিয়া আসিতেছে :

আর দিন উঠে রে চন্দ্র পূবে আর পশ্চিমে,

আজোকা উঠছে রে চন্দ্র শানের বান্ধান ঘাটে।।"

আবার 'ঢোঁড়াই'-য়ে সতীনাথ তাৎমাদের সবার সম্বন্ধে জানাচ্ছেন : "থানের

পাশে ইঁদারা করে তার বিয়ে দিয়ে দাও, না হলে বড় অসুবিধে হয় আমাদের দশবিধে।" অথবা "ঢোঁড়াই বিয়ে করবে এ বাওয়া (ঢোকা) ক-বছর আগে থেকেই ধরে নিয়েছে। আর বিয়ের পর তাৎমা ছেলেমেয়েদের মা বাপ, শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে থাকার রেওয়াজ নেই।" আমরা জানলাম তাৎমাদের বিয়ের সময় কুয়োর জল প্রয়োজন—ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কুয়োয় তাদের যেতে মানা তাই এই কুয়ো কেটে দেবার প্রস্তাব। তাৎমাদের মধ্যে বহুবিবাহ এমনকি মেয়েদের মধ্যেও প্রচলিত। ঢোঁড়াই গিন্নি রামিয়া সামুয়রকে বিয়ে করতে পিছ-পা ছিল না, কিন্তু মালোদের মেয়েদের দু'বার বিয়ে করার কথা ভাবাই পাপ। ময়না ছোঁড়ার সাথে সুবলার বৌ কথা বলায় তার মা তাকে বকাঝকা করছে, আমরা 'তিতাসে' তা দেখেছি। আবুল ফজলের 'চৌচির' বিশ শতকীয় গ্রামীণ কুশিক্ষা ও কুসংস্কারকে বিবৃত করে বিশ্বাসযোগ্যভাবে। বন্দে আলি মিঞার 'ঘূর্ণি হাওয়া'তেও আমরা দেখি কুসংস্কার কুরে কুরে খাচ্ছে গ্রামীণ জীবনকে। গ্রামীণ বিশ্বাস, অপদেবতার ভয়, সুপারন্যাচারালইজমের উপস্থাপনায় আঞ্চলিক সাহিত্য ধনী হয়েছে, যদিও লোকসাহিত্যের এসব ছড়ানো ছেটানো উপাদান সংগ্রহ পরিশ্রম সাপেক্ষ। এই বিশ্বাস 'ওল্ড ম্যান এ্যান্ড সী'-তে যেমন কাজ করে, তেমন প্রভাব ফেলে হামসুনের 'দ্য ওয়ানডারারসে', আবার 'আলমেয়ারস্ টলি'তেও কনরাড লৌকিক বিশ্বাসের চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করে বিচ্ছিন্ন দ্বীপটিকে যথার্থভাবে বর্ণিত করেন, যেমনটি কোলরিজ অসাধারণভাবে করেন জেরাল্ডিনের মাধ্যমে ক্রিস্টাবেল কবিতায়, কিংবা সেই নাবিকের মাধ্যমে আনসিয়েন্ট ম্যারিনার কবিতার ছত্রে ছত্রে। 'গঙ্গা' উপন্যাসে সমরেশ অলৌকিক কুসংস্কারে নিবারণ সাঁইদার বিশ্বাস, দলনেতা পাঁচুদাদার তাতে আস্থা—পাশাপাশি বিলাসের অনাস্থা, যা তার বেপরোয়া মনোভঙ্গির প্রকাশক—এসবই এই ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গ্রথিত হয়। 'পূর্বপার্বতী'র ঋতুচক্র ও কৃষিকর্মের উৎসব বর্ণনায় আঞ্চলিকতার রং লেগেছে পুরোপুরি। ডাইনী নাকাপোলিবার চরিত্র এনে লেখক ডাইনীর যে প্রভাব ঐ সমাজে কাজ করে, তা ব্যক্ত করেছেন। আমরা জানতে পারি, বিয়ের আগে দু'মাস নাগা স্ত্রী পুরুষে দেখা হওয়া নিষিদ্ধ। শিকার যাত্রার পূর্বে স্ত্রীসঙ্গ অপরিহার্য।

লোককথা, পাঁচালী, কথকতা, ব্রতকথা এ কারণে এ জাতীয় সাহিত্যকৃতির অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। এই ধর্মবিশ্বাস ক্রমশ আর্থ সামাজিক জীবনটিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। তারাশংকরের 'গণদেবতায়' ইতুলক্ষীর ব্রতকথা, ঘন্টাকর্ণের

পুজো, ষষ্ঠী পুজো, গাজন, নবান্ন—উৎসবের ছড়াছড়ি। এর অনেকটাই অপ্রয়োজনে এসেছে, কিন্তু সতীনাথ যখন ঢোঁড়াইয়ে বলেন "এ ঢের সালের কথা, দশ সাল, বিশ সাল, এক কুড়ি, দো কুড়ি, তিন কুড়ি সালের কথা। মনে মনে গুনবার মিছা চেষ্টা করত, এর মধ্যে ঝোটাহারা ক'বার স্নান করেছে।" তাৎমা মেয়েরা বছরে একবার স্নান করত, ছট পরবের সময়; যারা একটু ছিমছাম, তারা মাসে একবার—তখন তা' অনায়াসেই উপন্যাসে সংযুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু মানিক ভেঙে দিলেন পুজোপার্বণের নামে অত্যাচার আর নিপীড়নের এই পালা। সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে তেভাগা আন্দোলনকেন্দ্রিক তাঁর গল্প 'বাগদীপাড়া দিয়ে'তে দেখা গেল, বাগদীরা ঠাকুরের বাঁধানো ঘাট ভেঙে দিচ্ছে, কেন না তাদের জমিদার ঐ থান বাঁধিয়ে দেওয়ায় পুরো নিচু অঞ্চলটা 'বদজলে' ভরে থাকে। বাগদীপাড়ার জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ওদের বাধা দিতে এসে জমিদারের লেঠেল বাগদী মেয়ে দুলারীর খোন্তার আঘাতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। মানিক ওদের দিয়ে বলান: "সংসার পাল্টে গেছে। বামুনের চেয়ে সেরা জাত এয়েছে পিথিবীতে। মজুরের জাত, খাটিয়ের জাত।"

এই লোকাচার-পুজোপার্বণ বা আধিদৈবিক শক্তির প্রভাব বঙ্কিম-শরতের লেখাতেও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে, কিন্তু যেহেতু তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ধরন ছিল অন্যবিধ, সে প্রসঙ্গ এখানে আলোচিত হবার অবকাশ নেই। এই লোকায়ত প্রভাব আঞ্চলিক সাহিত্যের গঠনরীতিকে পাঠকের কাছে বিশ্বাসনীয় রূপে তুলে ধরতে সাহায্য করে। লোক-সাহিত্য একক সৃষ্টি নয়, সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি; সাহিত্যাকৃতির আঙ্গিক হিসেবে তা' যেমন বৈচিত্র্য এনে দেয়, তেমনই এনে দেয় আঞ্চলিকতার নিবিড় সুষমাটি। বর্ণনারীতিতে যুক্ত হয়েছে লৌকিক কথকতা, পাঁচালী ঢং কিংবা সূত্রধার চরিত্র, ফলে সাহিত্যাকৃতি প্রাঞ্জল ও সজীব হতে পেরেছে। উপন্যাসে গল্প বলার দু'রকম ধরন আমাদের জানা আছে। একটি মহাকাব্যিক ধরন, হেনরি লুকাচ যাকে বলেছেন 'ন্যারেশন'—ধারানুগ বর্ণনা; অপরটি চিত্রানুগ রীতির বা 'ডেসক্রিপশন'। বঙ্কিমচন্দ্রের কিংবা রবীন্দ্রনাথের বর্ণনারীতি অবশ্যই ধারানুগ, এমন কি শরৎচন্দ্রেরও। তাঁরা যখন বর্ণনা করেন, তখন দৃশ্যের অবতারণা সেখানে অবান্তর। যেমন 'গোরা'র প্রকৃতি বর্ণনার দীর্ঘ অংশটুকুও নিবিড়ভাবে উপন্যাসের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে, আবার তারাশংকর যেহেতু চিত্রানুগ বর্ণনারীতিতে বিশ্বাসী, তাঁর 'গণদেবতা,' 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাসে পুজোব্রত অনাবশ্যক দীর্ঘসূত্রী।

লিপিবদ্ধ এসব ঘটনা ডায়েরি পড়ার মত ক্লান্তিকর। রবীন্দ্রনাথ গ্রামকে ভাল জানতেন বলে তারাশংকরকে কমপ্লিমেন্ট দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর গ্রামকে জানার মধ্যে অসংগতি ছিল—যুক্তিবাদী চিন্তার চেয়ে আবেগ ও সরলীকৃত সেন্টিমেন্ট সেখানে কাজ করেছে বেশি, ফলে তাঁর বর্ণনারীতি প্রায়শই হোঁচট খেয়েছে। 'হাঁসুলীবাঁকে' এ দুর্বলতা কিঞ্চিৎ কম, কিন্তু 'গণদেবতা' কিংবা 'অরণ্যবহ্নি'তে অহেতুক এপিসোড আমদানি মধ্যবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গিসঞ্জাত। প্লাতো আরিস্ততলের বিধানমত 'মহান' মানুষের জন্য উৎপাদনরত দাসানুদাস শ্রমিকশ্রেণী সৃষ্টি করার তাগিদ এতকাল পরে অনেকের মত তাঁকেও পেয়ে বসেছিল। প্রেমচাঁদ এমন কি অধুনা ফণীশ্বরনাথ-ও এর থেকে মুক্ত হতে পারেননি। যদিও প্রেমচাঁদ বাস্তবতার সংঘর্ষে যাবার সাহস দেখাতে পেরেছিলেন, কিষাণচাঁদ কিংবা ফণীশ্বর বর্ণনা রীতিতে বোধকরি আরও প্রাঞ্জল আরও গভীর আরও মমত্বময়। কিষাণ চাঁদের বর্ণনারীতি যেখানে ধারানুগ, ফণীশ্বর কখনও কখনও চিত্রার্পিত রীতির হাতে বন্দী হয়ে পড়েন, কেননা তিনিও সমস্যার গভীরতম বিন্দুটি আবিষ্কার করতে চান না। ফলে লৌকিক আবহে তাঁর 'রঙ্গ সে বিরঙ্গ' কিংবা 'তিসরী কসম' রোমান্টিকতায় আপ্লুত হয়ে পড়ে। আবার লৌকিক শ্রুতি থেকে প্রেমচাঁদের গল্প 'পিসানহারীর কুয়ো' সঠিকভাবেই আঞ্চলিক বর্ণনারীতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বর্ণনার আন্তরিক নৈকট্যে।

সতীনাথ বা মানিকের ভাষার যে স্বাতন্ত্র্য তা' তাঁদের বিষয়-উপলব্ধির সম্যক্ ফসল। সতীনাথের ভঙ্গি একটু সরস, চলিতভাষার সঙ্গে ডায়ালেক্টের চমৎকার ব্যবহার তাঁর বর্ণনারীতিকে অসাধারণত্ব দিয়েছে। 'ঢোঁড়াই'-য়ে সতীনাথের বর্ণনারীতির ছোট্ট একটি টুকরো : "বাওয়া নিজের চোখে সাক্ষী, আর সাক্ষী ভুপলাল সোনার। ভুপলাল সোনারের নাও মনে থাকতে পারে, সে রাজা আদমী, তার গাহকীর ভরমার। ঢোঁড়াই তখন পাঁচ-ছ' সালের হবে। বাবুলাল গিয়েছে ভাই চেরমেন সাহেবের সঙ্গে দেহাতে, দিন কয়েকের জন্য। বুধনীর তখন দুখিয়া পেটে। এমনি তো বাবুলাল বৌকে বাড়ীর বাইরে কাজ করতে দেয় না; ইজ্জৎবালা আদমী সে। তাই বুধনী সেই ফাঁকে সাত আনা পয়সা রোজগার করেছিল। লগা দিয়ে শিমুল ফল পেড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ফাটিয়ে সেই ভিজে শিমুল তুলো বেচেছিলো কিরানীবাবুর জেনানার কাছে। কিরাণী-বাবু বাবুলালের অফিসের মালিক। বুধনীর ভারী ইচ্ছে ঢোঁড়াইকে চাঁদির জেবর দেয়, কোনও দিন তো কিছু দেয় নি।"

মানিকের রচনারীতিতে শিথিলতা আছে, ডায়লেক্ট ব্যবহারের প্রবণতাও কম। ডায়লেক্ট ব্যাপারটাই আমাদের সাহিত্যে বিচিত্র সত্যের ছলনা নিয়ে আসে—ঢাকা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার মিশেলী এক কথ্য ভাষার মিশ্রণে অবলীলাক্রমে ডায়লেক্ট বলে যা গ্রাম্য বর্ণনারীতিতে উল্লেখিত, তা' উপন্যাসের তথা সাহিত্য-কৃতির রসভোগ্যতার পক্ষে ক্ষতিকর। ডায়লেক্ট ব্যবহার না করেও মানিক তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে অনায়াসে পৌঁছে যান তাঁর টানটান, ঋজু, স্পষ্ট এবং সরল গঠন-রীতির সাহায্যে। বর্ণনারীতির সঙ্গে উপলব্ধির সচেতনতা যুক্ত হয়ে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এতটাই হয়েছিল যে 'গ্রামের কল্পিত স্বপ্নময় রূপের উপরকার কুহকের পর্দাটাকে একটানে ছিঁড়ে ফেলতে তাঁর অসুবিধে হয় নি।' 'তিতাসে'র অদ্বৈত নিজে ছিলেন মালো, কিংবা 'চেম্মীনের' শিবশংকর পিল্লাই ছিলেন চাষী, স্বাভাবিক-ভাবে তাঁদের বর্ণনারীতিতে সত্যের ছলনা থাকে না। কিন্তু ডায়লেক্টও ব্যবহার করতে জানা চাই, পরিমিতির অভাবে তা' পাঠকের অসুবিধের সৃষ্টি করবেই। অদ্বৈত-র সেই সাবলিমিটি বোধ ছিল। অনন্তবালা বলছে তার নিঃসঙ্গ জীবনের কথা: "পুরুষ কি ভইন্ কেবল এরই লাগি? পরের ঘরে চাইয়া দেখ, সংসার চালায় পুরুষে। নারী হয় তার সঙ্গের সাথী। আমার যত বিড়ম্বনা।" নারীর চিরন্তন উপলব্ধি এই ছোট্ট সংলাপেও অবলীলায় প্রকাশিত হয়েছে, কিংবা তীক্ষ্ণ দৃপ্ত ডায়লেক্ট মিশ্রিত এই সংলাপটি—সুবলার মা বলছে তার মাকে: "আমি ময়নার সাথে কথা কমু, তার সাথে পুরীর বাইর হইয়া যামু......খাইতে দিবা না, খামু না, পরতে দিবা না, পরুম না। কিন্তুক আমি বাইর হইয়া যামুই। তোমরার মুখে চুণকালি পড়ব, আমার কি।...একলা গভর আমি লুটাইয়া দিমু, বিলাইয়া দিমু, নষ্ট কইর‍্যা দিমু, যা মনে হয় তাই করুম, তোমরা কথা কইতে পারবা না। মনে কইর‍্যা দেখ কোন্ শিশুকালে বিয়া দিছিলা, মইরা গেছে, জানলাম না কিছু, বুঝলাম না কিছু, সেই অবুঝকালে ধর্ম কাঁচা রাঁড়ি বানাইয়া থুইছে। সেই অবধি পোড়া কপাল লইয়া বনে বনে কাইন্দা ফিরি। তোমরা কি বুঝবা আমার দুঃখের গাঙ্ কত গহীন্। আমার বুঝি সাধ আহ্লাদ নাই। আমার বুঝি কিছুর দরকার লাগে না?" নারীর না পাওয়ার দুঃখ সর্বত্র এভাবেই কান্না হয়ে ঝরে পড়ে।

যা কিছু তারাশংকরের দুর্বলতা, কখনও কখনও তাই তাঁকে মহত্তম বর্ণনা-রীতিতে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন 'হাঁসুলিবাঁকে' কথকতার ভঙ্গিতে, বিভিন্ন চরিত্রের জবানীতে ইঙ্গিতময়তার সাহায্যে তিনি একটি লোকায়ত পরিপার্শ্ব গড়ে তুলতে

পেরেছেন। বাউরী ভাষার প্রয়োগে বাংলা সাহিত্যে নতুন স্বাদ এসেছে। ১৯ অক্টোবর, ১৯৪৭ তাঁকে লেখা আচার্য সুনীতিকুমারের পত্রাংশ তা' স্বীকার করেছে : "…ভাষানুসন্ধানীর কৃতজ্ঞতা—বাউড়ীদের ভাষার অনেক টুকিটাকি জিনিস পাইলাম যা ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে।" 'অরণ্য বহ্নি'তে নব্বুই বছরের বৃদ্ধ পটুয়া নয়ন পালের গানের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের আঙ্গিক গড়ে তুলেছেন তারাশংকর। লৌকিক আবহ ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনায় সঠিক শরীর নিয়ে উপস্থিত হলেও নষ্ট সামন্ততন্ত্রের প্রতি তাঁর অহেতুক টান সবটাই "ভগমানের লীলা। ভগমান কখনও কালা, কখনও কৃষ্ণ, বুয়েছেন। যখন পাপ বারে…তখন মা নিজে আসেন, কখনও তাঁর ঐ কালকেতু-বিরূপাক্ষকে পাঠান।" কালকেতু-বিরূপাক্ষ হচ্ছেন সিধু-কানু. এই ভঙ্গিই তারাশংকরের উদ্দেশ্য তথা প্রতিপাদ্যটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেয়। মিথ-এর ব্যবহারে নাট হ্যামসুন কিন্তু এমন মধ্যবিত্ত মানসিকতার পরিচয় দেননি, কেন না জীবন দর্শন ও বর্ণনারীতির মধ্যে সম্পর্কটি খুবই ঘনিষ্ঠ, হার্ডি বা সিঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা তা দেখি—ভাগ্যনিয়ন্তা সেখানে প্রাকৃতিক শক্তি. মানুষ সেখানে আত্ম-সমর্পণে বাধ্য। কিন্তু নিছক আত্মসমর্পণে কি জীবনধারা নিত্যনতুনরূপে সঞ্চারিত হয় কোটি কোটি গোষ্ঠীবদ্ধ কিংবা তথাকথিত মানব জাতির শরীরে? পেসিমিজম থেকে যে বর্ণনারীতি উদ্ভাবিত হয়. তাই হার্ডি বা সিঞ্জ সাহেবের করায়ত্ত। কিন্তু প্রচলিত মিথ ব্যবহার করে হ্যামসুন যখন কৃষি-র উৎকর্ষের রহস্য সন্ধান করেন 'দ্য গ্রোথ অব সয়েল' উপন্যাসে কিংবা 'দ্য উইমেন অ্যাট দ্য পাম্পে' করেন জলের রহস্য সন্ধান, তখন আদিম ও চিরপ্রয়োজনীয় দুটি প্রতীক তাঁর উপন্যাসে মূর্ত হয়ে ওঠে : জল ও কৃষি। এবং আমরা জানি, এই দুইয়ের সঠিক ব্যবহারেই কেবল মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন মিটবে।

জীবনবোধের সীমাবদ্ধতা থেকে প্লটের সীমাবদ্ধতা এসে যায়—এই দুইয়ের টানাপোড়েনে বর্ণনারীতিও হোঁচট খায়। গোটা ব্যাপারটাই ধোঁয়াটে থেকে যায়। ফোটোগ্রাফিক বাস্তবতা নয়, মানিকের কথাই ঠিক, বাস্তবতার সংঘর্ষ প্রয়োজন। 'পদ্মনদীর মাঝি'-র সেই সাম্যের দ্বীপটির দিকেই আপাততঃ আমাদের লক্ষ্য স্থির থাক্। কেন না পৃথিবীতে যা কিছু সমস্যা, তা' একশ্রেণীর মানুষেরই তৈরী. তারা ধনী এবং শোষক। প্রত্যন্তবাসীরা যেদিন অদ্বৈত'র মত, পিল্লাই-য়ের মত নিজেরাই নিজের কথা লিখতে পারবেন, গ্রামীণ অর্থ-নীতির সূত্রটি যেদিন যথার্থ বিশ্লেষণ পাবে সাহিত্যকৃতিতে, সেদিন হয়ত

আবার রচিত হবে ঢোঁড়াই, তিতাস, হাঁসুলীবাঁক, পূর্বপার্বতী কিংবা পদ্মা-নদীর মাঝি, গঙ্গা। নষ্ট সামন্ততন্ত্রের গ্রাম নয়, নয় অনৈতিহাসিক গোষ্ঠী-জীবনচর্চা, মানুষের জীবন প্রকরণের অর্থবহ অবদানের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে স্রষ্টার বৈজ্ঞানিক সমাজ-চিন্তার মধ্যে তাঁর সমাজমুখী ঝোঁক প্রত্যক্ষ করতেই হবে।

আসলে স্রষ্টার এই সচেতনতার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসংগ, যা দিয়ে এ নিবন্ধের শুরু, পরিপার্শ্ব, আর্থ সামাজিক বিশ্লেষণ ও মানুষের শ্রেণীচরিত্র এককথায় সমাজ বিকাশের প্রসংগ। আমরা যে জাতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার সৃষ্টি করে উঠতে পারিনি, তার কারণ নিশ্চিত-ভাবে নিহিত আছে সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিকল্প হিসেবে নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির রূপরেখা নির্ধারণে ব্যর্থ হওয়া। ফলে ঢোঁড়াই-তিতাস-হাঁসুলিবাঁকেরা যে নতুন হাওয়া বইয়ে দিল তার ধারা রক্ষিত হল কৈ? আঞ্চলিক সাহিত্য প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনেরই একটি ধারা, কেন না সাহিত্যের প্রথাগত নিগূঢ় অনুশাসন সে মানেনি। প্রগতি সাহিত্যের স্ব-বিরোধিতা কাটিয়ে ওঠার সংগেই জড়িয়ে রয়েছে এক সার্বিক বিকাশের সম্ভাবনা।

ঋত্বিক ঘটকের প্রকৃতি-অনুভাবনা

শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে প্রকৃতি চিরকালই সমাদৃত। মানুষের সৌন্দর্যবোধ, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকী ব্যঞ্জনায় প্রকৃতি কখনও শুধুই শোভাবর্ধন করে গেছে শিল্পের, কখনও বা গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতময় ভূমিকা পালন করে গেছে। মানুষের প্রথম শিক্ষালাভ আসলে প্রকৃতির বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে শুরু হয়েছে সভ্যতার সেই সুপ্রাচীন স্তর থেকে। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ জীবনে মানুষ তার আহার্য-পরিধেয় সন্ধান করে ফিরেছে প্রকৃতির বুকে। ঝড়ে-জলে সে ত্রস্ত হয়েছে, প্রখর খরদহনে সে পীড়িত হয়েছে, আবার সবুজ শান্ত শ্যামলিমায় সে আশ্বস্ত হয়েছে, আর এভাবেই গড়ে উঠেছে তার জীবনবোধ যা শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বীক্ষায় রূপান্তরিত হয়ে সংস্কৃতি তথা সভ্যতার বিকাশে সতত প্রেরণা জুগিয়েছে। অতি-প্রাকৃত ঘটনাবলীর শঙ্কাজনিত আধিদৈবিক ব্যাখ্যা কিংবা

আনন্দদায়ী অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়েছে সংস্কৃতির প্রথম সূত্র—মানুষের অনায়াস শিকার যাত্রা, আদিম পেশা, সংস্কার-বিশ্বাসাদি, যূথবদ্ধ জীবনের প্রবহমানতা মিলে মিশে সৃষ্টি করেছে সামাজিক বিচার এবং আচার-আচরণের মানদণ্ডটি, যা কখনও শিথিল, কখনও বর্জন কখনও গ্রহণের মধ্য দিয়ে উন্নততর জীবনযাত্রার পথটি নির্দেশ করে দিয়েছে।

সুপ্রাচীন মহাকাব্যসমূহে তাই প্রকৃতির ব্যবহার এই জীবনধারার সংবেদ হয়ে উঠেছে। মহাকাব্যের আশুপ্রয়োজনে তার প্রয়োগ স্রষ্টার কাছে অবধারিত মনে হয়েছে, কেন না প্রকৃতিই সেই একক অথচ সর্বকর্তৃত্বময় প্রেক্ষাপট যেখানে মানুষ বেঁচে থাকার সংগ্রামের শিক্ষালাভ করতে পারে। য়ুরোপীয় রেনেসাঁর ঠিক মধ্যবর্তী সময়ে প্রকৃতির প্রয়োগ, বিশেষ করে শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে, নতুনতর প্রত্যয়ে রূপান্বিত হ'ল। প্রকৃতি সেখানে শিল্প-সাহিত্যের পটভূমিই কেবল হয়ে রইল না, তার ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হ'ল মানুষের জাগরণের জয়গানে, প্রতিবাদের মুখরতায়। সে ধারা পরে এসে মেলে ইংলণ্ডীয় রোম্যান্টিক যুগের অভ্যুত্থানে—প্রকৃতি সেখানে মানবজীবনের মৌল সত্তা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে, তার রূপ সেখানে 'গ্রেট মাদারের'। তাই শেলী 'ডিজেকশনে' নেপলস্-এর প্রকৃতিদর্শনে সান্ত্বনা খুঁজে পান, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতিতে আত্ম-দর্শন করেন, কীট্স্ তার সৌন্দর্যে আত্মমগ্ন হয়ে পড়েন। সাহিত্যে শিল্পে প্রকৃতির অবস্থানগত তারতম্য ঘটল রুশ শিল্পী-সাহিত্যিকদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায়—পুশকিনের চাকরানীরা জমিদারের বাগানে চেরী ফল তুলতে তুলতে গান গায়, —কেন গায়? জমিদারের নির্দেশে চেরী ফল যাতে তারা খেতে না পারে, সেজন্যে। আমাদের রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি রূপ নিল পরমমহিমামণ্ডিত এক আদর্শবাদের, যেখানে তার ভূমিকা হ'ল সভ্যতার চালিকাশক্তির।

তার এই বাঙ্ময় ভূমিকা আরো ব্যাপ্ত রূপ ধারণ করেছে চলচ্চিত্রে। দৃশ্য ও শ্রাব্য—যুগ্ম এই মাধ্যমের সমাহারে চলচ্চিত্র স্বভাববোধ্য কারণেই জনমানসে প্রভাব ফেলে অতি অল্প আয়াসে। বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্রকারবৃন্দ তাই প্রকৃতির ভূমিকাকে আরো বেশি বাঙময় করে তোলবার তন্নিষ্ঠ প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন। ক্যামেরা আর ট্রলি নিয়ে ছুটেছেন পাহাড় পর্বত গুহাকন্দরে—দুর্গম থেকে দুর্গমতর পথ অক্লেশে অতিক্রম করে শিল্পের সুষমা ও নতুনতর জীবনবোধের সন্ধানে নিয়োজিত রেখেছেন। সঙ্গীত যেমন মানুষের প্রাকৃতিক জীবনবোধ ও দর্শনের ফসল, চলচ্চিত্রও তেমনই মানুষের প্রকৃতি চিন্তার নতুন নতুন দিক্-দর্শনের

ফসল, এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না। চলচ্চিত্র এখন শুধু সাহিত্যনির্ভর থাকছে না—সেও একটা ভাষা খুঁজছে, প্রকৃতি সেখানে দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যম-যুগ্মকের পরিপূর্ণ ব্যবহারে আরো অর্থবহরূপে কখনও প্রতীকী কখনও শরীরী ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হচ্ছে।

বাণিজ্যিক ছবিতে প্রকৃতির ব্যবহার পীড়াদায়ক, এ কথা বলবার অবকাশ রাখে না। ক্লান্তিকর পৌনঃপুনিকতায় তা ক্রমশঃ ক্লিশে হয়ে গেছে : রোম্যান্টিক দৃশ্যে সরোবর জোড়া হাঁস, ফুল-বাগানে ভোমরার উৎপাত অথবা ফুটন্ত ফুলের সারিতে দু'একটা রঙিন প্রজাপতি—রাত বিরেতের এমনতরো দৃশ্যে থালার মত প্লোব লাইটের চাঁদ, হঠাৎ বৃষ্টি নামা নায়ককে একটু এবং নায়িকাকে বেশ বেশি রকমের ভেজানো—মোটামুটিভাবে বিন্যাসটা এরকম। মারপিটের দৃশ্যে পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া আছে, কিংবা নদী-জলপ্রপাতে ঝাঁপ দেওয়াও। বাণিজ্যের পসরাটি যে এভাবে সাজিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তার পিছনে প্রকৃতিবোধ ব্যাপারটা শুধু নয়, সামাজিক হিতসাধনক্ষম অন্য কোনও প্রক্রিয়া তথা উপাদানকেও বিকৃত করা হচ্ছে—এবং এটা যে করা হচ্ছে তা' অত্যন্ত সুচিন্তিত-ভাবেই।

যে ন্যূনতম কয়েকজন বিশ্বমানের চিত্রপরিচালকের চিন্তাভাবনায় প্রকৃতি তার যথার্থ ব্যঞ্জনা পেয়েছে, ঋত্বিক ঘটক তাঁদের অন্যতম। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ছবিটি গ্রামকেন্দ্রিক, প্রকৃতি সেখানে অনন্যরূপে চালচিত্রের কাজ করে গেছে, শুরু থেকে শেষ অবধি সত্যজিতের লক্ষ্য সেখানে প্রকৃতির প্রতীকী ব্যবহারে। এর আগেও 'ছিন্নমূল' ছবিতে নিমাই ঘোষ কিংবা 'দো-বিঘা জমিন' ছবিতে বিমল রায় প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন তার স্বভাবজ স্বতঃ-চারণায়, ফল হয়েছে এই যে তা' হয়ে গেছে গীতিরসলালিত এক প্রেক্ষাভূমি, যেখানে জীর্ণ দারিদ্র কিংবা অসহায় মৃত্যু ক্রোধ সঞ্চার করে না, আবহে সেতারের দ্যোতনা উঁকি দেয়। ঋত্বিক অবশ্যই এখানে ব্যতিক্রম, কেন না তিনি পঞ্চাশ দশকের গণনাট্যের চিন্তার শরিক, সাম্যবাদী রাজনীতির সাংস্কৃতিক সে পরি-মন্ডল সম্পর্কে তাঁর অকপট বিশ্লেষণ : 'আজও মনে করি, আমরা ঠিকই পথ চিনেছিলাম। তীব্রভাবে সামাজিক ক্লেদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন এবং বাস্তবের শ্রদ্ধেয় অংশের প্রতি আকুলভাবে ভালবাসা দেখানো—সর্ব যুগের সর্বশিল্পীর এ হচ্ছে পবিত্র দায়িত্ব।'

চিন্তার এই সুস্থতা ও বাস্তবের সংঘাতকে এড়িয়ে যেতে না চাওয়ার সাহসি-

কতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ঋত্বিকের সমগ্র সৃষ্টির প্যাটার্নটি—প্রকৃতি নিয়ে তাঁর যে গভীর বোধ ও স্বভাবজাত অনুভূতি তাঁর সৃষ্টিকর্মে বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে, সে বিষয়টিও ভাবতে হবে এই পরিপ্রেক্ষিতে। প্রকৃতি তাঁকে মুগ্ধ করেছে, আবেগে উদ্বেলিত করেছে, সময়ে সময়ে তাঁর যুক্তিবোধকেও হার মানিয়েছে। স্পষ্টতঃই অবিভক্ত বাংলার সেই দুর্দান্ত ছেলেটি যখন পরিণত প্রজ্ঞায় ছবি করেছে, তখনও সে ভুলে যায়নি—'আমার দিন কাটিয়াছে পদ্মার ধারে। একটি দুর্দান্ত ছেলের দিন।' নদীর এই প্রবহমানতার মতই প্রকৃতি ঋত্বিকের ছবির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে, যেখান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে তার স্রষ্টার মত শিল্পকর্মটিরও অনিবার্য মৃত্যু কিংবা পচন আমরা লক্ষ্য না করে পারি না। প্রকৃতি তাঁর সৃষ্টিতে রূপান্বিত হয়েছে এমনই এক আবেগমথিত নস্টালজিয়ার ফলশ্রুতিতে। সচেতন রাজনীতিবোধ ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাযুক্ত সব সময় হয়ত যুক্ত হতে পারে নি, কিন্তু ভূমিজ সম্পদ তথা অর্থনৈতিক কারণ বিশ্লেষণে ভারতীয় চিত্র পরিচালকদের মধ্যে তাঁকেই আমরা প্রথম দেখেছি। প্রকৃতি তার ছবিতে তাই শুধু নিসর্গশোভা বৃদ্ধির জন্য নয় কিংবা নয় জীর্ণ গৃহে পলেস্তারার প্রলেপ, সে সেখানে বোধের আসঙ্গনে দৃপ্ত, নিজেই একটি সত্তা—বিমূর্ত অথচ বীক্ষার দীপ্তিতে বাঙ্ময়, প্রতিবাদী। প্রকৃতির প্রতীকী ব্যঞ্জনাও রয়ে গেছে অল্পবিস্তর সব ছবিতেই, কিন্তু এই ব্যঞ্জনা সবসময়ে সুষম থাকেনি। আবেগাপ্লুত হয়ে স্রষ্টার অভিরুচিকে হয়ত প্রতিপন্নও করতে পারেনি সব সময় যেমন তাঁর তথ্যচিত্র 'দুর্বার গতি'।

'নাগরিক' তাঁর প্রথম ছবি। বয়সে সে 'পথের পাঁচালী'র চেয়েও বড়। সেখানে রামু, তার বোন সীতা ও বাবা-মা একটি স্তর এবং রামুর দয়িতা উমা, তার বোন শেফালী ও নেপথ্যে থাকা মা আরেকটি স্তর—দুইয়ের যোগসূত্র হচ্ছে বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র সাগর। নামকরণের মধ্যেই ঋত্বিকের প্রকৃতি চিন্তার গূঢ় রহস্যটি প্রতীয়মান। রাম সীতা উমা শেফালী—সবই প্রাকৃতিক ব্যঞ্জনা বহন করে, কেউ মহাকাব্যের নায়ক, কেউ হলকর্ষণের ফসল, কেউ পাহাড় কন্যা। এটি যদি চিন্তার অপেক্ষা রাখে, দৃশ্যকল্পের সরাসরি অবতারণায় তা' মুছে যায়। বাবার অবসর নেওয়ার পর ভাল বাড়ি ছেড়ে রামুরা বস্তিবাসী হতে যাচ্ছে, অর্থাভাবে ক্লিষ্ট সাধারণ মানুষ বাঁচার সংগ্রামের পথ এভাবেই হারিয়ে ফেলে। রামুর বন্ধু সুশান্ত ছবিটির বিবেক যা লোকগাথাকে স্মরণ করায়, সে বলে, রাজনৈতিক আন্দোলনেই মানুষের দাবি অর্জন করা সম্ভব। প্রকৃত অর্থেই

ছবিটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নিম্নমধ্যবিত্তদের বিশ্বাস্য কাহিনী।

প্রকৃতি এখানে প্রতীকী ভূমিকায়, আবেদন যার সরাসরি। চোখে আঙ্গুল দিয়ে বোঝাতে হয় না, মননের গভীরে যেতে হয় না। শহর কোলকাতার রুগ্ন কিন্তু সুকোমল রুক্ষতা ছবিটির পটভূমি। রামুর ঘরে থাকা সেই ক্যালেন্ডারটি একরাশ হতাশার মাঝে বয়ে আনে ইঙ্গিতময় ভবিষ্যৎ হয় সুন্দর ও সুঠাম। স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালে টাঙ্গানো ক্যালেন্ডারের ছবিতে বিস্তীর্ণ মাঠ ও খোলা আকাশ দেখে রামুর মত আমরাও এক দূষণমুক্ত অনাবিল জীবনের স্বপ্ন দেখতে থাকি। ঐ খোলা মাঠের মধ্যে যে বাড়িটা—তাতে পেঁছুবার রাস্তাটা রামুর মত আমরাও খুঁজে নিতে বদ্ধপরিকর হই। সুশান্তর মত রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে যায় আমাদের। মস্তাজে প্রকৃতিকে রেখে ঋত্বিক তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে এভাবেই পেঁছে যান।

বিজ্ঞানী সাগর তাদের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে আসে। প্রথম মুহূর্তটাই স্মরণীয় হয়ে যায় প্রকৃতির প্রতীকী ব্যবহারে। ভেঙ্গে যাওয়া পাখিটাকে খোলা আকাশে ছেড়ে দেন রামুর অন্ধ বৃদ্ধ পিতা সাগরের সাহায্যে ; জীবনদানের এই প্রতীক সাগরের পরবর্তী কার্যধারায় মূর্ত হয়ে ওঠে, কেন না আমরা দেখি সাগরই ভেঙ্গে যাওয়া এই পরিবারটিকে কিছুকালের জন্য জীবনদান করে যায়। এরই মধ্যে সে ভারতের সাধারণ সম্পদ বইটি রামুর বাবার কাছে ব্যাখ্যা করে এবং বোঝায় প্রাকৃতিক সম্পদে পরম ধনী এই দেশ কেন এত দারিদ্র্যজর্জর। এখানে প্রকৃতি আলোচনার সূত্র ধরে আসে, কিন্তু আমরা অসাম্য ও ধনবৈষম্যের কারণটা খানিক অস্পষ্টভাবে হলেও, জানতে পারি। ছবির শেষে দেখি রামু ক্যালেন্ডারের ছবিটি কেটে সঙ্গে নেয়, যেন তার অনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার শেষে আছে সেই মাঠ যার মাঝখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বাড়িটি—তার স্বপ্নসৌধ। আবেগ দিয়ে প্রকৃতিচিত্রণের সেই দৃশ্যটি আমরা ভুলতে পারি না যেখানে তার মা বর্ণনা করতে থাকেন সুখের দিনগুলি—পরিপ্রেক্ষিতে ফাঁকা উঠোন, চালতা গাছের ছায়া, —হাতে তাঁর চালতা। ঐ মুহূর্তে ঐ ফলটিই যেন সুখের বার্তা নিয়ে আসে অল্পায়াসে।

আবার দীর্ঘ বারো বছর ধরে চিন্তা করছেন যে ছবি নিয়ে, সেই 'অযান্ত্রিক' ছবিতে প্রকৃতির ভূমিকা উদ্দেশ্যসাধনে অন্যতর ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। আপাত-গোঁয়ার একজন মানুষ বিমল তার ভাঙ্গা ঝরঝরে গাড়ি জগদ্দলের অত্যন্ত জটিল ও গভীর সম্পর্ক ছবিটিতে বিধৃত, পরিপার্শ্ব পটভূমি হিসেবে রাঁচি—ঝরিয়ার

কয়লাখনির অঞ্চল কিংবা নেতারহাটের নিসর্গ শোভা। রুক্ষ প্রকৃতি এখানে কখনও ধূসর, কখনও শ্যামলিমায় সিক্ত। প্রকৃতির এই বৈপরীত্যের টানাপোড়েনে অস্থিরচিত্ত বিমল ড্রাইভার ও সেই ভাঙ্গা গাড়িটির মধ্যে প্রেমের অনায়াস সম্পর্ক রচিত হয়ে যায়। উন্মুক্ত খোলা আকাশ মাথায় আর ছোট্ট নদীকে পাশে রেখে বিমল রাস্তার কালভার্টের এককোণে শুয়ে থাকে—তার যাযাবরী জীবনের এই স্বাভাবিকতা ক্রমশঃ আক্রান্ত হবে আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে—যন্ত্র ও গতির এই তীব্রময়তার যুগে বিমলের গাড়ি ও বিমলের নিজের গতির বিপন্নতায় তাদের স্বাধীনতাও আক্রান্ত হবে। ইয়ুং সাহেবের তত্ত্ব এখানে অবশ্যই কাজ করেছে—'ইমপারসোনাল কালেক্টীভ আনকনসাস' কিংবা যূথবন্ধ অসংজ্ঞান তত্ত্ব—এই যে জড় ও মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টায়। শিশুমনের অবচেতনে রূপকথা জন্ম নেয়, তেমনই আদিম সমাজের সামগ্রিক অবচেতনে উদ্ভূত হয় কিছু মৌল সম্পর্ক—টোটেম, উপকথা, আর্কিটাইপ—যা থেকে ঋত্বিক প্রভাবান্বিত হয়েছেন বারবার। আমরা আগেই বলেছি আদিম সমাজের গোটা চিন্তাভাবনাই ছিল প্রাকৃতিক অবস্থা নির্ভর—সে কারণে ইয়ুং সাহেবের মতবাদটি যখন 'অযান্ত্রিকে' আরোপ করা হয়, তখন প্রকৃতিই সেখানে চালকের ভূমিকায় থাকে। তাই যন্ত্রের সাথে মানুষের এই সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে আসলে বোঝানো হয়েছে অচল জড়তার সাথে সচল হৃদয়বৃত্তির সংযুক্তির যা অসামান্য কায়া ধারণ করে অন্তিম বোঝাপড়ার প্রস্তুতিতে মগ্ন হয়ে উন্মুক্ত ধূলোয়িত ভূমিতে, কিংবা দুর্গম অসমান পথে প্রান্তরে। তাই 'অযান্ত্রিকে' ওঁরাও আদিবাসীদের নৃত্যদৃশ্য এসে যায় স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বলতায়, ঋত্বিক স্বয়ং যার ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'বিমল চরিত্রটি আর্কিটাইপাল। বুলাকি পাগলা তার অ্যাবসার্ড এক্সটেনশন, এবং নৃত্যপরায়ণ আদিবাসী ওঁরাওরা তার সাবলাইম এক্সট্রিম। ছবিতে দেখি বিমল মানুষের সঙ্গ নয়, ভালবাসে প্রকৃতির সঙ্গ। গৃহত্যাগিনী মেয়েটি তার বুকে ঝড় তোলে, কিন্তু কামনার হাতছানি দেয় না। আদিম মানবিক চেতনার সঙ্গে সভ্য মানুষের এই যোগসূত্র সংবেদনশীলতায় আমাদের মন কেড়ে নেয়, কেন না এই অপাপ-বিদ্ধতা বিমল রপ্ত করেছে সে প্রকৃতির বলে। ইয়ুং সাহেবের সামাজিক তত্ত্বটি এখানে আঁরো লাগসই হল এই কারণে যে ফ্রয়েডীয় কামনা বাসনার নিক্তিতে বিমলকে চিত্রিত করল না। জড়পদার্থে সজীবত্ব আরোপ গ্রামেগঞ্জে এখনও চলছে। ঋত্বিক ইয়ুঙ্গীয় তত্ত্বের সাথে বাস্তব সত্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে 'অযান্ত্রিক' ছবিটির বিন্যাস করেছেন, ফলে জগদ্দল 'অযান্ত্রিক' হয়ে উঠতে পেরেছে।

লক্ষণীয় এই গূঢ় তত্ত্বটি প্রকাশে প্রকৃতির ভূমিকাই সবচেয়ে বাঙ্ময়, কেন না এক অর্থে প্রকৃতি মানুষের কাছে গূঢ় রহস্যের প্রতীক, কখনও জড় বলেও প্রতিভাত সাধারণ্যে। বৈজ্ঞানিক প্রমাণে সজীবত্ব পেলেও তার জড়তার প্রশ্নে আমরা দ্বিধাহীন নই ফলে প্রকৃতির প্রতি আমাদের নির্মমতার প্রবহমানতায় একটুও ভাটা পড়েনি।

এই সূত্র থেকেই এসে যায় তাঁর তৃতীয় ছবি 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'-র প্রকৃতি বর্ণনার নিগূঢ় অর্থটি। 'প্রাকৃতিক দৃশ্য উপস্থাপনা এখানেও বৈপরীত্যের আভাস দিয়েছে—উপস্থাপনাটি একটি বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় কাজ করে যায়। শুরুতে গ্রাম, বৃদ্ধিতে শহর, সমাপ্তিতে পুনরায় গ্রামে ফিরে আসা—পটভূমির এই ব্যাখ্যা আসলে ত্রিমাত্রিক বিন্যাসই শুধু নয়, ঋত্বিকের উদ্দেশ্যাভিমুখে পৌঁছানোর স্তরও। ছবির শুরুতে দেখি নিটোল একটি গ্রাম, শান্ত—ততোধিক শান্ত সুখী গৃহকোণে পাঠরত ছোট্ট ছেলেটি, বাপের কড়া শাসনে থেকেও সে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে এল ডোরাডোর কাহিনী। সে পুলকিত হয়, রোমাঞ্চিত হয়—দুর্দমনীয় সাহস আর দুর্মর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক কিশোর চরিত্রটি প্রথমেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় প্রাকৃতিক ব্যঞ্জনায়—সে নৌকা বায় অবলীলাক্রমে, গহীন অরণ্যের আস্বাদ যেন তার চোখে মুখে, বিস্ময়াবিষ্ট কৌতূহলী বড় বড় দুটি চোখ মেলে সে তার বর্ণনা দেয়—'চুপ, আদিবাসীরা তীর মেরে দেবে এখনই!' যেন সে সত্যিই এল ডোরাডোর সোনার খনি আবিষ্কারের জন্য রওনা হয়েছে, আদিবাসীদের বিষাক্ত তীরের বাধাও সেখানে তুচ্ছ, যে দুর্দান্ত সাহস, এটি কোন বেহিসেবী খেয়ালে গড়া নয়, নিষ্ঠিতে ওজন করা প্রকৃতির সন্তান এক কিশোর অ্যাডভেঞ্চারের নির্মল ছবি, যে স্বপ্ন দেখে সুন্দর এক পৃথিবীর, নদী-নালা, গহন বন—এসবের পৃথিবীর, উন্মুক্ত পৃথিবীর,—তাতে সে যোদ্ধা একজন, কেন না ঋত্বিকের মত সেও বুঝি বিশ্বাস করে, "জীবন দুঃখ নয়। জীবন বীরত্ব।"

কাঞ্চনের বাড়ি পালানোও কলকাতা দর্শনের নির্মম অভিজ্ঞতা এর পরে বিস্তৃতি পেয়েছে ছবিটিতে। হাওড়ার ব্রীজ, শশব্যস্ত জনতা, বৈদ্যুতিক ট্রাম, কর্কশ আওয়াজে হৃদপিন্ড ছিন্নভিন্ন—ঋত্বিক হঠাৎই আকাশে পাখি দেখিয়ে দেন। কন্ট্রাস্ট্ আমাদের প্রচন্ড ঝাঁকুনি না দিয়ে পারে না। নকল দাড়ির হরিদাস শহর কলকাতার গুপ্ত বিবেক—মেকি শহরের ইতিবৃত্ত শুরু হয়। কলকাতা দর্শনের ইতিবৃত্তে কাঞ্চন অভিজ্ঞতায় ধনী হয়—প্রাকৃতিক দৃশ্যকল্প

শহরের কোণা থেকে কোণা ঋত্বিকের ক্যামেরাবন্দী হয়ে থাকে। অপূর্ব দ্যোতনা দৃশ্যগুলিতে, পার্কের ঠেলাওলা-উদ্বাস্তুর আবার গঙ্গার বুকে জাহাজ দেখে দূরে দেশে পাড়ি দেবার কাণ্ডনের স্বপ্নেতেও। রাজপথে মরে পড়ে থাকে চিল, যেন স্বাধীনতাই রাজপথে শয়ান। সমস্ত কলকাতা নিংড়ে কাঞ্চন হরিদাসের সেই মুখোস নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে এই উপলব্ধিতে, 'বাড়িই সব থেকে ভাল।' ছবিটির স্রষ্টা আমাদের ভাবনায় ফেলে দেন, 'অযান্ত্রিক' ছবিটির মতই, এখানে কিছু অস্পষ্ট কিন্তু কখনও দুর্লক্ষণীয় নয় এরকম একটি প্রতিবাদ। যন্ত্রসভ্যতা আমাদের হৃদয়হীন করেছে, মেকানাইজড্ করেছে। আমরা মাকে না চিনতে পেরে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিই নৃশংস প্রহারে ; স্নেহ যেন লুকিয়ে আছে শস্যশ্যামলা মায়ের গাছে গাছে ফুলে ফলে—নৌকাবিহারে—গহীন বনে। এইখানেই ঋত্বিক নস্টালজিক্ হয়ে পড়েন, মাতৃগর্ভে ফিরে যেতে চান বারংবার। তার অভ্যন্তরে ধরে রাখা সব বেদনা উজাড় করে দিয়ে শহর কলকাতা দুঃখিনী আরেক মার নিসর্গরূপক হিসেবে ছবিটিকে কাজ করে গেছে আর এভাবে সেই আসল ছবিটির সবচেয়ে বড় চরিত্র হয়ে উঠেছে।

ইঙ্গিতময় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবতারণায় আরও অসামান্যতা লাভ করেছে তাঁর 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিটি, নাক-উঁচু সমালোচকেরা যাকে হাই মেলোড্রামা বলে একদা আমল দেন নি। এখানে প্রকৃতি তিনটি অমোঘ রূপে উপস্থিত। একটিতে দৃশ্যকল্পে প্রাকৃতিক ইঙ্গিতময়তা, অপরাধ নামকরণের গূঢ় রহস্যে, শেষেরটি অবশ্যই উপস্থাপনার শৌর্যময় ট্র্যাজেডিতে। 'মেঘে ঢাকা তারা' দেশবিভাগ নিয়ে ঋত্বিকের আজীবন বয়ে বেড়ানো দুর্বিষহ গ্লানি আর যন্ত্রণার মূর্তরূপ, যার পরবর্তী তীব্রতর প্রকাশ ঘটেছে 'সুবর্ণরেখা' ও 'কোমল গান্ধার' ছবি দুটিতে। প্রকৃতপক্ষে, ঋত্বিক এই তিনটি ছবিকে 'মাই ট্রিলজি' আখ্যা দিয়েছিলেন—আখ্যান ও বিষয়বস্তুর মৌল সম্পর্কের কথা ভেবেই।

'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিটির প্রাকৃতিক রূপকল্পের তিনটি পর্যায়ের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। সেই বহু আলোচিত গানের দৃশ্যটার কথাই ধরা যাক্, প্রত্যাখ্যাত প্রেমের যন্ত্রণা, ফ্রেমে যন্ত্রণাক্লিষ্ট স্মৃতিতাড়িত ভাইবোনের মুখ ছিটে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘরে আলো ঢুকেও ঢুকছে না যেন—যেন আকাশ ধরে রেখেছে এক ঝাঁক নক্ষত্রকে। যাদের আলো জ্বলছে নিভছে—রুক্ষ পথে হাঁটছে আরেক জন, তার জুতোর স্ট্র্যাপ যায় ছিঁড়ে—ব্যাকগ্রাউন্ডে উদাত্ত কণ্ঠে দেবব্রত গেয়ে চলেন :

'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে।' এই ইঙ্গিতময়তা আসলে প্রাকৃতিক দৃশ্যকল্প। দেশ বিভাগের যন্ত্রণা ঋত্বিককে আবেগতাড়িত করে রেখেছে এমন এক পর্যায়ে যেখান থেকে বক্তব্য তথা প্রকাশভঙ্গীর তীব্রতায় মেলোড্রামা এসে যাওয়া অস্বাভাবিক নয় এবং নাটকের আঙ্গিকে অভিনয় করিয়ে ঋত্বিক তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শৈল্পিক সুষমায়। স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতি সেখানে ব্যবহৃত কখনও অতিনাটকীয় উপাদান হিসেবে, কখনও বা সুষম দৃশ্য-সংস্থাপনায়—মৌল বিষয়টি থেকে যায় একই—মানুষের তীব্র যন্ত্রণাবোধ ও একরাশ সুখবোধ—দুই-ই আসলে প্রকৃতি প্রভাব সঞ্জাত। প্রকৃতির আদলে এভাবেই মানুষ গড়ে তোলে নিজেকে। সেই নিদারুণ দেশ বিভাগ আসলে প্রকৃতিগত একটি বিভাজনই শুধু নয়, তা তো' আসলে একটা সংস্কৃতি একটা সভ্যতার ধারায় বড় হয়ে ওঠা মানুষের আচার আচরণেও অংগচ্ছেদ করে, ফলে যন্ত্রণাটা বাড়তেই থাকে, এমন এক যন্ত্রণা যা ঋত্বিককে বলতে বাধ্য করে—Never did I reconcile to the event of this partition.

'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' ও 'সুবর্ণরেখা' তিনটি ছবির প্রাকৃতিক ফিলসফিটি সুতরাং রাজনৈতিক বাতাবরণে বিশ্লেষিত হবার উপযুক্ত। কিন্তু 'মেঘে ঢাকা তারা'য় আশ্চর্যজনকভাবে ঋত্বিক উচ্চরব নাটককে বেছে নিয়েছিলেন প্রকাশমাধ্যম হিসেবে—প্রকৃতি সেখানে নামকরণের আদলেও নিজের প্রভাব রেখে যায়। মেঘ আর তারার প্রতীকী ব্যঞ্জনা তো' আছেই—ছবির মুখ্য চরিত্র নীতা শংকরেরাও উপকথার আদলে গড়ে ওঠা পুরাণ-চরিত্রের গাম্ভীর্য পায়। নীতার জন্ম জগদ্ধাত্রী পুজোর দিনে—গিরিরাজ কন্যা উমা এখানে মাইথোপিক প্রক্রিয়ায় নীতাতে রূপান্তরিত, পাহাড়ে যাওয়ার জন্য তাই তার অত ব্যাকুলতা। অশরীরী প্রেম আসলে নীতার মিলনাকাঙ্ক্ষা তার দয়িতের সাথে, শংকর এখানে গিরিরাজের প্রতীক, আর মহাকাল পাহাড় সেই মহাদেব, —পুরাণের উমার ঈপ্সিত স্বামী; এখানে মিলন হয়, নীতার আত্মধ্বংসী চিত্রণেই ফুটে উঠেছে ছবির ট্র্যাজিক পরিমণ্ডলটি, তাই পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, নীতার অন্তিম বাসনাটি—'দাদা, আমি বাঁচতে চাই।' পরিচিত উপকথার বৈপরীত্যটুকু এই অংশে—মিলনে নয়, সম্ভোগ নয়—ত্যাগ আর বাসনাহীনতাতেই নিহিত আছে প্রকৃতির মত নির্লোভ মুক্তি। নীতার আত্মবিশ্বাস সেই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছে।

দেশ বিভাগের যন্ত্রণাবিদ্ধ ক্ষতবিক্ষত মন নিয়ে ভৃগু শিল্পের সাধনায়

ব্রতী হয়েছিল। তার প্রেরণায় ছিল লাবণ্যময়ী এক নারী অনসূয়া। তন্নিষ্ঠ বাস্তবমুখী শিল্পসাধনার এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে 'কোমল গান্ধার' ছবিতে যুক্ত হয় আরেকটি লক্ষ্য—আজকের মানুষের অসহনীয় নৈঃসঙ্গ। যেখানে মুক্তি-দাতা হতে পারে শুধু সংস্কৃতির আবাহন ও নিবিড় প্রেম, যা শুধু শরীরী নয়, অনুভূতির ঘেরাটোপে যা বৃদ্ধি পেতে থাকে প্রতিনিয়ত। এ কারণে সমস্যার গভীরতার সঙ্গে ছবিতে যুক্ত হল এক কাব্যিক অনুষঙ্গ। এই কাব্যিক মেজাজ ছবিতে প্রসারিত করে দিল প্রাকৃতিক দৃশ্যসুষমা। লালগোলায় রাস্তার ধারে ভৃগুর আত্মবীক্ষণে, উন্মুক্ত আকাশের নীচে ভৃগু-অনসূয়ার প্রেমের উন্মেষে কিংবা হঠাৎই নিকষ অন্ধকারাচ্ছন্ন পটভূমি রচনায়, ছেলেদের উচ্ছ্বাস ও পদ্মার কুলুকুলু প্রবহমানতায়। ভৃগু ও অনসূয়ার প্রেম স্বীকৃতি পায় খোয়াইয়ের উষরতাতেও, যেখানে শর বনের ইঙ্গিতময়তা আসলে আসন্ন সমাপ্তির মাত্রা যোগ করে দেয়। এই যে লিরিকধর্মী মেজাজ, প্রকৃতি সেখানে সবচেয়ে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। এক অর্থে 'কোমল গান্ধারে' কোনও গল্প নেই। রেনোয়ার 'রিভার' কিংবা রেনের 'হিরোসিমা মন আমুর' এর সংগে একে বরং তুলনা করা চলে। 'হিরোসিমা মন আমুর' এর বিবেচ্য বিষয় একটি প্রেমের উন্মেষের দ্যোতনায় আরেকটি প্রেমবিকাশ। এ ছবির পটভূমিকাটি যেখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের, 'কোমল গান্ধারে' সেখানে পটভূমি অন্য একটি ক্রাইসিসের—দেশবিভাগ। নিসর্গ দৃশ্যকল্প রচনায় রেনে ও ঋত্বিক যে সমদর্শী হতে পারেন না, তার কারণ ঋত্বিকের আত্মজ তীব্র অনুভূতি, যা তাঁকে ভারসাম্য-হীন করে ফেলে—যেমন 'আকাশভরা সূর্য তারা' গানের প্রয়োগে 'ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি' কলির সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেমে বড় বড় পা দেখানো। আবার অনসূয়া চরিত্রে শকুন্তলার—মনে রাখতে হবে সেও প্রকৃতির সন্তান, শকুন্ত বৃক্ষছায়া তার প্রাণ, মাইথোপিক ডাইমেনশন দেওয়া সম্ভব হয় চকিত হরিণ শিশু ও ভিখারী বালকের সাযুজ্যে। এইখানে ঋত্বিক আবার নস্টালজিক হয়ে পড়েন, যে নস্টালজিয়া অবশ্যই সেই 'দাও ফিরে সে অরণ্য'-র অভিঘাতে মর্মরিত।

তাঁর চিত্রকল্প রচনার দুর্বলতা নিয়ে যাঁরা পঞ্চমুখ, 'কোমল গান্ধার' ছবিটি তাঁদের মুখের ওপর জবাব দিয়েছে। বীরভূমের গ্রামে জ্যোৎস্না আলোকিত রাতে জয়ার উচ্ছল নৃত্য, খোয়াইয়ের ফ্রেমে অনসূয়ার নিষ্পাপ অকম্পিত ছবি ও স্মৃতিচারণা—কাব্যিক চিত্রকল্প রচনায় ঋত্বিকের অসামান্য পারদর্শিতা শিল্প-সৃষ্টির মহত্তম লক্ষণ। আবার 'বিদ্রোহ আজ' গানের দৃশ্যে দেয়ালে সিংহমূর্তির

ক্লোজ-আপ—সিংহ তো প্রাকৃতিক শক্তিরই দ্যোতক—ভাবের এই একাত্ম নিবিড়তায় 'কোমল গান্ধার' পরিপূর্ণ।

'সুবর্ণরেখা'র সংবেদনশীল ট্র্যাজিক পটভূমি রচিত হয়েছে দেশবিভাগের যন্ত্রণাকাতর আবর্তে, আমরা আগেই বলেছি, ঋত্বিকের কাছে শুধু ভৌগোলিক বিভাজন নয়, ছিল মৌল সম্পর্কচ্ছেদের বিয়োগব্যথা। এই ব্যথাবোধ দর্শনের বীক্ষায় রূপান্তরিত হয় সুবর্ণরেখা-য় যেখানে জন্মমৃত্যু পুনর্জন্মের আদিম উপকথাভিত্তিক কৃষিভাবনা সেলুলয়েডে বিধৃত হয়েছে। আদিম কৃষিসমাজ শস্যের আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে নিহিত ছিল জীবনশক্তি—জন্মমৃত্যু পুনর্জন্মের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানুষও এগিয়ে চলেছে নতুন অর্থাভিমুখে, যেখানে শক্তি ও প্রেম হাত ধরে পাশাপাশি চলে—নবজাতক অভ্যর্থনা পায়। রবীন্দ্র-দর্শন ঋত্বিকের অনুভাবনায় গেঁথেছিল মর্মে মর্মে। 'শিশুতীর্থ' কবিতার সেই ঈপ্সিত লক্ষ্যে সুতরাং ঋত্বিকের যাত্রাও শুরু হল। কৃষিভাবনা ও নবজীবনের আর্তি—এই দুইয়ে মিলে ছবিটির প্রাকৃতিক পটভূমি সৃষ্টি করে। 'সুবর্ণ-রেখা' তাই সুন্দর জীবনের হাতছানি নয়, সুন্দর চিত্রকল্পও নয়—শস্যফলনের সেই জল,—আর জল তো জীবনেরই আরেক নাম। নবজীবন বস্তি থেকে সুবর্ণরেখার তীরে বাসা বাঁধার স্বপ্ন পর্যন্ত ছবিটি প্রাকৃতিক এই আন্ত-ধারায় বেড়ে উঠেছে। স্থায়ী বাসা আমরা অধিকাংশই পাই নি—'আঁকাবাঁকা নদী, আর দূরে নীল পাহাড়, সেইখানে বাগানে প্রজাপতিরা ঘোরে আর গান গায়'—বিনু নবজীবনের, নবযুগের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় এইভাবে। তার কাছে পেঁছুতে হয় গাছের নীচ দিয়ে, ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে। তাই ছবির থীম এত অর্থবহ হয়ে ওঠে 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়…।'

সুবর্ণরেখা নদী, তিতাসও নদী, একটি এ বাংলার আরেকটি ঐ বাংলার। কিন্তু প্রথমটি যদি নবজীবন আর পটপরিবর্তনের ইঙ্গিত বয়ে আনে, দ্বিতীয়টি নিঃসন্দেহে বয়ে আনে একটি গোষ্ঠীর বিকাশের বার্তা—তিতাসের মালোগোষ্ঠী, রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা' ছবিটিতে গঙ্গার বুকে ভাসমান একদল গোষ্ঠীবন্ধ মাছ-মারা মানুষের কাহিনী যা একাধারে বিশ্বাস্য ও শিল্পনিষ্ঠ, কিন্তু তা কখনই অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করে না,—আমরা ফিলসফির কথা বলছি; ঋত্বিক সেক্ষেত্রে তীব্র ব্যতিক্রম। 'তিতাস একটি নদীর নাম' ঐ বাংলায় গিয়ে (হায়, নদীর ওপরটা হঠাৎই 'অন্তর্দেশ' হইয়া যায়।) ছবি তুলে ঋত্বিক তাঁর বড় সাধের জন্মভূমির প্রতি ঋণশোধের চেষ্টা করেছিলেন—যদিও সে ঋণ কখনই শোধ

হবার নয়। এই ছবিটিতে তিতাসই নিয়ন্ত্রক। কখনও প্রাণদাত্রী জননী, কখনও উদাসিনী স্রোতস্বিনী। একদিকে প্রাণ, অপরদিকে মৃত্যু। তিতাসের জীবনশক্তি মালো সমাজের উৎপাদিকাশক্তির দ্বৈত-আরোপণ, সে যখন ভিন্ন-স্রোতবাহিনী, তার তলদেশ তখন পলিমাটির উর্বরতায় আপ্লুত—উর্বরা জন্মভূমি। তিতাসের অববাহিকায় মালো সমাজ আত্মবিনাশের পথে যায়, কেন না তার উৎপাদিকাশক্তি আদিমগোষ্ঠীর প্রবণতাজাত, সে মাছধরা বৈ কিছু জানে না, কিছু বোঝে না। একটি জাতের বাঁচার জন্য তাই প্রাকৃতিক সম্পদ সব নয়, মনোবল ও শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার প্রয়োজন। একক পেশা-ভিত্তিক আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন তাই বিনাশের পথে।

স্নিগ্ধ দৃশ্যকল্পও প্রাকৃতিক বার্তা বয়ে আনে। সেই বিবাহরাত্রিতে কিশোর আর অনন্তর মা-র আচরণ শরীরী কায়া না নিয়ে তিতাসের বুকে নৌকা-দৌড়ের দৃশ্যবাহিত হয়ে আসে। প্রথম রাতের আবেগ-মথিত উপস্থাপনায় তিতাসের জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ আরোপে আমরা বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ কুশলতার তারিফ না করে পারি না। তিতাসে ঋত্বিক নবীন আশাবাদী—বাসন্তী সমস্ত প্রলোভনে অনড় থেকে নির্জলা মৃত্যুকে বরণ করতে দ্বিধা করে না, 'সুবর্ণরেখা'র ঈশ্বরের মত সে মিথ্যা বলে না, কিংবা 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতার মত সান্ত্বনাহীন অসহায় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে না। ঋত্বিকের নিজের ভাষায় : 'তিতাস একটি নদী, যে নদী হচ্ছে Sustaining force, সেই নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, তারপরে সে নদী একদিন শুকিয়ে গেল।' মালোসমাজের যে বিনাশ ছবিটিতে বিধৃত, তা শুধু প্রাকৃতিক কারণে নয়, কারণ ঋত্বিক হার্ডিসাহেব কিংবা সিঞ্জসাহেবের মত প্রকৃতিকে ভাগ্যনিয়ন্তা বলে স্বীকার করেন নি। ব্যাখ্যাটা ছবিতেই পরিস্ফুট। প্রাকৃতিক কারণের সঙ্গে যোগ হয় অর্থনৈতিক চোরাগোপ্তা আরেক কারণ। বুর্জোয়া সমাজে এ ধরনের আদিম বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী তাদের সত্তা বজায় রাখতে পারে না। 'হাঁসুলিবাকের উপকথা'-র কাহাররাও পারে নি। পেরেছিল দেরসু-কুরোসাওয়ার অনবদ্য সৃষ্টি। গোষ্ঠীবিচ্ছিন্ন আদিমপ্রতিভু দেরসু শহরকে পছন্দ করে উঠতে পারে নি, ফিরে গিয়েছিল তার গহীন অরণ্যজীবনে। কিন্তু এই ব্যগ্রতা তার ব্যক্তিগত অনুভূতি-সঞ্জাত নয়, বরং সেখানে কাজ করে সমষ্টিগত গোষ্ঠীচেতনা যা ইয়ুং-য়ের তত্ত্বে সুপরিস্ফুট। 'জেব্রিস্কি পয়েন্টে' আন্তোনওনি ঊর্ধ্বাকাশে বিমান, দিগন্তব্যাপী ও সমান প্রাকৃতিক পটভূমিতে দুই কিশোর কিশোরীর মিলন দেখান, অনতি-

দূরেই থেকে যায় জেরিমিক পয়েন্ট—রাজনৈতিক অভিঘাত ক্রমশঃ বিলীন হয়। জীবনমৃত্যুর সীমানা ঐ পয়েন্টকে ঘিরে আবর্তিত হয়—যেমনটি ঋত্বিক করেন সমষ্টিগত পরিপ্রেক্ষিতে—'যুক্তি তক্কো গপ্পো'র সেই বনাঞ্চল শুধু বিপ্লবীদের আশ্রয়ই দেয় নি, তারা সঙ্গী হয়ে থাকতে চেয়েছে সেই বিপ্লবী সত্তার। তাদের পরাজয় কিংবা নীলমণির মৃত্যুতে তাই সে মূক দাঁড়িয়ে থাকে চিত্রার্পিতের মত বনাঞ্চলের ঐ বৃক্ষচ্ছায়ায় নচিকেতা-বঙ্গবালার শরীরী মিলনের সংকেত এখানে নিশ্চিতভাবে নবজীবনের আকাঙ্ক্ষাকে বয়ে আনে। চিত্রার্পিত শোকবিহ্বল প্রকৃতি তখন মাতৃত্বের শ্যামলিমায় মহত্ত্ব পেয়ে যায়। 'দেরসু উজ্জালা'-য় কুরোসাওয়ার আঁকা শেষ দৃশ্যটি অবশ্য মহত্তর ব্যঞ্জনা আনে—কেন না সেখানে রং বাড়তি সুবিধা দেয়, মৃত দেরসুকে ঘিরে আমাদের শূন্যতাবোধ গভীরতর হয় নি নিসর্গের চিত্রার্পিতায়। সেখানে সে মাতৃত্বের আর্কিটাইপে নয়, বহির্জগতের সঙ্গে আদিম এই প্রতিনিধির সংবেদশ্রুতি হয়ে দাঁড়ায়। ঋত্বিকের জয় যদি দর্শন আর আবেগের ফলশ্রুতিতে, কুরোসাওয়ার জয় দৃশ্যকল্পনির্বাচন ও উপস্থাপনায়।

একজন ক্ষয়ে যাওয়া পচে যাওয়া বুদ্ধিজীবী নীলকণ্ঠ ছবিটিতে মধ্যবিত্ত অন্তঃসারশূন্যতার প্রতিনিধি। দাম্পত্যবিরোধ থেকে তার পদযাত্রার শুরু, ভীড় করে আসে নচিকেতা, বঙ্গবালা, জগন্নাথ-পঞ্চাননেরা। নামের প্রতীকী ব্যবহার এখানেও প্রকৃতির সঙ্গে ঋত্বিকের নাড়ির টান বুঝিয়ে দেয়। শরীরী আবেদন নিয়ে বাংলা হাজির হয় তার রূপসম্ভার নিয়ে, উচ্ছল যৌবনের প্রতীক হয়ে গান ভেসে আসে 'আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশী।' রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার আর্তি মুহূর্তে জনপ্রিয়তা পায় সেলুলয়েডে, নদী-পাহাড়-ঝর্ণায় বাংলার প্রকৃতি কোনও ছবিতে এমনভাবে ফুটে ওঠে নি। আবার পটপরিবর্তন। পুরুলিয়ার রুক্ষ প্রান্তর, ছৌ নৃত্যশিল্পী, মুখোসশিল্পী—এঁরা প্রকৃতির বুকে বড় হন, সে অর্থে প্রকৃতির সন্তান—দুর্গার মুখোসে বঙ্গবালা ভেসে আসে। দেবব্রত গান ধরেন 'কেন চেয়ে আছ গো মা'। আমরা রোমান্টিক হই, নীলকন্ঠের অনুভূতি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। গ্রামের নবীন পটভূমিতে নয়, পুরুলিয়ার স্বভাবজ রুক্ষতার পটভূমি এ কারণেই যেন স্থানান্তরিত। দেশবিভাগ, অর্থনৈতিক অসাম্য, সাম্যের লড়াই, প্রেম, গার্হস্থ্যজীবন—সব যুক্তি তক্কোতে আর আবদ্ধ থাকতে পারে না। গপ্পো হয়ে যায়। সেই গপ্পো যা আমাদের ভাবীকালের সঞ্চয়। সেই বিচ্যুতি শিল্পের স্বীকৃত সত্য নয় যা বিষয়ান্তরে নিয়ে যায়, 'যুক্তি তক্কে' সেই বিচ্যুতি নেই, সে উদ্ধত সমালোচকেরা যে যাই বলুন।

এতক্ষণের এ আলোচনায় আমরা একটি বিষয়ে দ্বিধাহীন হতে পারি— ঋত্বিকের চিন্তার অন্তর্মুখী ধারা, প্রকৃতি বিন্যাসে অনেক সময়েই তা অবজেকটিভ কায়া নিয়েছে, ফ্রেমে দৃশ্যকল্প উপস্থাপনার জন্য নয়, আসলে মহৎ শিল্পের শর্তই বোধহয় এটি—এই যে অনুভূতির গভীরতায় বহির্মুখী জগতকে দৃশ্যমান করা, বিশ্লেষণ করা, বাস্তবতা শুধু নয়, বাস্তবের সংঘাতকে যাথার্থ দেওয়া। ঋত্বিকের শিল্পসৃষ্টিতে অন্তর্মুখীনতা ও বহির্গামীতা একে অপরের পরিপূরক হতে পেরেছে বলে তা মহৎ শিল্পের মধ্যেও মহত্তর হবার দাবি রেখে গেছে।

প্রকৃতির উপস্থাপনায় ঋত্বিকের যে বোধ কাজ করে, তার তুলনা চলচ্চিত্রে খুব বেশি নেই, কেন না, আমরা দেখেছি তাঁর ছবিতে প্রকৃতি এতটাই ইনভলভ্ড যে আসলে সেই ছবির মুখ্য চরিত্র হয়ে দাঁড়ায়। এমন কি সাংগীতিক প্রয়োগে, প্রকৃতির শব্দনিয়োজনে ঋত্বিকের ছবি যতটা ধনী, তেমন বোধকরি ভারতীয় চলচ্চিত্রে তো বটেই বিশ্ব-চলচ্চিত্রের অংগনেও অপ্রতুল। অনির্বচনীয় দৃশ্যে কিংবা চিত্রকল্পে আন্তোনিওনি-ত্রুফো-ডেভিডলীনেরা চলচ্চিত্রে ভাষা খোঁজেন, ছবির থীমগত হয়ে তা অবশ্যই গুণফল বাড়ায়, কিন্তু কখনই তা চরিত্র হয়ে ওঠে নি এমনটি করে। সত্যজিতের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' কিংবা 'অরণ্যের দিনরাত্রি' প্রকৃতির খোলা হাওয়ায় আসলে নারীপুরুষ তথা পারিবারিক সম্পর্কের নতুনতর বিন্যাস খোঁজে। প্রকৃতি সেখানে তার উদাত্ত গাম্ভীর্যে শিক্ষকের ভূমিকায়, যেমনটি ঘটে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-য়, শাহরিক কোলুষ বিরাট ঐ তুষারস্নিগ্ধ পর্বত ছায়ায় উত্তরিত হয় স্বাভাবিকতায়। 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-তে তা অনেকটাই ফ্রয়েডীয়। যৌনচেতনার আভাস রেখে যায় সাঁওতালী যুবতীর যৌবন সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষায় কিংবা পরবাসী পরস্ত্রীর প্রতি কামনার অভিলাষে। 'অশনি সংকেত' হতে পারত প্রকৃতিব্যঞ্জনার অন্যতর মাধ্যম, কিন্তু স্রষ্টার বিশ্বাস ও অভিধা অন্যত্র বলে এখানে রুক্ষ আকালেও কলাপাতার সবুজে মনোহারিত্বে ফড়িং-য়েরা বসে, আবহে বেজে চলে জলতরঙ্গের মত স্নিগ্ধ ধ্বনি। বাস্তবসংঘাত এভাবেই এড়িয়ে যাওয়া হল, যেমনটি 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে আবহে পাখির ডাক শুনে সিদ্ধার্থ-র নস্টালজিয়া জেগে ওঠে, বাস্তব সংঘাত থেকে সে পালিয়ে যেতে চায়। নেপথ্যে 'রাম রাম' শব্দ নিয়ে ফ্রেমে শবযাত্রা এসে যায়।

মৃণাল সেন 'ভুবন সোমে' যে প্রাকৃতিক ব্যঞ্জনা এনেছেন, তাতে রোমান্টিকতা প্রাধান্য পেয়েছে। অ্যান্টি-রোমান্টিক কড়া সোমসাহেব ও গ্রাম্য সুন্দরী ললনা-র

অসম প্রেম প্রকৃতির স্নিগ্ধ ছায়ায় বেড়ে উঠেছে। মেয়েটি প্রকৃতির স্নেহচ্ছায়ায় মানুষ, তার প্রভাবে সোমের আপাতগাম্ভীর্যের নির্মোক যায় খসে, আসল মানুষটি বেরিয়ে পড়ে, যেমনটি এসেছিল যন্ত্রণার তীব্রতায় অন্য প্রেক্ষিতে কীং লীয়রের। স্নেহপ্রত্যাখ্যাত হৃতসর্বস্ব পিতা ও রাজার মানুষী অভিষেক ঘটে বিশাল প্রান্তরে —সে বোঝে এই বিরাট প্রাকৃতিক ক্ষমতার কাছে, নিশিরাতে এখন ঝড়-জলে সে বিধ্বস্ত, আসলে সব মানুষই সমান—অসাধারণ দাম্ভিক রাজার নির্মোক টুটে যায়, সাধারণ মানুষটি ঐ প্রকৃতির অঙ্গনে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে। অথচ 'মৃগয়া' ছবিটিতে প্রকৃতিকে মৃণাল সেন শুধুই প্রেক্ষাপট করে রাখেন, চরিত্র করে উঠতে পারেন না, আর্থ-সামাজিক যে প্রক্রিয়ায় গোষ্ঠীসমাজ নিষ্পেষিত হচ্ছে সে কারণে তাও থেকে যায় উহ্য। প্রকাশ ঝা বরং 'দামুল' ছবিতে প্রকৃতিকে সে-অর্থে একটি চরিত্র করে উঠতে পেরেছেন, অর্থনৈতিক সাম্যের কারণ সন্ধানে পরিচালক প্রাকৃতিক সম্পদের অসম-বন্টনের প্রশ্নে চলে যেতে পেরেছেন।

ঋত্বিক অনেকটাই শেক্সপীয়রীয় প্রকৃতি চিন্তার শরিক—কিন্তু তাঁর চেতনায় থেকে যায় রবীন্দ্রনাথের আইডিয়ালাইজেশন, ইয়ুংয়ের তত্ত্ব এবং মার্কসবাদী সংজ্ঞান। বিশ্বজনীনতার এতবড় আবর্তেও তিনি যে ভীষণভাবে বাঙ্গালী থেকে যেতে পারেন, তার মূলে কাজ করে তাঁর প্রকৃতি-চিন্তা। এপার বাংলা ওপার বাংলা তাঁর ছবিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে বলে সত্যজিৎ যথার্থই বলেছেন ঋত্বিক মনে প্রাণে ছিলেন বাঙালী, এমন কি তাঁর থেকেও। বাংলার প্রকৃতি বৈচিত্র্যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও আদিম উপকথার সমান্তরাল ব্যাখ্যায় তার ছবি ধনী হয়ে উঠেছে। সময়কালও সেখানে অর্থবাহী চেতনার সমন্বয় ঘটায়, কাহিনীর সাথে প্রয়োগের। যেমন 'সুবর্ণরেখা'-য় হরবিলাসের রাত্রিকালীন প্রায় ভৌতিক উপস্থিতি। ঈশ্বর তখন ছাতিমপুরের কারখানায় ম্যানেজার, তাঁর নিশি যাপন হয় নেশার হাতছানিতে, আদর্শভ্রষ্টতায়। প্রেতের মত গরাদের ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হরবিলাস তীক্ষ্ণ প্রশ্নটি করে ওঠেন, 'রাত কত হল ?' কিংবা 'পলাইয়া বাঁচা যায় না'—রাত্রির মুখোমুখি এই বীক্ষা আমাদের সচকিত না করে পারে না, যেমনটি ঘটে শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেটে'। রাজার প্রেত সেখানে রাত্রি ও প্রভাতের সময়ান্তরে উপস্থিত হয় নাট্য অভিঘাতের প্রয়োজনে। তাঁর প্রথম আবির্ভাব ও বিদায় প্রভাতের রক্তিমাভায়, সূর্য সেখানে দ্যোতনা বয়ে আনে ; কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় বিদায় নিশিরাতে,—কেন না তখন জোনাকিরা জ্বলে নেভে।

দেশবিভাগের যন্ত্রণাবিদ্ধ একজন মানুষ পরম আন্তরিকতায় ও আকুল মমতার আর্তিতে তাঁর পরমারাধ্য দেশমাতৃকাকে গড়ে তুলেছেন 'গ্রেট মাদার' আর্কিটাইপের অনুষঙ্গে,—তার রূপ সেখানে কল্যাণময়ী সোফিয়া-র। এক মথিত আবেগ এই চিত্রায়ণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছে। সে আবেগ দেশ-প্রেমের, মানবপ্রেমের এবং সে কারণে বিশ্বপ্রেমের। এক নিবিড় প্রকৃতিপ্রেম এক বুক আবেগ এবং সনিষ্ঠ মননের আশ্রয়ে নিশ্চিত অবয়ব পরিগ্রহ করে তাঁর ছবিতে। সে অবয়ব ফিলসফি-র প্রকৃতিকে ঘিরে যা শেক্সপীয়রের ছিল, ওয়ার্ডস্বার্থের ছিল, ছিল রবীন্দ্রনাথের। বোধকরি চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে ঋত্বিক এখানেই ব্যতিক্রমী স্বাতন্ত্র্যের দাবি রেখে যান। তাই 'মেঘ ঢাকা তারা'য় নীতা অন্তিমলগ্নে পাহাড়ে ছুটে গেলে আবহে বিজয়া সঙ্গীত ধ্বনিত হয়, 'আয় লো উমা কোলে লই'। 'নাগরিক'-এর রামু ক্যালেন্ডারের সেই বাড়িটিকে তার স্বপ্ন সৌধ হিসেবে ভেবেছিল, আমরা আসলে প্রত্যেকেই তাই ভাবি, চাই,—ঐ যে বিস্তীর্ণ সবুজের মাঝে একটি বাড়ি, যার চারপাশে মুক্ত বায়ু খেলা করে, ওপরে উদাত্ত নীল আকাশ, সেখানে পাখি। পলায়নী নস্টালজিয়ায় নয়, ঋত্বিকের সেই মৌল সিদ্ধান্তে উজ্জীবিত হতে হবে আমাদের, 'জীবন দুঃখ নয়, জীবন বীরত্ব।'

চ্যাপলিন : সঙ্গীতে ও ভঙ্গীতে

শিল্পমাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্র যতই পরিণত হচ্ছে, প্রয়োগের বিভিন্ন দিকগুলিও তত উৎকর্ষ ও পরিমিতি লাভ করছে। আর এভাবেই চলচ্চিত্রের নিজস্ব একটি অবয়ব তথা ভাষা গড়ে উঠেছে। সেই কবে, মুরারি ভাদুড়িকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখেছিলেন, ছায়াচিত্রের প্রধান জিনিসটা হচ্ছে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ। এই চলমান রূপের সৌন্দর্য বা মহিমা এমন করে পরিস্ফুট করা উচিত যা কোনো বাক্যের সাহায্য ব্যতীত আপনাকে সম্পূর্ণ সার্থক করতে পারে। তার নিজের ভাষার মাথার উপরে আর একটা ভাষা কেবলি চোখে আঙুল দিয়ে মানে বুঝিয়ে দেয় তবে সেটাতে তার পঙ্গুতা প্রকাশ পায়। সুরে চলমান ধারায় সংগীত যেমন বিনা বাক্যে আপন মাহাত্ম্য লাভ করতে পারে, তেমনি রূপের চলৎপ্রবাহ কেন একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টিরূপে

উন্মেষিত হবে না? হয় না যে সে কেবল সৃষ্টিকর্তার অভাবে—এবং অলসচিত্ত জনসাধারণের মূঢ়তায়, তারা আনন্দ পাবার অধিকারী নয় বলেই চমক পাবার নেশায় ডোবে।' (২৬শে নভেম্বর, ১৯২৯)

রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত সেই নিজস্ব ভাষা, সুখের কথা, চলচ্চিত্র ক্রমশঃ আয়ত্ত করে নিচ্ছে। সন্দেহ নেই, সঙ্গীত চলচ্চিত্রের বিভিন্নমুখী উপাদান-গুলির মধ্যে অন্যতম। অন্যতমই শুধু নয়, অর্থবহ প্রয়োগের মাধ্যম হিসেবে যথেষ্ট ধনবান ও আকর্ষণীয়। মাধ্যম হিসেবে সঙ্গীত জনমানসে খুব বেশী রকমের প্রভাবশালী, একথা যেমন সত্য, তেমনি একথাও সত্য যে এর ফলেই অপরিমিত ব্যবহারে চলচ্চিত্র ও নাটক-অপেরাদির ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়ে গেছে। কখনো খুব বেশি কখনো এত কম যে রেখাপাতই করতে চায় না। সেই শুরুর কালে চলচ্চিত্র যখন লেখনির্ভর ছিল, সমস্যা এত গভীর ছিল না। শব্দ সংযোজন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে সঙ্গীতে প্রয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা বাড়তে থাকে, এ বিষয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

নির্বাক ছবিতে বিভিন্ন সিচুয়েশন বোঝানোর জন্য যে সমস্ত উপাদান ব্যবহৃত হত, ব্রড্ জেশ্চার কমেডি তার মধ্যে প্রধানতম। আমরা জানি, এ জাতীয় কমেডি যার প্রদর্শনকাল অল্পকাল স্থায়ী, খুব বেশি হলে তখন তা হাজার ফুট অবধি গড়াতো, আসলে মোটা দাগের কমেডি, শারীরিক কসরত ও অঙ্গভঙ্গী মারফৎ লোক মজানো। অভিনেতার স্থূল বা খর্বকায় চেহারা, কিম্ভূত কান্ডকারখানা, দু'একটি গ্যাগ্—পরে এই জাতীয় ছবিগুলিই ফিজিক্যাল কমেডি হিসেবে চলচ্চিত্রে সংগঠিত রূপ নিয়েছে। মেরি পিকফোর্ড, ডগলাস ফেয়ারব্যাংকসরা দুর্দমনীয় অভিযান নিয়ে ছবি করেছেন, সাফল্যও এক অর্থে পেয়েছেন, সেটা ব্যক্তিগত সৌন্দর্য কিংবা বাহাদুরির জন্য—কিন্তু কেউই সঙ্গীতকে সংগঠিত রূপ দিয়ে চলচ্চিত্রে তার মর্যাদামন্ডিত প্রয়োগে উৎসাহ প্রকাশ করেন নি, তার মূল কারণ, আমরা আগেই বলেছি, শব্দ সংযোজন শুরু হয়েছে ১৯২৯-৩০ সাল থেকে। ফলে এর আগেকার যে সমস্ত ছবি আমরা দেখি তার অধিকাংশই পরবর্তীকালে সঙ্গীতপ্রযুক্ত হয়ে প্রদর্শিত হয়ে আসছে। আমেরিকায় তখন লিওনার্ড রোজের মত চেলোবাদক, ইউজেন ইস্টামিনের মত পিয়ানোবাদক কিংবা আইজাক স্টার্নের মত বেহালাবাদক ছিলেন না বা ছিলেন না স্টার্ন রোজ ইস্টামিনের মত প্রতিভাবান কোয়ার্টেট।

কিন্তু সঙ্গীতের বাতাবরণ সব দেশে সব কালেই থাকে—এসব ছবিগুলির আবহ ছিল সাদামাটা এবং সমস্ত বিষয়টা যেভাবে ভাবা হত, তেমনই স্থূল বলা যেতে পারে, প্রথানুগ সঙ্গীতের যে ব্যবসায়িক প্রয়োগ, তা সে সময় থেকেই সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। কেউ হাত-পা ছুঁড়লেন, আবহে হয়ত দ্রুত কিছু আর. পি. জি. ও বেজে গেল, কেউ হয়ত ছুটছেন হাস্যকরভাবে, আবহে বেজে চলল ক্রোমাটিক স্কেলিংয়ের কোনো বাজনা। বিষাদকরুণ দৃশ্যে 'পশ্চাতে' আবহের সেই ভায়োলিন বাজানোর রীতিও বোধকরি তখন থেকে, আজও বাংলা তথা ভারতীয় সাবেক নাটক ছায়াছবি সে প্রথা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি।

কমেডি চলচ্চিত্রের যে জয়যাত্রা তা' ঈপ্সিত লক্ষ্যে পেঁছুতে পেরেছিল ১৯১০ থেকে ১৯৩১ সালের দীর্ঘ একুশ বছরের নিরঙ্কুশ আধিপত্যে। ম্যাক সেনেট, হ্যাল বেশ ও লিও ম্যাককেরি এই জয়যাত্রা নির্মাণের প্রধান স্থপতি ছিলেন। শেষের দু'জন একত্রে তৈরি করেছিলেন লরেল-হার্ডির টু-রীলার ছবিগুলো, ম্যাক সেনেট বিখ্যাত হয়ে আছেন চার্লি চ্যাপলিনকে ছবিতে নামার প্রথম সুযোগ করে দিয়ে। সমসাময়িক কমেডি ধারার প্রতি চ্যাপলিনের বীতরাগ ছিল এমন নয়, বরং হ্যারল্ড লয়েড—লোনসাম লিউকের চরিত্রে যিনি অন্তর্মুখী কমেডি অভিনয় করতেন, বাস্টার কীটন, হ্যারি লিংডেন কিংবা ফোড স্টোলিং—এসব মোটামুটি খ্যাতিমান কমিক অভিনেতার সংমিশ্রণে তিনি নিজেকে তৈরি করেছিলেন, একথা বলা অসংগত নয়,—চ্যাপলিন তাঁর চরিত্রচিত্রায়ণে যে নিজস্বতা আরোপ করেছিলেন, সেটা অবশ্যই তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গি তথা চলমান জীবনের প্রতি সহানুভূতিশীল এক ব্যঙ্গাত্মক আচ্ছাদন রেখে। সঙ্গীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে এ কারণে যে ব্রড জেশ্চার কমেডির সাফল্য নির্ভর করত মূলে কমিক অভিনেতার হাস্যরসের উপাদান বা গ্যাগস্, অ্যাক্রোবেটিকস্ এবং নাচের ওপর। সে কারণে এমন একটা ধারণা হওয়া অসংগত নয়, উল্লেখিত তিনটি মনোরঞ্জনিক উপাদান অনেকটাই নির্ভরশীল সুসংহত আবহসংগীতের ওপর। হিউমার এলিমেন্ট মানুষের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাববিস্তারে সক্ষম, যদিও প্রথাগত একটা ধারণা আছে, মানুষের দুঃখের ভাবনাই সবচেয়ে সুখের গান। বিষাদ করুণ দৃশ্যের আপাত আবিলতা পরে আমরা বিস্মৃত হতে চাই, কিন্তু যা মনে রাখতে চাই তা' হল মিলনের সুখ স্মৃতি। তাই ছবিতে প্রিয়

নায়ককে বিরহে দেখতে ভালবাসি তাৎক্ষণিকভাবে,—কখনই চাই না নায়িকার সংগে তার বিচ্ছেদে ছবি শেষ হোক। সংগোপনের এই বাসনা আসলে ট্রাজেডির ওপর কমেডির জয় ঘোষণাই করে। বাস্তবিক, আমাদের জীবনে কি আমরা সুখস্মৃতিই আহরণ করতে চাই না? কমেডির এই গভীরতা স্টেলিং, কেন টারপিনেরা ছবির মাধ্যমে আদৌ আনতে পারেন নি, চানও নি সম্ভবত— সে গভীরতা তাঁদের ছিল না। এই 'হিউমার' এলিমেন্টের যথার্থ প্রকাশে সংগীতের একটা ভূমিকা আছে, যা থেকে সঞ্চারিত হয়েছে প্রথানুগ আবহ-সংগীতের কাঠামো, যা একাধারে পুনর্ব্যবহৃত, একঘেয়ে এবং এক অর্থে খানিকটা বিরক্তিকর, কেন না ছবির গতিকে তা' অনেক সময়েই ব্যাহত করেছে।

এইরকম একটা পরিপ্রেক্ষিতে এলেন চার্লি চ্যাপলিন এবং কমেডি সম্বন্ধে যেমন, সংগীতের প্রয়োগ সম্বন্ধেও তেমনি আমাদের যাবতীয় অর্থোডক্স ধারণা পাল্টে দিলেন। যে বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়ে চ্যাপলিন চলচ্চিত্রজগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা' এই মাধ্যমটির প্রায় সব বিভাগেই নতুনত্বের হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল। অসাধারণত্বের ছোঁয়ায় চলচ্চিত্র শুধু কাহিনীবিন্যাস বা নির্মাণগত পারিপাট্যই লাভ করল না, সংগীত তার নিজস্ব ভূমিকাটিও যথার্থভাবে খুঁজে পেতে শুরু করল তাঁর ছবি থেকেই। কাহিনী, চিত্রনাট্য উপস্থাপনা, অভিনয় এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে চ্যাপলিন অবশ্যই উজ্জ্বলতর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু সবাক যুগেও নির্বাক ছবি করবার যে সাহস পরোক্ষে তাঁকে জুগিয়েছিল, তা অবশ্যই সংগীত এবং এর প্রয়োগ কুশলতা সম্পর্কে তাঁর নিজের ওপর অগাধ আস্থা। গোটা চলচ্চিত্রভাবনার মধ্যে তিনি সংগীত প্রয়োগের বিষয়টিও মাথায় রাখতেন, ফলে সংগীত তাঁর ছবির আবশ্যকীয় উপাদান শুধু নয়, আন্তর্সমতা রক্ষার ক্ষেত্রেও কাজ করে গেছে নিরন্তর।

চ্যাপলিনের সমসাময়িক ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য আমরা আলোচনা করেছি, স্থূল ব্যাগপাইপার মিউজিকের প্রাধান্য ও চিন্তাহীন ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ তখন সৃষ্টিশীল সংগীতাবহ অন্তত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে, রচনার পক্ষে আদৌ সহানুভূতি প্রদর্শন করে নি। চ্যাপলিন যখন ম্যাক সেনেটের হয়ে ছবি পরিচালনা করতে শুরু করেছিলেন বিষয় নির্বাচন তথা প্রয়োগলাবণ্যে তখন থেকেই তাঁর সংগীতবিষয়ক দৃষ্টিকোণ স্বচ্ছতর রূপ ধারণ করতে থাকে। বিষয়বস্তু তো বটেই, ছবিগুলির নামকরণ থেকেও এ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে

যায়; গানের দলের একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তাঁর 'এ নাইট ইন দ্য শো' (১৯১৫-১৬) কিংবা ক্যাবারে নৃত্যকে বিদ্রূপ করে 'কট্ ইন এ ক্যাবারে' (১৯১৪) কিংবা সিসিল-ডি-মিল-এর অপেরাকে ব্যঙ্গ ১৯১৫-১৬ সালে তোলা ৪ রীলের ছোট্ট কাহিনীচিত্র 'কারমেন'—এসব ছবিই সে পরিচয় বহন করে। ১৯১৪ সালেই তোলা 'হিজ্ মিউজিক্যাল ক্যারিয়ার' ছবিতে তাঁর ভূমিকা ছিল টমের, যে একজন পিয়ানো বাহক মাত্র।

॥ ২ ॥

চার্লি'র ছোটবেলা কেটেছে অসীম দারিদ্রে। বাবা চার্লস চ্যাপলিন ছিলেন মিউজিক হল ও অপেরার গাইয়ে-বাজিয়ে। মা হান্নাহ্ চ্যাপলিনের সংগীতনৈপুণ্যও ছিল ঈর্ষাউদ্রেককারী। খুব স্বাভাবিক এক সংগীত বাতাবরণে চার্লি বড় হচ্ছিলেন। বাবা-মা দুজনেই উপার্জনক্ষম ছিলেন বলে ছেলেবেলাতে চার্লি'র পক্ষে সংগীতশিক্ষার মত 'বিলাসে' মগ্ন হওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। বাবা-মার যুগ্ম শিক্ষকতায় আর অকৃপণ দাক্ষিণ্যে চার্লি ছোট বেলাতেই সংগীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ইওরোপীয় সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ গোপন থাকে নি—এর ক্লাসিকাল দিকটি যেমন তাঁকে আকর্ষণ করেছিল তেমনই এর লঘুসংগীতের মনোটোনি ও সীমাবদ্ধতা তাঁকে পীড়া দিয়েছিল। বাবা-মার কর্মক্ষেত্রে তাঁর আসা-যাওয়া ছিল নিত্য—ঐ টানেই। সংগীত ও নৃত্যের প্রতি তাঁর অনাবিল আগ্রহ দেখে বাবা-মাও নিয়ে যেতেন তাঁকে অপেরা শোনাতে।

এ ভাবেই এল নৃত্যের প্রতি ঝোঁক। চার্লি নাচও শিখতে আরম্ভ করলেন। অধ্যবসায়ের গুণে দেখে দেখেই স্বশিক্ষিত হতে লাগলেন। ব্যালে, পোল্কা, আমেরিকান লোকনৃত্য তাঁর আয়ত্বাধীন হল কৈশোরে পা দেবার আগেই। নানা ধরনের নৃত্যে তালিম নিলেও, নৃত্যের তালিকায় তাঁর প্রথম পছন্দ ছিল ব্যালে—অবশ্যই ব্যালে। ব্যালে পাশ্চাত্য নৃত্যছন্দের শেষ কথা, সুকঠিন এই নৃত্য মাধ্যমটিকে চার্লি খুব নিষ্ঠাভরে আয়ত্ব করেছিলেন। ব্যালে নৃত্যের সংগীতও মূলত ক্লাসিকধর্মী এবং বিস্তারপ্রবণ। নৃত্য ও সংগীতের এমন মেলবন্ধন বড় সহজলভ্য নয়, ফলে এই নৃত্যধারাটির প্রতি চার্লি'র পক্ষপাত ছোটবেলা থেকেই ছিল।

মাত্র আট বছর বয়স থেকে নৃত্যে তাঁর পেশাদারী অভিযান শুরু, বাবা মার

সাথে গিয়েছিলেন নাচতে। সে বয়সেই ক্লগ-ড্যান্সিংয়ে তিনি অংশ নিয়েছিলেন—'এইট ল্যাংকাশায়ার ল্যাডস্' পালায়। হয়ত তখন কেউ ভেবেও দেখেন নি, এই সংগীতনৃত্য শিক্ষাই ক্রমশঃ তাঁর ভবিষ্যৎ গড়ে দেবে, পৃথিবীকে উপহার দেবে তাঁর অন্যতম সেরা চলচ্চিত্রকারকে।

বাবা মারা গেলেন হঠাৎই। মা হয়ে পড়লেন মানসিক রোগগ্রস্তা। ঠিক এরকম দুঃসময়ের জন্যই বোধকরি প্রতিভাবানেরা অপেক্ষা করে থাকেন। চার্লি খুব সহজ ভাবেই আসন্ন লড়াইয়ের দিনগুলিকে গ্রহণ করলেন। প্রস্তুতি শুরু করলেন মোকাবিলার। বড় ভাই সিডনীর যোগাযোগে ফ্রেড কার্নোর কার্ণিভ্যাল ট্রুপে চাকুরী নিলেন। ফ্রেড কার্ণোর কার্নিভাল দলটির নাম তখন বহুবিস্তৃত, এই দলে চার্লি নৃত্যশিল্পী ও কমেডিয়ান—দু'ধরনেরই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। ফ্রেড কার্নোর দলটিতে ইংরেজদের আধিপত্য ছিল, ফলে মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতার সুবাদে বৃটিশ নৃত্যে তথা সংগীতধারাটিও তাঁর অনায়ত্ত রইল না।

এখানে নাচার সময়েই তিনি তাঁর বিখ্যাত পোষাকটির কাঠামো উদ্ভাবন করেছিলেন যার পরিপূর্ণ প্রকাশ আমরা জানি ম্যাক সেনেটের 'কিড্ অটো রেসেস অ্যাট্ ভেনিস' (১৯১৩) ছবিতে। জয়যাত্রার সেই শুরু—পোষাকের মালিকটি সম্বন্ধে তাঁর উক্তিটি অনুধাবনযোগ্য—'a fallen aristocrat at grips with poverty'। তাঁর ব্যক্তিজীবনের এসব ঘটনা এ কারণেই উল্লেখনীয় যে তা সুনিশ্চিতভাবে আমাদের কাছে এটাই উপস্থাপিত করে: সংগীত ও নৃত্যের পারিপার্শ্বিকতাতেই জন্ম নিয়েছে সেই 'লিটল ট্র্যাম্প'। কার্নো-কার্নিভ্যালের সেই ছোট্ট নাচিয়ে ছেলেটাই পরে বিশ্বজয় করেছিল। সুতরাং চলচ্চিত্র, সংগীত ও নৃত্য—এ তিনটি মাধ্যমের কোনটি তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় তা বলা কঠিন, বরং বলা যায়, একে অপরের পরিপূরক হয়ে একটি পূর্ণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে, যাঁর পরিণতিবোধ, পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভংগী, প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণ তাঁকে শুধু খ্যাতি নয়, এনে দিয়েছে জনমানসের অফুরন্ত ভালবাসা ও শ্রদ্ধা।

॥ ৩ ॥

শৈশব-কৈশোরের এই সংগীত-নৃত্যানুরাগ ও শিক্ষা পরে চ্যাপলিনকে খুবই সাহায্য করেছে। তাঁর প্রায় ছবিতেই এর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে অসংখ্য। তাঁর ছবিতে সংগীতের ভূমিকা একাধারে ব্যঞ্জনাময়, প্রতীকী ও সরল। কখনও

তা ছবির অন্তর্সমতা রক্ষা করে, কখনও তা দৃশ্যমাধুর্য বাড়ায়, কখনও বিপরীত-ধর্মী চিন্তার আভাসও দেয়। ক্রোমাটিক কিংবা চেজ্ মিউজিকে প্রথানুগ প্রয়োগ থেকে তিনি আমাদের উদ্ধার করলেন। অবজেকটিভ বা দৃশ্যানুগ সংগীত-ধারা থেকে কিছুটা সরে এসে তিনি সংগীতে প্রয়োগ করলেন সাবজেকটিভ বা অনুভূতিপ্রবণ সুরধারা। আবহসংগীতের যে ছ'টি স্তর এখন বিদ্যমান, বলা চলে, সব কটিরই শুরু তাঁর ছবি থেকে—পরবর্তীকালে প্রাগ্রসর চলচ্চিত্রের ধারা অনুযায়ী তা প্রয়োগবৈচিত্র লাভ করে আরো মর্যাদা ও সুষমা-মণ্ডিত হয়েছে। আমরা জানি, এই ছ'টি স্তর হল : দৃশ্যানুগ সংগীতধারা, অনুভূতিসঞ্জাত সংগীতরীতি, মিশ্রিত সংগীতারোপ, কন্ট্রাস্ট বা বিপরীতধর্মী সংগীত প্রয়োগ, শাব্দিক অনুষঙ্গ এবং গানের প্রয়োগ।

দৃশ্যানুগ সংগীত-ধারাটি আবহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রাচীনকাল থেকেই অনুসৃত হয়ে আসছে। চলমান দৃশ্যে বাস্তবতার ছোঁয়া দেবার জন্য আবহ সৃষ্টিতে এই ধারাটির গুরুত্ব অপরিসীম। নাটক বা অপেরার প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সহজ, এটিও সত্য। রাজা বা সম্ভ্রান্তবংশীয় কেউ যেমন আগে সংলাপ বলতেন পদ্যে কিংবা ভারী গদ্যে, তেমনি তার আবহ রচিত হত বাস্তব অবস্থান থেকে। রাজদরবারে যে সাঙ্গীতিক রেওয়াজ ছিল, নাটকের দৃশ্যে রাজা বা ঐ স্থানীয় কেউ এলে আবহে বেজে উঠত সেই সুর, যার মূল অভিব্যক্তি ছিল সসম্ভ্রম অভিবাদন জানানো। এই সূত্রটিই আসলে সংগীতের প্রকাশশক্তি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন না করে পারে না—সংগীত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তবতাকে যে ফুটিয়ে তোলা যায় এই ধারণার সৃষ্টি করা।

বহু ব্যবহারে সৃষ্টিশীলতা ক্রমশ রূপান্তরিত হয় প্রথায়। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটল না। ট্র্যাডিশনাল এই দৃশ্যানুগ আবহ-আরোপের পদ্ধতিটিও সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করছিল। নিজেকে গতানুগতিক বলে প্রতিপন্ন করছিল। চ্যাপলিন তাই পদ্ধতিটির প্রয়োগ সম্বন্ধে অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতনতা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর ছবিতে ক্রোমাটিক সুর আলগাভাবে বেজে ওঠে না, যত্রতত্র ব্যবহৃত হয় না চেজ মিউজিক। সবচেয়ে বড় কথা, অপ্রয়োজনে সংগীত ব্যবহৃতই হত না। এ সবই তাঁর আধুনিক সংগীতচিন্তার পরিচয় দেয়। দৃশ্যানুগ আবহসংগীতারোপের যে প্রকোপ এখনকার দেশী বিদেশী বাণিজ্যিক ছবিগুলিকে গ্রাস করেছে, তার কারণ এই নয় যে এখন প্রতিভার অভাব ঘটেছে, সংগীত পরিচালকদের বাণিজ্যিক সাফল্যের প্রতি উগ্র আকাঙ্খাই তাকে অপরিমিত

প্রয়োগের শিকার করে ফেলেছে। আগেই বলেছি এ জাতীয় সংগীত রচনায় কল্পনাশক্তি তথা সৃষ্টিধর্মিতার অভাব উপলব্ধ। তবুও ছবির মেজাজ ও ঘটনা অনুসরণ করে যদি এ পদ্ধতিতেই সংগীতারোপ করা যায়, ছবির দ্রুতগামিতা ও ভারসাম্য দুই-ই রক্ষিত হয়। দৃশ্যটিকে সংগীত মাধ্যমে ইন্টারপ্রেট করতে পারলে ছবিটি সাহায্য প্রাপ্ত হয় নতুবা ফল হয় উল্টো। ঝাঁকে ঝাঁকে সংগীতাংশ আসে চড়া সুরের—সেটা না হয় সংগীতাংশ, না তা ছবির দৃশ্যটিকে ইন্টারপ্রেট করে।

চ্যাপলিনের ছবির অধিকাংশ জুড়ে এই পদ্ধতিটির প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করতে পারি। এও অলক্ষ্যণীয় নয়, সনাতন পদ্ধতিটির প্রয়োগে চ্যাপলিন অতিরিক্ত একটি মাত্রা আরোপ করতে পেরেছেন। সেটি অবশ্যই পরিমিতি বোধ। দৃশ্যের স্বতস্ফূর্ত চাহিদা, তাঁর টেকনিক্যাল জ্ঞান এবং পরিমিতি বোধ—এই তিনে মিলে দৃশ্যানুগ সংগীতধারা নতুন এক ব্যঞ্জনা লাভ করল। চিরাচরিত বাদ্যযন্ত্রে পাশ্চাত্য সংগীতের ঘনবদ্ধ ঐকতান অর্থবহ প্রয়োগে প্রাণবন্ত করে তুলল তাঁর ছবিকে। 'গোল্ডরাশ'* ছবিটির সেই বরফের ওপর দিয়ে স্লেজ গাড়িতে স্বর্ণানুসন্ধানে যাওয়ার ঘটনাটি আমরা মনে করতে পারি। আপাতসিরিয়াস দৃশ্যটি সংগীতপ্রয়োগে জীবন্ত হয়ে ওঠে। লক্ষ্য—স্বর্ণ আবিষ্কার। অর্থগৃধ্নুতার প্রতি ব্যঙ্গ নয়, মানুষের চিরন্তন আকাঙ্খার এই অভিযানটিকে চ্যাপলিন দৃশ্যানুগ সংগীত মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলেন। অ্যাডভেঞ্চারের আবহ এখানে বেশ লাগসই হত, কিন্তু চ্যাপলিন এখানে প্রয়োগ করলেন পোলকা ছন্দের আবহ। ডিমিনিশ বা অগমেন্টাল সুর-কাঠামো নয়, আবহে বেজে চলল পোলকার দ্রুত ছন্দবহুল সুর—দৃশ্যটি তার দ্রুতগামিতা থেকেও বিচ্যুত হল না, অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনেও সফল হল। বলা চলে, ছবিটির সমস্ত বিষয়েই স্রষ্টা নিজেকে সফল মনে করেছেন, সংগীত প্রয়োগও এর মধ্যে অন্যতম এবং তাই স্রষ্টা চ্যাপলিনের হৃদয়নিঃসৃত কথাটি বেরিয়ে আসে—'শুধু 'গোল্ডরাশ' ছবিটির জন্যই আমাকে মনে রাখতে হবে।'

এ ধারা বহমান তাঁর 'মডার্ন টাইমসে'। ছোট্ট একটি উদাহরণ—কারখানার নাটবল্টু টাইট করছেন চ্যাপলিন, ক্রমশঃ তা দ্রুততর হচ্ছে, অঙ্গ সঞ্চালন বাড়ছে,

* ১৯২৫ সালে নির্মিত, টীকা ও সঙ্গীত সহযোগে চার্লি ১৯৪২ সালে এটি পুনঃ প্রদর্শন করেন।

প্রায় ধাক্কাই লাগছে অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে, একজন তার মধ্যে বিশালদেহী, চ্যাপলিন রেঞ্জ হাতে খুব কাজ করছেন—আবহে দৃশ্যানুগ রীতি অনুসৃত হল, তার সাথে যুক্ত হল নানান শব্দ, তাঁর ব্যস্ততার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আবহ ব্যস্ত হয়ে পড়লে অবশ্যই মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হত। চ্যাপলিন কারখানার পরিবেশটি বোঝাতে সঙ্গীতাংশে ক্যায়োটিক ধরনের নানান শব্দ যুক্ত করে দিলেন। আবহ প্রয়োগের দিক থেকে ব্যাপারটা সময়ানুসারে অবশ্যই অভিনব। 'লাইমলাইট'-এ চ্যাপলিনের সেই আকাঙ্খিত মহিলাটির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর্বে আবহে যে রোম্যান্টিক সুরমূর্চ্ছনা বেজে ওঠে, তা নিশ্চিতভাবেই চ্যাপলিনের সঙ্গীতমননের পরিচয় দেয়। অসাধারণ কম্পোজিশন সঙ্গীতের, দৃশ্যের তো বটেই। আর উদাহরণের প্রয়োজন নেই বলেই মনে হয়।

॥ ৪ ॥

সঙ্গীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক জটিল প্রক্রিয়া বা স্তর হচ্ছে অনুভূতি-সঞ্জাত আবহসৃষ্টি একটি দৃশ্যে যা ঘটছে, কেবল তাকে অনুসরণেই এ জাতীয় সঙ্গীতধারা থেমে থাকে না, দৃশ্যটির নিগূঢ়ার্থটি পরিষ্কার করে দেবার জন্য আরোপিত হয় আরো বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতের সুর। ছবির দৃশ্যের সাথে এর মিল নাও হতে পারে। আগত ঘটনাবলীর পূর্বাভাষ রেখে যায় বলে একে ব্যাক-গ্রাউন্ড প্রিলিউডও বলা যায়। দৃশ্যের অনুভাবনাটির বিস্তার ঘটে এভাবেই। এই অনুভূতিসঞ্জাত সংগীতাবহ সৃষ্টির সাফল্য পুরোপুরি নির্ভরশীল স্রষ্টার অভিরুচি, গোটা ছবিটির পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে তীক্ষ্ন জ্ঞান, বক্তব্য বিষয়টি সম্বন্ধে একাত্মবোধ এবং সম্পূর্ণ ঘটনাবলীর ওপর নিয়ন্ত্রিত নজর রাখার ওপর। এককথায়, একজন সৃষ্টিশীল চিত্রপরিচালকের মত সঙ্গীত পরিচালকেরও ছবিটি সম্পর্কে আন্তরিক অনুধ্যান রাখা প্রয়োজন। সৃষ্টিশীল সঙ্গীতবিদ্ এই জাতীয় আবহ রচনায় খুব তৃপ্তি লাভ করেন, এ কথা বুঝিয়ে বলার আবশ্যক করে না। এক্ষেত্রে সঙ্গীতস্রষ্টার স্বাধীন থাকা আবশ্যক হয়ে পড়ে—অর্থাৎ চিত্রপরিচালকের ও সঙ্গীত পরিচালকের চৈতন্যের স্তরে সমীকরণ হওয়া চাই—চিন্তাভাবনার রিলে নয়। এই সমীকরণে সঙ্গীত পরিচালক যখন পেঁছে যান, তখন ছবিটির দৃশ্যাবহে তাঁর ভাবনার প্রতিফলন মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রথাবহির্ভূত এই প্রয়োগরীতির আশংকার ক্ষেত্রটি অবশ্যই অপপ্রয়োগ এবং গতিমন্থরতা।

চ্যাপলিন এক অর্থে এই নীতির প্রথম প্রয়োগবিদ্ একথা বলার মধ্যে

কোনো অতিশয়োক্তি নেই, বরং স্রষ্টার প্রতি সম্মানজ্ঞাপক। এই ধারার আবহ ব্যবহারে পৃথিবীর প্রথম সারির কৃতবিদ্য পরিচালকমাত্রেই উৎসাহিত বোধ করেছেন। কুরোসাওয়ার দেরসু উজালার সেই দৃশ্যটি সহজে ভোলার নয়। ঝড়ের সেই রাত, খড়কুটো সম্বল করে দেরসু বাঁচানোর চেষ্টা করছে তার 'কাপিতান' ও তাঁর সহযাত্রীদের। আবহে প্রচণ্ড ঝড়ের শব্দ, কিন্তু পরে পরেই শান্তসমাহিত প্রাকৃতিক ব্যঞ্জনার সুরে পরিচালক যেন এটা বোঝাতে চাইলেন, ঝড়ঝঞ্ঝা জীবনে আসে, তা ক্ষণিকের, ঐ দেখ ভোরের রক্তিম আকাশ। দৃশ্যতও পর্দায় তাই ঘটে। চিন্তার এই অগ্রগামিতা সুরে ধরে রাখা একমাত্র এই মাধ্যমেই সম্ভব, ইংরেজীতে যাকে বলা হয়ে থাকে 'সাবজেক্টিভ্ ইন্টারপ্রিটেশন।'

'মডার্ন' টাইমসে' চ্যাপলিন এ ধারার অসাধারণ প্রয়োগ করেছেন। দৃশ্যত আমরা যেখানে অভাব দেখছি, সেখানে বেজে চলেছে ভায়োলিন—ভিয়েলা পিয়ানোর ছন্দময় সুর। চ্যাপলিনের সেই 'লিটল ট্র্যাম্প' ভাবমূর্তিটিই এখানে কাজ করে বেশি, কেন না সে দারিদ্রে লজ্জিত নয়, বরং দারিদ্র তাকে মহান করেছে। সংসার গোছানোর চিন্তায় প্রেমিকযুগল মশগুল, পোড়ো ভাঙা বাড়িতেও কি সুখ কি সুখ—সংগীতাংশে একে বিধৃত করা অসাধারণ সংগীত মনীষার পরিচয় বহন করে। অথবা 'লাইম লাইটে'র সেইসব দৃশ্যে—যেখানে মেয়েটির জন্য চ্যাপলিনের অনুচ্চারিত প্রেম একরাশ সমবেদনা নিয়ে উপস্থিত হয়—আবহ সেখানে পুনরাবৃত্ত। বৃত্তের মতই তা' দু'টি চরিত্রকে ঘিরে থাকে। সুরের এই অনুভূতি দিয়েই চ্যাপলিন অবিস্মরণীয় প্রেমের মালাটি গেঁথে ফেলেন, যা শেষ দৃশ্য পর্যন্ত অনুক্ত ও অপ্রকাশিত। সংগীতাংশে বিষয়টি আমরা হৃদয়ংগম করতে পারি। বাণিজ্যিক ফিল্মে এখন অবশ্য উম্মাদেরা বার তিনচার পুনরাবৃত্ত সংগীত বা গানে স্মৃতিশক্তি ফিরে পাচ্ছে। 'গ্রেট ডিক্টেটর' নেপোলিনী (মুসোলিনী) ও হিংকেলের (হিটলার) দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আয়োজন হয়েছে। বিশেষ ট্রেনে আসছেন নেপোলিনী, স্টেশন চত্বরে কার্পেট পাতার মজা ও আবহে তার প্রতিফলন ঘটিয়ে বৈঠক পর্যন্ত চ্যাপলিন ধরে রাখেন ব্যাংগাত্মক সুরধ্বনি। আমরা বৈঠকের আপাতগম্ভীর নির্মোকটি ভেদ করে এর অন্তসারশূন্যতা সম্বন্ধে প্রথম থেকেই অবহিত হয়ে যাই।

অনুভূতিসঞ্জাত এই সংগীত ধারাতে নৈঃশব্দেরও একটা ভূমিকা আছে।

'দেরসু উজালার শেষে তুলির রংয়ে আঁকার মত ঋজু প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো বোবা, চেয়ে থাকে অমলিন। এখানে কোনো আবহই এতটা বাঙ্ময় হতে পারত না। নৈঃশব্দের ভাষা এমনই বাঙ্ময় আন্তনিওনির 'ব্লো আপ' ছবির শেষ দৃশ্যে যখন টেনিস কোর্টের খেলোয়াড় ও দর্শক সবাই ডামির মত আচরণ করে—আবহে তখন নৈঃশব্দের সেই ভাষাই কাজ করে যায় পরিচালকের অভীষ্ট দর্শনে পৌঁছুতে—মূক আমরা সবাই এমনি করেই নিজেদের মধ্যে খেলে যাচ্ছি অবিরত, কেউ কেউ দেখছিও, কিন্তু কেউ কাউকে চিনি না, কথা বলি না। ক্রীড়নক কুশীলবেরা তাই শব্দহীন—খেলে যাচ্ছে সেই খেলা, যার শুরুও নেই, শেষও নেই। অসাধারণ ব্যবহার সাবজেক্টিভ আবহরীতির।

চ্যাপলিন নৈঃশব্দ্যের টুকরো টুকরো ব্যবহার কয়েকটি ছবিতে করেছেন। 'মডার্ন টাইমসে' এই সায়লেন্স বাঞ্ছিত রহস্য এনে দিয়েছে—মেশিন দিয়ে খাবার খাওয়ানোর দৃশ্যটির আবহ মূক, শুধু মেশিনটির ক্যাচকোচ শব্দ, কিংবা জ্বলে যাওয়ারও—বাকিটা আমাদের শিরা টানটান রাখে কি হয় কি হয় রহস্যের আঁধারে—এই বুঝি চ্যাপলিনের গলায় লাগল, এই বুঝি তার কিছু হল, এরকম চিন্তা চলতে থাকে এ কারণেই যে সেখানে আবহ আমাদের সে সুযোগ দেয় নিশ্চুপ থেকে। অথবা গোল্ড রাশের সেই দৃশ্যটি—শালপ্রাংশু লোকটির সংগে নির্জন সেই পাহাড়চূড়ার ঘরটাতে চ্যাপলিনের সাক্ষাৎ, একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী আরব্ধ বিষয়ে—অন্তত মিনিট খানেক আবহ মূক থাকে, দৃশ্যটির মজা বুঝে নেবার জন্য আমরা ফুরসুৎ পাই—চ্যাপলিনও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হতে থাকেন। 'মডার্ন টাইমসে'র শ্রমিকেরা একপাল ভেড়ার মত, শুরুর দৃশ্যেই, কারখানার দিকে চলেছে—আবহে বাজে না কোনো সুর। আমরা বুঝতে পারি মালিকের শৃংখলার কড়া শাসনে বন্দী শ্রমিক বাহিনী কাজে চলেছে!

॥ ৫ ॥

দৃশ্য, দৃশ্যানুগ ও অনুভূতিপ্রবণ আবহসৃষ্টি—এই তিনে মিলে যে সম্মিলিত সংগীত প্রক্রিয়া, মিশ্রণ আবহরীতি হিসেবে পরে তা' আবহরচনার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে। পূর্ব-আলোচিত দু'টি ভিন্নমুখী সংগীতধারার সম্মিলনে মিশ্রণরীতির উদ্ভব। অবশ্যই দৃশ্যবিন্যাসের ধারা অনুযায়ী এ রীতির ব্যবহার সীমিত রাখতে হয়। সংগীত স্রষ্টার কাছে এ

রীতির প্রয়োগ একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে। 'সুবর্ণরেখা'-য় বাহাদুর খাঁকে আমরা এমন অসাধারণ সঙ্গীত প্রয়োগ করতে দেখেছি, ঋত্বিকের প্রভাব অবশ্যই সেখানে বিরাট—দিগন্তব্যাপী শূন্য পরিত্যক্ত নির্জন প্রান্তরে একা বসে, সীতা—পরণে তার পাড় দেওয়া সাদা কাপড়, ভোরের সূচনাতেই সে গান ধরে বিষাদের মাধুর্যমণ্ডিত এক ভঙ্গীতে। সরোদের অসাধারণ প্রয়োগের টুকরো টুকরো দৃশ্যগুলো জমাট বাঁধে। ভোরের সেই নির্জনতা যেমন ধরা পড়ে, তেমনই সীতার একাকীত্বের বেদনা ও হৃদয়-নিঃসৃত আবেগটিও আমাদের স্পর্শ করে। পরিত্যক্ত শালবনী এয়ারপোর্টের রানওয়েতে ঐ নির্জনতায় সীতা—বাস্তবসম্মত হয় দৃশ্যটা। কিন্তু সংগীত তাকে বাস্তবমুখী করে তুলল। অনুভূতি ও বাস্তববোধ একাকার হয়ে একটি অসাধারণ দৃশ্যকল্পের জন্ম দিল যার পরতে পরতে আছে মিশ্রিত সংগীতরীতির যথার্থ প্রয়োগ।

'মডার্ন টাইমসে'র সেই দৃশ্যটির কথা ভাবা যাক—সেই যে চ্যাপলিন এক সুরম্য প্রাসাদের স্বপ্ন দেখছেন; আধা ফ্যান্টাসির প্রয়োগ রয়েছে দৃশ্য কল্পনায়। আঙুরের গাছ—থোকা থোকা আঙুর পেড়ে খাওয়া, দুয়ারে এল দুগ্ধবতী সেই গাভী মুহূর্তেই সাধারণ 'ডেস্টিটিউট' সেই লোকটি উন্নীত হয় কল্পলোকের রাজপুত্রে। সাধারণ মানুষের অবদমিত আশা আকাঙ্ক্ষা এইভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে ছবিটিতে। আবহ এ দৃশ্যে মিশ্র-রীতির। স্বপ্নদৃশ্যে টুংটাং রোমান্টিক ধ্বনি প্রয়োগে আমরা অভ্যস্ত, এমন কি আন্তনিওনির মত পরিচালকও 'জোব্রিস্কি পয়েন্টে' তা' থেকে সরে আসেন নি। চ্যাপলিন কিন্তু এখানে অসাধারণ সংযমী। দৃশ্যটিতে তিনি ব্যবহার করলেন সেই সুর—আগের দৃশ্য থেকে একটুও বিচ্যুতি না ঘটিয়ে। সাংগীতিক এই রিলে অন্য ব্যঞ্জনা বয়ে নিয়ে এল—আসলে লোকটির বাড়ির টান এই মাটিতে। 'কাউন্টেস ফ্রম হংকং' এ মার্লন ব্রান্ডো ও সোফিয়া লোরেনের পরিচয়ের মুহূর্তে যে দ্রুতলয়ী আবহ বেজে চলে, তা' যেন ছবির পরিণতির আভাস দেয়; এর বেশ পরে আবহ মাধুর্যের সুরাবেশে রূপান্তরিত হয়—স্রষ্টার অভিরুচি আমরা বুঝতে পারি। এই সাক্ষাৎটিই ছবির নিয়ামক; আবহ তাই দ্রুত, স্পন্দিত সংগীত ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়। এমনটি আমাদের জীবনেও ঘটে। উত্তেজনা হঠাৎই বাড়ে, বড় কিছু ঘটবার আগে তা প্রশমিত হয়। এই জীবনবোধ থেকে চ্যাপলিন ছবি করে গেছেন, সঙ্গীত রচনা করেছেন—ফলে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পেরেছে।

'কণ্ট্রাস্ট' মিউজিক কিংবা বিপরীতার্থক সংগীতরীতি আবহে কখনও ব্যবহৃত হলে দৃশ্যটি যথোচিতভাবে পরিস্ফুটিত হতে পারে। দৃশ্যে যা ঘটছে, আবহসংগীতে তার বৈপরীত্য প্রকাশ করে চিত্র পরিচালকের অভীষ্ট পূরণে এ ধারার সংগীতির সহায়তা করে। এক অর্থে, কণ্ট্রাস্ট সংগীত-ধারা অনুভূতি সঞ্জাত সংগীত রীতিরই অংশ, কেন না এখানেও কাজ করে সংগীত পরিচালকের ব্যক্তিগত বোধ ও ছবিটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা। আমরা সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' ছবিটির কথা জানি। দৃশ্যত যেখানে দয়াময়ীর ওপর 'দেবীত্ব' আরোপিত হচ্ছে, আবহে সেখানে ঢাকে বেজে চলেছে বলির বাজনা। আপাত-দৃষ্টে দেবীত্ব লাভ ব্যাপারটি মহৎ ঘটনা। পরিচালক কিন্তু বলির বাজনার প্রয়োগ করে ছবির ট্র্যাজিক সমাপ্তির ইঙ্গিত দিলেন। এই বৈপরীত্য ছবির গোটা গঠনটিকেই ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছে।

'লাইম লাইট' ছবিতে চ্যাপলিন এই বিপরীতার্থক সংগীতানুষঙ্গ প্রয়োগে যথেষ্ট সফল হয়েছেন। আপাত সুখকর নৃত্যাংশে তিনি আজীবন যাঁকে আকাঙ্খা করে এসেছেন, তাঁর সাথে নৃত্যরত—নৃত্য শেষ, গ্রহণীয় পর্যায়ে চ্যাপলিনের নিথর নিঃস্পন্দ দেহ মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। যে সকরুণ অন্তিম দৃশ্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, আমরা মুহূর্তপূর্বেও তার প্রস্তুতি নেবার সুযোগ পাই না। সংগীতাবহে কখনও মধ্যছন্দে, কখনও দ্রুত ছন্দে বেজে চলে ওয়ালশ্। নৃত্যরত চ্যাপলিন ও তাঁর দয়িতা। মিলনান্তক দৃশ্যের বদলে এল শোকবার্তাটি। প্যাথস্ ব্যবহারের তীব্র লোভ সংবরণ করে চ্যাপলিন আবহে রেখেছিলেন মধ্যস্থলে ওয়ালশ্—যা সমবেত বলনৃত্য দৃশ্যটিকে জোরদার করল, তাকেও বাঞ্ছিত সহায়তা দিল। বিপরীত ক্রিয়া যা ক্ষণকাল পরেই ঘটবে, দর্শককে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আভাস দিলেন না চ্যাপলিন। শকটা তাই বেশিই পেলাম আমরা। চড়া সুরের প্রধানুগ বেহালা-ভিয়েলার ব্যবহার বর্জন করে চ্যাপলিন ছবিটিকে মেলোড্রাম হতে দিলেন না।

শাব্দিক অনুষঙ্গ দিয়ে আবহের যে অবয়ব রচনা করা যায়, সে সম্বন্ধে আমরা সম্যক ওয়াকিবহাল আছি। প্রাকৃতিক শব্দসমূহ ধ্বনি বৈচিত্র্যে যথেষ্ট শক্তিশালী, দৃশ্যকে অনুধাবন করে তাকে শব্দবৈচিত্রে আবহে রূপান্তরিত করলে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পেঁছিনো যায়। এমন একটি অসাধারণ দৃশ্যের উদাহরণ দেওয়ার লোভ সংবরণ করা গেল না। ছবিটি 'প্রতিদ্বন্দ্বী', সত্যজিতের

ছবি, তাঁরই সংগীত প্রয়োগ। শেষ দৃশ্যে কলকাতা থেকে অনেক দূরে ছবির নায়ক সিদ্ধার্থ শোনে পাখির ডাক—যা তার রোমাণ্টিক নস্টালজিয়ার ইঙ্গিতবাহী, সে ফিরে যেতে চায় তার কৈশোরে, গাছগাছালির নির্জনতায়। এতে করে পলায়নী মনোবৃত্তি ধরা পড়েছে বটে, কিন্তু সেটা তো স্রষ্টার অভিরুচিরই প্রকাশ।

চ্যাপলিনের 'গ্রেট ডিক্টেটর' ছবিটির সেই অসাধারণ দৃশ্যটির কথা আমরা এক্ষেত্রে ভাবতে পারি। হিটলারবেশী চ্যাপলিন (হিংকেল) বক্তৃতা করছেন। তার আধা জর্মন আধা ইংরেজী উচ্চারণে গলাবাজী করে জানাচ্ছেন—ডেমো-ক্রেসি-ফেসি সব ভুয়ো, মড়া যা দুর্গন্ধ ছড়ায়! স্বাধীনতা-ফতা সব বাজে ব্যাপার। তাঁর চীৎকারে ক্রমশঃ দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে এমপ্লিফায়ারগুলো, হিটলারের গলাবাজিতে মাইক্রোফোনগুলোও বেঁকে যাচ্ছিল। বক্তৃতার স্কেল বাড়ে—একটা সময় আসে যখন ঘড় ঘড় শব্দ ছাড়া কিছু শোনা যায়। শব্দটা শেষে জুড়ে থাকে গোটা দৃশ্যটা—একটা বীভৎস আওয়াজ নিয়ে। এই হাউলিং আমাদের বিরক্তি ঘৃণা হাসি—সবেরই উদ্রেক করে। আবহে শব্দের এমন পরি-কল্পিত অর্থবহ ব্যবহার বড় সহজলভ্য নয়। হিটলারকে এতবড় ব্যঙ্গ বোধহয় আর কেউ করতে পারেননি। ঐ বীভৎস হাউলিংয়ের শব্দই এখানে সিনেমাটীক সিচুয়েশন সৃষ্টি করে দিয়েছে, সঙ্গীতের অনুপূরক হিসেবে জোরালো আরেকটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে।

এবং গান। সিনেমার আঙ্গিকে চ্যাপলিনই প্রথম সুষ্ঠুভাবে গান পরিবেশন করেছিলেন। সংগীতাংশে গানের প্রয়োগ ক্ষেত্রে ঋত্বিক ঘটক যে চিন্তাশীল কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা এখন পর্যন্ত উদাহরণ হিসেবে কাজ করছে বললে অতিপ্রশংসা করা হয় না। 'যুক্তি তক্কো ও গপ্পো'র সেই অসাধারণ দৃশ্যটি এক্ষেত্রে না মনে পড়ে পারে না। নীলকণ্ঠ—এ যুগের বুদ্ধিজীবীদের যন্ত্রণার প্রতীক, পুরুলিয়ায় ছো-য়ের মুখোসশিল্পী সেই বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলছেন, হাতে তার দুর্গার মুখোস। জননী চেয়ে আছেন—আবহে আর্তনাদের মত দেবব্রত গেয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথের গান—'কেন চেয়ে আছ গো মা?' গানটি যুগযন্ত্রণার দ্যোতক হয়ে পড়ে।

'মডার্ন টাইমস' ছবিতে ফিরে আসা যাক। এখানে একটি গান ব্যবহৃত হয়েছে। পানশালার দৃশ্যে চ্যাপলিনকে গান গাইতে হয়। ভবঘুরের নতুন পেশা। সঙ্গিনীটি ওখানে নাচেন। ঠাট্টাচ্ছলে প্রায় পাঁচালী ঢংয়ে চ্যাপলিন

রসালো কথার গান শুনিয়ে দিলেন শ্রোতাদের। সংগে তার ডাবলস্টেপিংয়ের নাচ—ব্যক্তিগত দক্ষতায় দৃশ্যটি অসাধারণ পর্যায়ে উন্নীত হতো অবশ্যই, কিন্তু চ্যাপলিন তো' উদ্দেশ্য ছাড়া এক-পাও হাঁটেন না। পানশালার শ্রোতৃবৃন্দের হাততালি এবং ঐ গান—দুইয়ের সমাবেশে চ্যাপলিন তখনকার সমাজের অপরিণতমনস্কতার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন। তাই সুরেলা কোনো গান নয়, পানশালার পছন্দ মাফিক গান তিনি গাইলেন। চ্যাপলিনের গানের কণ্ঠটি অসাধারণ ছিল। ঐ হাল্কা চটুল ছন্দের পাব-সঙ্গয়েও তা আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। পরে তাঁর শেষ ছবিতে* একটি অসাধারণ সুরসমন্বিত গান, যা থীম সঙ্ হিসেবে ছবিটিতে ব্যবহৃত—'দিস্ ইজ্ মাই লাস্ট্ সঙ্'। সহজ সরল সুরের শরীর বেয়ে গানটি সুরে তো' বটেই, প্রয়োগেও আমাদের আকৃষ্ট না করে পারে না। সুরের প্রাঞ্জল গভীরতাই আমাদের ভাবনার গহীনে নিয়ে যায়। এটা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নয়, তাঁর গানের কাঠামো অনুসরণে বাংলা তথা হিন্দিতে অন্তত খান চারেক গান হয়েছে, যেমন 'পল্লবিনী গো সঞ্চারিনী' (লাইম লাইট), কিংবা 'ঘুম যায় রাত ঐ' (গ্রেট ডিক্টেটর), এগুলি যে এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, তার মূলে কাজ করেছে চ্যাপলিনের সহজ সরল মেলডির সুরকাঠামো। চ্যাপলিনের বিরুদ্ধেও অবশ্য ফরাসী কোর্টে মামলা ছিল সুর নকলের। আদালত চ্যাপলিনকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেছিলেন—আসলে অনুকরণ নয়, স্বীকরণেই লুকিয়ে আছে যেকোনো শিল্পের সার্থকতা। বিশিষ্ট অন্য সুরভঙ্গির প্রভাব পড়াটা আদৌ দোষের নয়, নকলনবীশীটা দোষের।

॥ ৬ ॥

সংগীতের যে বর্ণনাত্মক ধারা চ্যাপলিন তাতে বিশেষ আস্থা রাখেন নি। অন্তর্মুখীনতার নিখাদ গভীরতা মিশিয়ে তিনিই প্রথম চলচ্চিত্রের উপযোগী সংগীত সৃষ্টি করেছিলেন, এ বিষয়ে এখন আর কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয়। আমেরিকা ও ইওরোপীয় ধারার সংগীতে যে অবয়বগত পার্থক্য, চ্যাপলিনের সৃষ্টিধর্মীতা তা' দূর করে গ্রহণ ও বর্জনের পরিমিতিবোধের মধ্য দিয়ে শুধু চলচ্চিত্র সংগীতকেই নয়, সংগীত হিসেবেও মননশীল ঋদ্ধি পরিচয় দিতে পেরেছে। সংগীত সম্বন্ধে টেকনিক্যাল জ্ঞান থাকলে কিংবা ভাল গাইয়ে বাজিয়ে

* কাউন্টেস ফ্রম হংকং (সবাক)

হলেই সংগীতস্রষ্টা হওয়া যায় না, এর জন্য প্রয়োজন অনুভূতিশীল প্রয়োগ ও মননবোধ। প্রচলিত অপেরাধর্মী গান কিংবা সংগীতে তাঁর মনোটনি বোধ হত, তার রুচির অভাবও তাঁকে পীড়া দিত ; 'কারমেন' ছবি করে তিনি তা' বুঝিয়েছেন। ক্যাবারে নিয়ে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক ছবি 'এ নাইট ইন দ্য ক্যাবারে' নাচটির কদর্যতা সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়, নৃত্য ও সংগীতের শক্তি সম্বন্ধে তিনি সম্যক্ অবহিত ছিলেন, তাই যথার্থ ও পরিশীলিত প্রয়োগে মাধ্যম দু'টিকে তিনি নিজের ছবির সম্পদই শুধু করে রেখে যান নি, উত্তরসূরীদের জন্য রেখে গেছেন অসাধারণ এক পাথিকৃত্য,—যে ধারায় নিজেদের নিয়োজিত রেখে আজও বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকারেরা চলচ্চিত্র মাধ্যমটির সেই আকাঙ্খিত ভাষাটির সন্ধান করছেন।

বিশ্বখ্যাত ক্লাউন পিয়েরো র আদলে নিজেকে গড়ে তুললেও চ্যাপলিন কমেডি, ট্র্যাজি-কমেডি কিংবা ট্র্যাজেডি নির্মাণে যে স্বয়ংসম্পূর্ণ সৃষ্টিশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন, তাতে সংগীতের ভূমিকাটি অনন্যসাধারণ। এ সেই ভূমিকা যা চ্যাপলিনকে সবাক ছবির যুগেও নির্বাক ছবি করতে প্রেরণা দিয়েছিল। সংলাপ ও সাংগীতিক প্রকাশরীতির মধ্যে শেষেরটাই তাঁর প্রিয় ছিল , কিন্তু যেখানে তাঁর মনে হয়েছে সংলাপ ব্যতীত তাঁর উদ্দেশ্য সাধিত হবে না, সেখানে তিনি সবাক ছবি করতে পিছপা হন নি : গ্রেট্ ডিক্টেটর্, মসিয়ে ভেরদু কিংবা কাউন্টেস।

সুস্থ জীবনধর্মী ও পরিচ্ছন্ন সংগীত সৃষ্টি করে চ্যাপলিন তদানীন্তন ধনতন্ত্রে বিকাশোন্মুখ আমেরিকার সংস্কৃতি তথা সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। চলচ্চিত্রের সেই বহু আকাঙ্খিত ভাষাটির সন্ধান এখনও চলছে, সংগীত সে ভাষার অন্যতম ব্যাকরণ। মনে রাখতে হবে, জর্মনের হ্যান্সরাইজার কিংবা আমাদের সত্যজিৎ রায়ে চলচ্চিত্র-সংগীতের যে মহত্বপূর্ণ অবয়ব, চ্যাপলিনেই আসলে তার সুলুক্-সন্ধান শুরু।

রবীন্দ্র সঙ্গীত ও শিল্পীর স্বাধীনতা

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না কি একবার পরিহাসছলে বলেছিলেন, কোলকাতা 'ক'-এর সাতটা পঁয়তাল্লিশের বেতার অনুষ্ঠানটি আর শোনার ধৈর্য্য থাকছে না—তাঁর সকৌতুক প্রশ্ন ছিল, ঐ অনুষ্ঠানের সঙ্গে কি বাঙালীর দুগ্ধাভাবের কোনও যোগাযোগ আছে ?

বলা বাহুল্য কোলকাতা বেতারের 'ক' কেন্দ্র ঐ সময়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। এবং কোলকাতা বেতারের সাঙ্গীতিক পরিবেশনার সিংহভাগ ঠিক কারণেই বিতরিত আছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য। ধূর্জটিপ্রসাদের দুগ্ধাভাবের প্রসঙ্গটি হাসির উদ্রেক করলেও একথা কোনমতেই অস্বীকার করা যাবে না যে অধিকাংশ রবীন্দ্র সংগীতানুষ্ঠান অত্যন্ত জোলো, প্রাণহীন এবং ম্যানারাইজড্। যে বিপুল সংগীত ঐশ্বর্য কবি রেখে গেছেন আমাদের জন্য, পরি-

তাদের কথাই, তার সিকিভাগেরও কম ঘুরে ফিরে প্রচারিত হচ্ছে কিংবা অনুশীলিত হচ্ছে, তাতে করে রবীন্দ্রসংগীতের গণ্ডি ক্রমশঃই ছোট হয়ে আসছে। শ্রোতাদের কিংবা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কমে আসছে। আর আপামর জনসাধারণের কাছে রবীন্দ্রসংগীত প্যানপেনে একঘেঁয়ে বলে পরিচিত লাভ করছে, কারও কাছে ব্যাপারটা এলিট ক্লাসের শখ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও এরকম ধারণার ব্যত্যয় নেই।

রবীন্দ্রনাথের দেশে তাঁরই সবচেয়ে প্রিয় বিষয় 'গানে'র এহেন হেনস্তার পারিপার্শ্বগত কারণটি অবশ্যই অনুধাবনীয়। বাংলা গানের ধারা বিশ্লেষণ করলে সহজেই ভারতীয় অন্যান্য ভাষার গান থেকে এর স্বাতন্ত্র্যটি চোখে পড়বে। হিন্দুস্তানী বা কর্নাটকী সংগীতে সুরের অবিমিশ্র প্রাধান্য। বাণীর ভূমিকা সেখানে কোনও তাৎপর্য বহন করে না। বাংলাদেশে, রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন 'সংগীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান—অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ'...[১]। তত্ত্ব হিসেবে এটা ঠিকই যে গানে সুরেরই প্রাধান্য থাকা উচিত। একসময়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও দোটানায় ভুগেছিলেন—গানের কথাকে ফুটিয়ে তোলার দায় সুরের কিনা। তাঁকেও পরে স্বীকার করতে হয়েছে, 'গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো; বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানেই গানের আরম্ভ...[২]।

বাংলাদেশের সাংগীতিক ধারাটিতে কিন্তু বাণীর প্রাধান্যই সমৃদ্ধ। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী থেকে রবীন্দ্রকালবর্তী নিধুবাবু—সকলের গানেই মাধুর্য বিকাশের চেষ্টাটি কাব্যাশ্রয়ী। স্বাভাবিক কারণেই সুরের স্বাধীনতা এবং তার বিকাশের ধারাটি সর্বদা ভাষা মুখাপেক্ষী হয়েছিল, সে কারণে বাংলা গানের ভাষার গীতিময়তা যতখানি উচ্চাঙ্গের, সুর ততটা আকর্ষণীয় ছিল না। জনসংগীতের ধারা যেমন অন্যসব দেশে দেখা যায়, বাংলাদেশেও তেমন সার্থক ছিল; বিভিন্ন ধারায় ছড়িয়ে পড়ে জনসংগীত সত্যিকারের ধনবান্ হতে পেরেছিল—যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা, কবির গান, কীর্তনের সুরে বাংলার পল্লীপ্রান্তর তখন সততই মুখরিত থাকত। লক্ষণীয়, উপস্থানগত বিশিষ্টতা বাদ দিলে বাংলা গান কিন্তু এক জায়গায় সমপ্রেরণায় অভিন্ন—তা হচ্ছে ভাষা বা

১ ধূর্জটিপ্রসাদকে লিখিত চিঠি, ১৩ই আগস্ট ১৯৩২

২ জীবনস্মৃতি

বাণী। জনসঙ্গীতের বাণীটিও বাংলায় যথেষ্ট ধনবান্। জীবনদর্শনের অনেক গভীরে তার অনুপ্রবেশ, জীবনবোধের অনেক সার্থক-অসার্থক মুহূর্তে তার অনায়াস যাতায়াত, জীবনরসের সামগ্রিক উপলব্ধিই তার সৃষ্টির উৎস।

বাংলা গানের এই যে বিশিষ্টতা অর্থাৎ সুরের ওপর বাণীর প্রাধান্য তা' কিন্তু গানের স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ না করে পারে না। সুর ও বাণী—মানুষের ভাবপ্রকাশের এই মাধ্যম দু'টির যথার্থ মেলবন্ধনেই সার্থক গানের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, অন্তত সে সব গান যা বেশী সময় ধরে পরিবেশিত হয় না। হিন্দুস্তানী ঘরানায় কেবল সুরেরই দাপট্ রবীন্দ্রনাথ তার বহু অংশবিশেষ ব্যবহার করেছেন তাঁর গানে, কেবল কালোয়াতি ব্যাপারটুকুই তাঁর ঘোরতর অপছন্দের ছিল। আমাদের ওরিজিন্যাল বলে বিশ্বসভায় দাবি করে থাকি যে গানকে সেই কীর্তন—বাউল গানও কিন্তু হিন্দুস্তানী উৎস ধারার যোগফল। ভাষাগত যে স্বাতন্ত্র্যই এদের থাক না কেন, অন্তরে সে হিন্দুস্তানী রাগসঙ্গীতেরই উৎসজাত, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

এই যে আলোচনার প্রেক্ষাপটটি, এ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে বাংলা গানে হিন্দুস্তানী প্রভাব এসেছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেও তা বিদ্যমান, কিন্তু তার স্বকীয়তা কখনই রক্ষিত হয়নি। যেমন এর তান, বিস্তার, লয়ের দ্রুতলহরীর মূর্চ্ছনা—সাঙ্গীতিক যেসব উজ্জ্বল বিশিষ্টতায় হিন্দুস্তানী সংগীত ধনবান, বাংলার সাঙ্গীতিক ধারাটি তা' পরিহার করেছে, রবীন্দ্রনাথের গানও। কিন্তু স্বরজ যে মিষ্টত্ব রাগরাগিণীর অন্তরের ভাব প্রকাশ করে তার প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের গান, এমন কি বাংলা অন্য কিছু গানও যথেষ্ট ধনবান। শুদ্ধ ও কোমল স্বরের মিশ্রণে, কখনও তালমাত্রার ভগ্নাংশের প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের গান অসাধারণত্ব লাভ করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর অপরিমিত প্রতিভার স্ফুরণে, প্রতিবাদ করবার মত সহজাত স্পৃহায়। তিনি বলেছেন 'হিন্দুস্তানী গানকে আচারের শিকলে যাঁরা অচল করে বেঁধেছেন, সেই ডিক্টেটরদের আমি মানি নে। যাঁরা বলেন, ভারতীয় গানের বিরাট ভূমিকার উপরে, নব নব যুগের নব নব যে যে সৃষ্টি স্বপ্রকাশ, তার স্থান নেই। ঐখানে হাতকড়ি পরা বন্দীদের পুনঃ পুনঃ আবর্তনের অনতিক্রমনীয় চক্রপথ আছে মাত্র, এমনতরো নির্দোক্তি যাঁরা স্পর্ধাসহকারে ঘোষণা করে থাকেন, তাঁদেরই প্রতিবাদ করবার জন্যই আমার মত বিদ্রোহীদের জন্ম—সেই প্রতিবাদ ভিন্ন প্রণালীতে কীর্তনকাররাও করে গেছেন…[৩]।

৩ ধূর্জটিপ্রসাদকে মুখোপাধ্যায়কে লেখা পত্রাংশ, তাং ৭।১।৩৫

এতক্ষণে একটি বিষয় কিন্তু বেশ পরিষ্কার—জড়বৎ সঙ্গীত চর্চায় রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল না, আবার যাতে প্রাণসঞ্চার হয় না তাতেও তিনি সমান অনাগ্রহী ছিলেন। তাই হিন্দুস্তানী গানের তান-বিস্তার তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। সে গানের কোমল মাধুর্য এবং দেশবিদেশের জনসঙ্গীতের বিভিন্ন উৎসধারার প্রতি সযত্ন মনোযোগে তাঁর গানের শরীর রচিত। সম্ভবত সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় তাঁর যে পারঙ্গম পারদর্শিতা, গানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারার রসসংমিশ্রণে তাঁর প্রতিভা উজ্জ্বলতর। সেটা এ কারণে যে তিনি পৃথিবীর সার্থকতম গীতিকবিতাকারদের একজন। সঙ্গীতের নিজস্বতার প্রতি তাঁর গভীর আস্থা থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তাঁর গান কিন্তু সুর ও বাণীর অভূতপূর্ব সংমিশ্রণে ধনী। কখনও সুরকে কথা অনুসরণ করেছে, কখনও বা কথা সুরকে। কথা ও সুরের এই দুর্লভ মেলবন্ধনে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশিষ্টতা লাভ করেছে যদিচ রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল, কবিতা সঙ্গীতের চেয়ে উন্নততর ভাবপ্রকাশের মাধ্যম। কারণটা উপলব্ধিগত। সুর ভাব প্রকাশ না করেও গুঞ্জরিত হতে পারে, কথাকে ভাবের আশ্রয় নিতেই হয়। ম্যাথিউ আরনল্ড্ সাহেব তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'Epilogue-to Lessing's...'-এ বলেছিলেন, ভাবশৃংখলের একটি অংশে অবস্থানই সঙ্গীত। অর্থাৎ কোনও বিষয় মানুষের অনুভাবনায় একরাশ আবেগতাড়িত ভাব এনে দেয়। তার একটি অংশকেই সঙ্গীত (তিনি পেইন্টিংয়ের কথাও বলেছেন) প্রকাশ করতে সক্ষম। চলনশীল অনুভাবনা সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া কঠিন। রবীন্দ্রনাথ ওঁর সাথে সহমত পোষণ করলেও বলেছিলেন, প্রাপ্তমনস্ক সঙ্গীতের মাধ্যমে চলমান অনুভাবনা সমূহও প্রকাশিত হতে পারে।

দেখা যাচ্ছে সঙ্গীতের তত্ত্বগত দিক নিয়ে কবির চিন্তাভাবনা স্বচ্ছ ছিল। প্রথাগত জড়তার যে হিন্দুস্তানী সঙ্গীত শ্রোতৃসকাশে বন্দিত, তার বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁর নবরূপায়নেও তিনি পিছিয়ে যাননি। ব্যাকরণগত শুদ্ধতার প্রতি তিনি বীতস্পৃহ ছিলেন, কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কি গানের ক্ষেত্রে তিনি সৃষ্টির অনাবিল আনন্দকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাতে তথাকথিত শুদ্ধতা ব্যাপারটি অনেক সময়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। পণ্ডিতকুল চেঁচামেচি করছেন বিস্তর। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির পথ কণ্টকাকীর্ণ যতই হয়ে থাকুক, উত্তরকালে তা' খুবই সমাদৃত হয়েছে।

এখানেই এসে পড়ে অমোঘ প্রশ্নটি: শিল্পীর স্বাধীনতা। অবশ্য স্রষ্টার

যে স্বাধীনতা, সেটি শিল্পীমাত্রেই দাবি করতে পারেন না। দু'জাতের শিল্পী আছেন, এক দল সৃষ্টি করেন, অপর দলটি তার সনিষ্ঠ চর্চা করে তাকে বহমান রাখেন। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত সৃষ্টির সময় যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন, পরীক্ষা নিরীক্ষার নানান্ স্তর অতিক্রম করে তাঁর গান একটি রূপ পরিগ্রহ করেছে। শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে, আমরা আগেই দেখেছি, 'ডিক্টেটরশিপ'কে তাঁর ঘোরতর অপছন্দ ছিল। নিজেকে তিনি বিদ্রোহীও বলেছেন। কিন্তু নিজের গানের ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতা বিষয়ে তাঁর বেশ দ্বিধা ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর গানের মেজাজ ও স্বকীয়তা বিষয়ে তিনি কোনও আপোষ করতে চাননি। ব্যাপারটি বিসদৃশ লাগা স্বাভাবিক। একজন মহৎ শিল্পী অনপনেয় গণ্ডীবদ্ধতায় তাঁর সৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখতে চান না। রবীন্দ্রনাথ কেন চেয়েছিলেন তা' বুঝতে না পারার কথা নয়, তাঁর গানের গায়কীর বিশুদ্ধতা বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সূক্ষানুভূতিপ্রবণ ছিলেন। সৃষ্টির অমর্যাদায় স্রষ্টা ব্যথিত না হয়ে পারেন না। কিন্তু সেই আশংকাবদ্ধ হয়ে শিল্পীর স্বাধীনতায় সীমারেখা টেনে দেওয়াও যুক্তিভাত হয় না। হয় না একারণেই যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথ নিজে নিয়েছেন, উত্তরসূরীদের তা' থেকে বঞ্চিত করার অর্থ একটি সাঙ্গীতিক সৃষ্টি ভাণ্ডারকে স্ট্যাটিক্ করে তোলা।

তত্ত্বগত দিক থেকে দেখতে গেলে এটা ঠিক যে পরীক্ষার রাস্তা সদাই খোলা রাখতে হয়। স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিলে যে সৃষ্টির গুণগত অবনমন কিংবা সমূল বিনাশ ঘটবে, এমনটি ধারণা করে নিলে বিকাশশীলতাকে অস্বীকার করা হয়। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবীভাবে রচয়িতার অনুভূতিটাই প্রামাণিক বলে প্রতিভাত হয়ে থাকে। গণ্ডীর অনপনেয়তা সেক্ষেত্রে দুটি সমস্যার সৃষ্টি করবে—এক, শিল্পী যাঁরা পরবর্তীকালে সঙ্গীত চর্চা বা পরিবেশন করবেন তাঁদের প্রত্যেককে স্রষ্টার অনুভূতির সেই স্তরে পেঁছুতে হবে। সামান্য হের-ফেরও সেক্ষেত্রে বিচ্যুতি বলে গণ্য হবে হবে। এবং এও সত্য যে এ ধরনের বিচ্যুতি ঘটতে থাকাটাই স্বাভাবিক, কারণ অনুভূতি বিষয়টি কখনও কোনও অবস্থাতেই এত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। মানসিক গঠন যেহেতু এক ছাঁচে ঢালা নয়, সেহেতু অনুভূতির প্রক্রিয়া লোকবিশেষে ভিন্নতর হতে বাধ্য—তাই তত্ত্ব হিসেবে এটিই ঠিক যে সাঙ্গীতিক কোনো সৃষ্টি পরবর্তীকালে অবিকৃত অবস্থায় পরিবেশিত হতে পারে না, পারফেকশনের কাছাকাছি যেতে পারে মাত্র। সেটিও নির্ভর করে গায়কের স্টাইলের ওপর। স্বরের অনুকম্পন

শব্দবিজ্ঞান অনুযায়ী। যন্ত্রে নিখুঁত হওয়া সম্ভব, কণ্ঠে তা' চেষ্টা করার পর্যায়েই এখনও আছে। এই অনুকম্পন বিষয়টিকে পাশ্চাত্য সংগীতে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে অনেক বেশি—ফলত তাঁদের লোকপ্রিয় সংগীতে স্বরক্ষেপণ অনেক বিজ্ঞানসম্মত—কখনও তীক্ষ্ন, কখনও তীব্র, কখনও বা জাজ্‌-প্রধান। স্বাভাবিকভাবেই অনুকম্পনের ব্যত্যয় ঘটে ওঠে কম। আমাদের ট্র্যাডিশন্যাল গানও রেখাশ্রয়ী নয়, তাই মার্গীয় সংগীতে শিল্পীর তান বিস্তারের কালোয়াতি জনে জনে পাল্টায়, অথচ প্রত্যেকটিই রসসৃষ্টিতে সফল। এটিও সত্য যে সংগীতের ধারায় সব শিল্পীই অল্পবিস্তর স্বাধীনতা চিরকালই পেয়ে এসেছেন।

অনিবার্য দ্বিতীয় সমস্যাটি হল ম্যানারাইজড্‌ হয়ে পড়া। এই ম্যানারাইজেশন কিন্তু অন্য এক সমস্যারও জন্ম দেয়, সেটি হচ্ছে বিকৃতি—কি উচ্চারণে, কি সুরক্ষেপণে। যেহেতু বাঁধা ছকে গাইতে হবে গান, শিল্পী তখন গিমিকের আশ্রয় নিতে বাধ্য। বেতার রেকর্ড কিংবা অন্যান্য অনুষ্ঠানে আমরা প্রায়শই শুনে আসছি মড্যুলেশনের হেরফের ঘটিয়ে গান 'জমিয়ে' তোলার চেষ্টা—ক্ষেত্রবিশেষে তাই ভাবপ্রকাশ বলে অভিহিত হয়ে যাচ্ছে। বাঁধা ছকে গাওয়ার বিড়ম্বনা সেখানেই, শিল্পীর পথে তাতে প্রাণসঞ্চার করা বেশ কঠিন। যে স্বরলিপি ভরসা, তার ঘনিষ্ঠ চর্চায় সুরের কাঠামোটি শুধু পাওয়া সম্ভব, অনুভূতির তো কোনও স্বরলিপি হয় না। তাই ম্যানারাইজ্‌ড্‌ হয়ে যাওয়া, কারণ গায়কী ও গুরু বিশেষে আলাদা—এবং গুরু ছাড়া যে গানই শেখা হয়ে ওঠে না। তানসেন, গোপাল নায়কদের গান বীঠোফেন, মোৎসার্ট, হপ্‌নার, ব্রাহমস্‌, চাইকোভস্কি—জগদ্বিখ্যাত এসব সংগীতকারদের কনসার্ট নাম্বার পরবর্তীকালে অনেক নবীন শিল্পী পেয়েছেন ও বাজিয়েছেন, স্বাধীনতায় নিয়েছেন, কিন্তু মূল স্রষ্টাদের চিনে নিতে অসুবিধা হয় নি, বরং সৃষ্টির বিকাশই ঘটেছে। সাহিত্যের সঙ্গে সংগীতের পার্থক্য বিষয়ে আনাতোল ফ্রাঁসের উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে। ওঁর মতে, প্রত্যেক সুকুমার সাহিত্যের একটা মস্ত মহিমা এই যে প্রতি পাঠক তার চরিত্রাবলীর মধ্যে নিজেকেই দেখে। সংগীতে সেরকম নিজেকে প্রতিবিম্বিত হতে দেখার সুযোগ প্রায় নেই-ই। সংগীতের ভাল না লাগার ব্যাপারটা আসলে আরো সংস্কারসানুভূতির ওপর নির্ভরশীল, কেন না শিক্ষিত-অশিক্ষিত বৃদ্ধযুবা নির্বিশেষে সংগীতের আকর্ষণ সমান, ফলত অন্তর্জাত অনুভূতির ওপরেই এর ভাল লাগা না লাগাটা নির্ভরশীল, মননশীলতার ওপর আদৌ নয়।

এবং এই মননশীলতাই রবীন্দ্রসংগীতের বিশিষ্টতা বলে যাঁরা দাবী করছেন,

তাঁরাই এই অপরূপ সৃষ্টি ভান্ডারকে কুক্ষিগত করে এটিকে এলিটীয় কালচারে পরিণত করতে চাইছেন। স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এঁরাই সোচ্চার বেশি—কেন না তাতে করে আসল জারিজুরি প্রকাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা, আসনটি টলোমলো হোক্ কেই বা চান! আমরা এ প্রসঙ্গে দিলীপকুমার রায় ও রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনটি[৪] মনে রাখতে পারি। দু'জনেই রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিল্পীর স্বাধীনতা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সহমত পোষণ করেছিলেন যে, যে-ভাবেই গাওয়া হোক্ না, সত্যাসত্য যাচাইয়ের কষ্টিপাথর হচ্ছে আনন্দের গভীরতা ও স্থায়িত্ব।

রবীন্দ্রনাথকে[৫] শেষ পর্যন্ত দেখি শিল্পীর স্বাধীনতা বিষয়ে ঔদার্য প্রকাশ করতে। সৌষ্ঠব জ্ঞানসম্পন্ন গুণী শিল্পীদের অনেকটাই স্বাধীনতা দিতে তিনি স্বীকৃত হয়েছিলেন। তবুও তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল তাঁর গানে ফাঁক নেই, যা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে আছে, আছে এ জন্যই যে তা' কোনও একক স্রষ্টার কীর্তি নয়, শ্রুতির মাধ্যমেই এর পুষ্টি এবং বিস্তার। তাই ফাঁকও যথেষ্ট। শিল্পীর পথে স্বাধীনতাবিহারে তাই অসুবিধা ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান সতেজ, ঋজু তার কাঠামো এবং বিন্যাসটিও যথেষ্ট শক্ত বুনিয়াদের ওপরে পরিপাটী যত্নে আহরিত। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতা প্রসঙ্গে কবিবর দ্বিধাবোধ করেছেন। এও সত্য গুণী শিল্পীকে যথার্থ স্বাধীনতা দিতে তাঁর আপত্তি ছিল না।

কিন্তু তাঁর এবংবিধ আপত্তি এবং যন্ত্রানুষঙ্গে ঘোরতর অনীহা—এসব কথা ইচ্ছাকৃত ভাবেই কুপ্রচারিত হয়ে থাকে—যাঁরা করেন, তাঁরা সবাই যশস্বী—কেউ সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্রের পোষ্য সম্পাদক, কেউ বিশ্বভারতীর ভাগ্যনিয়ন্তা। রবীন্দ্রসংগীতের অজেয় দুরন্ত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের রেকর্ড করা বন্ধ করে দেন এঁরা অবলীলায়—বিন্দুমাত্র অনুতাপহীনতায়, এঁরাই আবার আশা ভোঁসলেকে ডেকে বোম্বাইয়া কায়দায় শ্রুতিসুখকর রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করান—উচ্চারণে একশ একটা বিকৃতি নিয়েও তা' বিশ্বভারতীর সীলমোহর পেয়ে যায়।

যন্ত্রসঙ্গীত ব্যবহার নিয়েও রবীন্দ্রসংগীতের অনেক বিশেষজ্ঞের আপত্তি

৪ সাল ১৯২৫, ২৫ মার্চ, রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপ কুমার রায়ের আলোচনা

৫ ঐ

শোনা যায়। কেন না ব্যাপারটি বিদেশী এবং যন্ত্রসঙ্গীতের পরিমিত ও সুদক্ষ ব্যবহার স্বরসংগতি বা হারমনির সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ সম্বন্ধে বলেছেন, 'হারমনি য়ুরোপীয় সংগীতে ব্যবহার হয় বলিয়াই যদি একান্ত-ভাবে য়ুরোপীয় বলিতে হয়, তবে এ কথাও বলিতে হয়, যে দেহতত্ত্ব অনুসারে য়ুরোপে অস্ত্র চিকিৎসা চলে সেটা য়ুরোপীয়, অতএব বাঙালীর দেহে ওটা চালাইতে গেলে ভুল হইবে। হারমনি যদি দেশ-বিশেষের সংস্কারগত কৃত্রিম সৃষ্টি হইত, তবে তো কথাই ছিল না—এটা সত্য বস্তু, ইহার সম্বন্ধে দেশ কালের নিষেধ নাই। ইহার অভাবে আমাদের সংগীতে যে অসম্পূর্ণতা সেটা যদি অস্বীকার করি তবে তাহাতে কেবলমাত্র কন্ঠের জোর বা দম্ভের জোর প্রকাশ পাইবে'।[৬]

আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞবৃন্দ এসব যে জানেন না, এমন নিশ্চয়ই নয়। তবু গীটার, ম্যাণ্ডোলীন, ভায়োলিন, একরডিয়ান, ব্রাশড্রামের আওয়াজ হলেই ওঁরা কেমন সশংকিত হয়ে ওঠেন, নিবন্ধীকৃত তালিকা থেকে রেশনের দোকানের মত নাম কাটতে শুরু করেন। দিলীপ কুমার রায় কবিগুরুকে তাঁরই গান রায়বাহাদুর সুরেন মজুমদারের কন্ঠে শুনতে অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন, কেন শ্রীযুক্ত রায় রবীন্দ্রনাথের গানেও শিল্পীর স্বাধীনতা চান। হুবহু গাইবার মধ্যে প্রেরণা সঞ্জীবিত হবার কোনও ব্যাপারই নেই—নকল-নবীশতা নিশ্চয়ই কোনও মহৎ সৃষ্টির কাম্য হতে পারেনা, একই আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে আর যাই হোক, মহৎ সৃষ্টিকে সম্মান জ্ঞাপন করা হয় না।

সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবির জন্য যেক'টি রবীন্দ্রকাহিনী বেছে নিয়েছেন, নিজের প্রত্যয় এবং বিশ্বাস অনুযায়ী তার পরিবর্ধন, পরিমার্জন এমন কি পরিবর্তনও করেছেন। গেল গেল রবটা তত মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে নি—'নষ্টনীড়' ছোটগল্পের অনেক পরিবর্তিত সংযোজিত রূপ আমরা দেখি 'চারুলতা' ছবিতে—ছবিটি বিশ্বজয়ী। প্রশ্নটা তাই এসেই যায়, যদি এক্ষেত্রে অমোঘ বিধান থাকত অপরিবর্তনের, পৃথিবীবাসী কি বঞ্চিত হতেন না একটি শিল্পসৃষ্টি থেকে? মাধ্যমটি আলাদা হলেও গানের ক্ষেত্রে একথাটি খাটবে। ইংলন্ডের ব্রডওয়ে থিয়েটারে খোদ শেক্সপীয়রের নাটকের ওপর নানান্ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে—উৎসাহের বন্যা বয়ে যাচ্ছে আমাদের এখানেও বিদেশী নাটকের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে, যত গণ্ডিবদ্ধতা এই গানের*

৬ দিলীপ কুমার রায় ও কবিগুরুর আলোচনা, ২৫ মার্চ, ১৯২৫

বেলায়। মননশীলতার দোহাই পেড়ে একদল রবীন্দ্রসংগীতকে কুক্ষিগত করে ফেলতে চাইছেন—এই চাওয়াটা খুব মারাত্মক। কেন না রবীন্দ্রসংগীত এখনও যথেষ্ট জনপ্রিয় নয়; হতে যে পারছে না, তার কারণ এই ফিউডাল মনোভঙ্গী। চোখবুঁজে মাথা দুলিয়ে যাঁরা রবীন্দ্রসংগীতের স্বকীয়তা বিষয়ে ভীষণভাবে চিন্তা করছেন, তাঁদের জন্য এসে যাচ্ছেন আশা ভোঁসলে রুণা লায়লারা দ্রুত গানের ক্ষেত্রে। একটি পরিমণ্ডলও সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, ব্যবসায়িক পরিমন্ডল। অমুকের আবহ, তমুকের গান আর এর-ওর জোড়া-তালি নাচ—কোলকাতার অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে ঘনঘন এমনতরো রবীন্দ্র নৃত্য-সংগীতের ছড়াছড়ি; পেশাদারী মনোভাব এতই প্রকট সেখানে যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়িও চলছে অবাধে—এর ওর-নামে। পক্ষপাত, অনুগ্রহ—রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রেও এর কোন পার্থক্য ঘটে নি। এরকম রবীন্দ্র-সংগীত সাধকদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথেরই বাণী স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে—'সংস্কৃতিবান্ মানুষ নিজের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু নিজেকে হেয় করতে পারে না।'[৭]

এই আলোচনায় আমরা দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের স্বাধীন চর্চার বিপক্ষে ততটা সোচ্চার নন, যতটা প্রচারিত হয়ে থাকে। স্রষ্টা মাত্রেরই তাঁর সৃষ্টির স্বপ্রকাশ বিষয়ে কিঞ্চিৎ দুর্বলতা থাকে—সেটুকু, হয়ত বা আরেকটু বেশিই দুর্বলতা তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি নিজেই যদি আদর্শ হন, তাহলে তাঁর গানের বেলায় স্বাধীনতা নিতে আপত্তি ওঠার কোনও সংগত কারণ দেখা মুস্কিল। অবশ্যই দিলীপ কুমার রায়[৮] যে extreme সিদ্ধান্ত (পুরো নতুন সুরে গাইলেও ক্ষতি কি?) নিয়েছিলেন, ততটা নয়, অবশ্যই নয়,—তবুও যখন হার্মনাইজেশনকে স্বয়ং স্রষ্টা স্বীকৃতি দিয়েছেন, তখন তাঁর সংগীতে স্বাধীনতাও খানিকটা দিয়েছেন, এটা স্বীকার করতে হয়। এখানেই উত্তরসূরীদের সাংগীতিক কল্পনা বা চেতনার আসল পরীক্ষা। ইণ্টারল্যুড, প্রিল্যুড মিউজিক সংস্থাপনায় যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি এই 'হার্মনি' সৃষ্টিতে—যন্ত্র, কথা এবং সুরের ত্রিসংগমের মোহনায় রবীন্দ্রসংগীত নিশ্চয়ই নতুনতর পথের বাঁক খুঁজে পাবে। তার স্রষ্টার ইচ্ছানুযায়ীই—কারণ তাঁর দৃঢ় অভিমত ছিল, "পরম্পরাগত সংগীতরীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের প্রত্যয় সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে। কবিতাতে যেমন ছন্দের

৭ শিক্ষা ও সংস্কৃতি শীর্ষক প্রবন্ধ ৮ কথোপকথন, ১৯২৫, ২৫ মার্চ

রীতি আছে, সে রীতি কোনো বড় কবি নিখুঁতভাবে বাঁচিয়ে চলেন না—নিয়মের উপরে কর্তৃত্ব করেন, নিয়মকে স্বীকার করেই।"[৯]

কাজেই ভাবের দোহাই পেরে গান গাওয়াকে ঐশ্বরিক 'নিবেদন' পর্যায়ে না ফেলে বাস্তবানুগ পদ্ধতিতে রবীন্দ্রসংগীতের অনুশীলনই জনসাধারণ্যে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সহায়ক। রবীন্দ্রসংগীতের নামে আধো আধো বিলাসী উচ্চারণে দীর্ঘসূত্রতাযুক্ত সুর সঞ্চার ও স্বরক্ষেপণ কখনই বাঞ্ছিত রসসৃষ্টি করতে পারে না। যুগোপযোগী করে তুলে মহৎ যে কোনও সৃষ্টিকে আরো বেশি করে সাধারণ মানুষের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার মধ্যে বিশুদ্ধতার ছুৎমার্গীয় আবরণটি না থাকাই ভাল। রবীন্দ্রনাথ দিলীপ কুমার রায়কে বলেছিলেন[১০] 'অন্ধ অনুকরণ দোষের, কিন্তু স্বীকরণ নয়।' প্রসংগটি ছিল, গায়কের সুরবিহারের স্বাধীনতা (improvisation)। দিলীপ কুমার রায়ের উক্তিটিও[১১] এ প্রসংগে প্রণিধানযোগ্য, 'সত্যকার শিল্পী একটা সহজ সৌষ্ঠবজ্ঞান ও সংযমজ্ঞান নিয়ে জন্মান'। কাজেই উত্তর কালের সেই সব শিল্পীদের পরাধীন করে রাখার কোনও সার্থকতা নেই। এতে করে বিকৃতির আশংকা যেমন থেকে যায়, নতুন করে মহত্তর কিছু পাবার আশাও থাকে না।

'পণ্ডিতী স্পর্ধা'-র প্রতি কবিগুরু চিরকাল অনীহা পোষণ করে এসেছেন; তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল, 'আর্টে যে শ্রেষ্ঠ তা' অনুকরণজাত নয়। সেই সৃষ্টি আর্টিস্টের সংস্কৃতিবান মনের স্বকীয় প্রেরণা হতে উদ্ভূত', তাই শুদ্ধতার বাতাবরণ দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যাঁরা নিজেদের অভিসন্ধি পূরণের কাজে লাগাচ্ছেন, তাঁদের সমর্থন করা রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বার্থে উচিত কাজ নয়। ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ সিনেট হাউসে বক্তৃতায় বলেছিলেন'…এই যে গতানুগতিকতা, এটা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। সকল রকম প্রকাশের মধ্যে যুগের প্রকাশ, আত্মপ্রকাশ হওয়া চাই।' এ যুগের প্রকাশ কি আমরা দেখি আদৌ,—এই যে এখন যেভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করা হয়ে থাকে? কেমন কৃত্রিম এক গম্ভীর পরিমণ্ডল সৃষ্টির চেষ্টায় ব্যস্ত শিল্পীকুল। তাই তাঁর গানের বিদ্রোহের সুর উপেক্ষিত থেকে যায়, পূজার ডালি হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে পূর্ণ! প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের মত গানেও প্রায়শই

৯ 'পত্রাংশ' ধূর্জটি প্রসাদকে লিখিত।

১০ কথোপকথন / দিলীপ কুমার রায় ও কবিগুরু

১১ ঐ

অনুল্লেখিত থেকে যান। অথচ ঐটাই ছিল যুগোপযোগী গান—তাঁর সে সব গানও আছে বিস্তর—শুধু চয়নের অপেক্ষায় তারা প্রহর গুনে যায়। কবির ইচ্ছাকে তাঁরই তথাকথিত উত্তরসুরীবৃন্দ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছেন—এতে নিশ্চিত ভাবে কাজ করে শাসককুলের অঙ্গুলি হেলন। কেননা প্রতিবাদী রবীন্দ্রসঙ্গীত সমস্যার মূলে আঘাত হানুক, এ তাঁদের অভিপ্রেত নয়, তাই সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র রবীন্দ্রনাথের প্রেমপূজার গানকে যতটা প্রাধান্য দেন, তার ভগ্নাংশও দেন না তাঁর প্রতিবাদী গানকে, অথচ রবীন্দ্রনাথ জনসঙ্গীতের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

য়ুরোপীয় সঙ্গীতের বিচিত্রতা, প্রাচুর্য, গতিচাঞ্চল্য, হরেক রকমফের ও রোমান্টিকতা রবীন্দ্রনাথকে আপ্লুত করেছিল। হার্বার্ট স্পেনসরের স্মরণীয় উক্তিটিকেও তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন: কথায় হৃদয়াবেগ থাকলে সুর না এসে পারে না। এসব মিলে আমরা দেখি আধুনিক বাংলা গানের জনক রবীন্দ্রনাথই, কি তত্ত্বগত দিক থেকে, কি ব্যবহারিক প্রয়োগের বিষয়ে। মধ্যবিত্তদের জন্য তাঁর গান ক্রমশই আদর্শ হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে, কেন না এতে গ্রামীণতা তেমনটি নেই তেমন নেই উচ্চ অঙ্গের বাগোয়াতি। এই যে মধ্যবিত্তাশ্রয়ী হয়ে পড়া, এর বিপদ আছে বিলক্ষণ, সিনিসিজিম এবং অস্বচ্ছ প্রাজ্ঞতার আবরণে রবীন্দ্রসংগীত ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, তাঁর ভাষায় 'পণ্ডিতী স্পর্ধা।' তিনি ঘোষণা করেছিলেন,—'সঙ্গীতে আমি নির্মমভাবে আধুনিক, অর্থাৎ জাত বাঁচিয়ে আচার মেনে চলিনে…'।

কাজেই আইন নয়, প্রথাসিদ্ধতায় নয়, যুগোপযোগী সনিষ্ঠ চর্চায় যোগ্য শিল্পীকুলের আবির্ভাবে রবীন্দ্রনাথের গানের যথার্থ বিকাশ ঘটবে—বিকাশ অর্থে একে সত্যিকারের জনপ্রিয় হতে হবে,—সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে। উদ্দীপনা উৎসাহ দেশপ্রেম বিশ্বজনীনতায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের অভাব নেই। তার প্রচার চাই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন[১২] 'গান বচনের অতীত বলেই ওর অনির্বচনীয়তা আপন মহিমায় আপনি বিরাজ করতে পারে যদি তার মধ্যে থাকে আইনের চেয়ে বড়ো আইন।' তাঁরই আকাঙ্খিত এই বলিষ্ঠ প্রাণসঞ্চারী গতিময়তা এখনই প্রয়োজন তাঁর গানের সনিষ্ঠ বিকাশে। তা না হলে আমরা সকলেই হয়ত একদিন ধূর্জটি প্রসাদের মত কোলকাতা ক' এর সাতটা পঁয়তাল্লিশের বেতার অনুষ্ঠান শুনতে চাইব না।

১২ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা পত্রাংশ তাং ১৪/২/৩৯

চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ

"উপকরণের বিশেষত্ব অনুসারে কলারূপের বিশেষত্ব ঘটে। আমার বিশ্বাস ছায়াচিত্রকে অবলম্বন করে যে নতুন কলারূপের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যায় এখনো তা দেখা দেয় নি। রাষ্ট্রতন্ত্রে স্বাতন্ত্র্যের সাধনা, কলাতন্ত্রেও তাই। আপন সৃষ্ট জগতে আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রত্যেক কলা বিদ্যার লক্ষ্য। নইলে তার আত্মমর্যাদার অভাবে আত্মপ্রকাশ ম্লান হয়। ছায়াচিত্র এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে—তার কারণ কোন রূপকার আপন প্রতিভার বলে তাকে এই দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে পারে নি। করা কঠিন, কারণ কাব্যে বা চিত্রে বা সঙ্গীতে উপকরণ দুর্মূল্য নয়। ছায়াচিত্রের আয়োজন আর্থিক মূলধনের অপেক্ষা রাখে, শুধু সৃষ্টি শক্তির নয়।

"ছায়াচিত্রের প্রধান জিনিসটা হচ্ছে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ। এই চলমান রূপের

সৌন্দর্য বা মহিমা এমন করে পরিস্ফুট করা উচিত যা কোন বাক্যের সাহায্য ব্যতীত আপনাকে সম্পূর্ণ সার্থক করতে পারে। তার নিজের ভাষার মাথার উপরে আর একটা ভাষা কেবলি চোখে আঙুল দিয়ে মানে বুঝিয়ে যদি দেয় তবে সেটাতে তার পঙ্গুতা প্রকাশ পায়। সুরের চলমান ধারায় সংগীত যেমন বিনা বাক্যেই আপন মাহাত্ম্য লাভ করতে পারে তেমনি রূপের চলৎপ্রবাহ কেন একটি স্বতন্ত্র রস সৃষ্টি রূপে উন্মেষিত হবে না? হয় না যে সে কেবল সৃষ্টিকর্তার অভাবে—এবং অলসচিত্ত জনসাধারণের মূঢ়তায়। তারা আনন্দ পাবার অধিকারী নয় বলেই চমক পাবার নেশায় ডোবে।[১]"

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে চলচ্চিত্র মাধ্যম সম্পর্কে যিনি এই বক্তব্য রাখতে পেরেছিলেন অনায়াসে এবং কোনও চলচ্চিত্র-গৃহের নামকরণ করতে পেরেছিলেন 'রূপবাণী' তখন তাঁর সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলের টুপিতে আরেকটি বিস্ময়কর পালক যুক্ত না হয়ে পারে না। শিল্পমাধ্যম হতে গেলে তাকে স্বসম্পূর্ণ এক ভিন্নতর রুচি ও আস্বাদনের ঘেরাটোপে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে, রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনার মৌলিকত্ব এই সংবেদনে। সময়ের ব্যবধান বড় কম নয়, এবং যদি অনুন্নত পরিপ্রেক্ষিতের কথা ভাবি, তাহলে তাঁর গভীর চলচ্চিত্রবোধ অনাবিল বিস্ময় উদ্রেককারীই শুধু হয়ে ওঠে না, যে পরিপূর্ণ ও গভীর মননশীলতার বৈদগ্ধ্যে রবীন্দ্রনাথ ভাস্বর. কিছু কম হলেও চলচ্চিত্র বিষয়ে তাঁর অবধানতা মৌলিক চিন্তার পরিবাহী। মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র তাঁর জীবদ্দশায় তেমন পরিপুষ্টি লাভ করে নি, তবুও তিনি কিন্তু চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা সন্ধানের পরামর্শ দিতে ভোলেন নি। তাঁর সময়ে কিছু ছবি তৈরী হয়েছিল—তাঁর মৃত্যুর পরে বিস্তর ছবি তৈরী হয়েছে তাঁর কাহিনী, এমনকি কবিতাকে কেন্দ্র করেও। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে বিশ্বের কনিষ্ঠতম এবং অন্যতম প্রভাবশালী গণমাধ্যম চলচ্চিত্র ব্যস্ত থেকেছে বেশ কিছু কাল—থাকবেও আরও বেশ কিছুদিন।

চলচ্চিত্র ঃ তাঁর জীবদ্দশায়

রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্র সম্বন্ধে আকৃষ্ট হন সোভিয়েত দেশ সফরকালে। যে গভীর মননশীলতা তাঁর শিল্পভাবনার সংবেদ, যে ন্যায়মুখীনতা তাঁর মনন-

১ মুরারি ভাদুড়িকে লেখা কবির চিঠির অংশবিশেষ ঃ ২৬ নভেম্বর, ১৯২৯। প্রসঙ্গত, মুরারি হলেন শিশির ভাদুড়ির কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

শীলতার ভিত্তিভূমি, তাঁর চলচ্চিত্র ভাবনা তাতে আরেকটি মাত্রা সংযোজন করেছিল নিঃসন্দেহে। স্বদেশের নরেশ মিত্র-মধু বসু-শিশির ভাদুড়ি প্রমুখ সেই ভাবনা জাগ্রত করতে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণতা এনে দিয়েছিলেন সের্গেই আইজেনস্টাইন। বস্তুত, সোভিয়েত সফরকালেই চলচ্চিত্র মাধ্যম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে উৎসাহী হয়ে পড়েছিলেন। মাধ্যমটি যে ব্যাপক প্রভাবশালী তা আইজেনস্টাইনের' 'ব্যাটলশিপ পোটেমকীন' ও 'জেনারেল লাইন' ছবি দু'টি দেখে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। সিনেমা দেখার ব্যাপারে তাঁর একধরনের অনাগ্রহ ছিল। কিন্তু সের্গেই-র ছবি দু'টি দেখে তিনি সিনেমা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। 'ব্যাটেলশিপ পটেমকীন' ছবিটি দেখার সময়ে আইজেনস্টাইনজায়া মাদাম পেরু্য কবির পাশে বসেছিলেন। জীবনের অন্যতম উল্লেখনীয় এই ঘটনা স্মরণ করে মাদাম পেরু্য লিখেছিলেন, জাহাজে যখন বিদ্রোহ শুরু হয়, তখন কবি অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে-ছিলেন। তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন চাপা থাকে নি ঐ বিদ্রোহী নাবিকদের প্রতি। সোভিয়েত সিনেমাপত্রিকা 'সিনেমা রিভিয়্যু' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্রের বাস্তবতা ও শিল্প আঙ্গিকের সমীকরণ দেখে অভিভূত হলেন এত-টাই যে তিনি এর ভাষা সন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। শিল্প মাধ্যম মাত্রেই মৌলিকত্ব থাকবে, শিল্পবিচারের এই মানদন্ডটি যে কোনও শিল্প মূল্যায়নের শীর্ষ কথা।

১৯২২ সালে নরেশ মিত্র রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জন' নিয়ে নির্বাক ছবি করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ অনুমতিও পেলেন, কিন্তু ছবিটি জনপ্রিয়তা পায় নি, খুব রসোত্তীর্ণও হয়ে ওঠে নি। শিশির ভাদুড়ি ১৯২৮ সালে তাঁর 'বিচারক' কাহিনীকেন্দ্রিক যে ছবিটি করেন, অবশ্যই নির্বাক, তাও জনপ্রিয়তা ও শিল্প বিচারের নিরিখে তেমন সফল হয় নি, যদিও দুরন্ত অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক শিশির ভাদুড়ির অন্য একটি পরিচয় ছবিটিকে ইতিহাস করে তুলেছে —পরিচয়টি চিত্রপরিচালকের। মধু বসু ১৯৩০ সালে করলেন 'গিরিবালা'— সেই 'মানভঞ্জন' এর কাহিনী নিয়েই, এবং বলা চলে আবির্ভাবেই তাঁর জাত চিনিয়ে দিলেন। ছবিটি অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এটিও নির্বাক ছবি। সাফল্য মানুষকে উদ্দীপিত করে, মধু বসুকেও করল। চলচ্চিত্রে বিধৃত হল কবিগুরুর 'ডালিয়া'।

কবির জীবদ্দশায় আরও ছ'টি ছবি নির্মিত হয়েছিল। ১৯৩২ সালে 'নৌকা-ডুবি', 'নটীর পূজা' এবং 'বিসর্জন'। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'নটীর

পূজা' এ কারণে যে এ ছবির সংগীত পরিচালনা করেছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা নৃত্যে ও সঙ্গীতে অংশ নিয়ে ছবিটিকে ঐতিহাসিক করে তুলেছেন। ছবির কাজ চলার সময় রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে যেতেন বি. এন. সরকারের সঙ্গে। সরকারমশাই ছবিটির প্রযোজক ছিলেন, উপলক্ষ ঃ কবির সত্তরতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন।

১৯৩৮-এ 'গোরা' করলেন নরেশ মিত্র। ছবিটি রসোত্তীর্ণ কিনা এ নিয়ে সে সময়ে যথেষ্ট বিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছিল—এটা ঠিকই, ছবিটি কবিকে বিশেষ প্রীত করতে পারেনি। কিন্তু কাজী নজরুলের সংগীত পরিচালনা তাঁকে যথেষ্ট সন্তুষ্ট করেছিল। ছবিটির জনপ্রিয়তার উৎসও সেখানে। সতু সেনের পরিচালনায় 'চোখের বালি' এই বছরেই সাধারণ্যে প্রদর্শিত হয় এবং বলা চলে ত্রিকোণ প্রেমের জটিল মনস্তাত্ত্বিক উপস্থাপনায় সতু সেন ভাল সাফল্যই দেখিয়েছিলেন। অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের সুস্থিত আত্মপ্রকাশ ঘটে এ ছবিতে।

জীবদ্দশায় রবীন্দ্রকাহিনী অবলম্বনে দশটি পূর্ণ দৈর্ঘের চিত্র নির্মিত হয়েছিল। অনুমান করা অসংগত নয়, প্রতিটি ছবির ব্যাপারে কবির পরোক্ষ উৎসাহ ও প্রেরণা ছবির নির্মাতার পক্ষে বিস্তর আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু চলচ্চিত্রের স্বধর্ম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ দেশীয় চলচ্চিত্রকারদের চিত্রভাবনায় খুব খুশি হতে পারেন নি। তাই ধীরেন গাঙ্গুলীর সাহচর্যে তিনি তাঁর 'তপতী' নাটকের চিত্রনাট্য করেছিলেন ১৯২৯ সালে। বৃটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কোম্পানী ছিলেন প্রযোজক। শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন শুটিং-য়ের পর ছবিটি অজানিত কোনও কারণে বন্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথসহ ঠাকুর পরিবারের অনেকেরই ছবিটিতে অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। সংরক্ষণের অভাবে চিত্রনাট্যটি বিনষ্ট হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্র সম্পর্কিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হিসেবে ইদানীং যে ইংরাজী চিত্র-আখ্যানটি সমাদৃত হচ্ছে, তা' হল তাঁর 'The Child' (১৯৩০)। সেটি পরে বাংলা গদ্য কবিতায় অসামান্যতা লাভ করেছে 'শিশুতীর্থ' কবিতায়। এটা ঠিক, কবিতা কিংবা সাহিত্যের অন্য শাখায় চিত্রধর্মিতা একটি প্রধান বিশিষ্টতা হিসেবে আলোচিত হয়ে আসছে। মহাকাব্যিক ধারায় তো' বটেই, সাহিত্যের আধুনিকতম পাঠেও চিত্রার্পিত বর্ণনা আদৌ দুর্লভ নয়। কবির কলম সেখানে ক্যামেরার কাজ করে। রবীন্দ্রনাথের 'The Child'-কে তাই স্বসম্পূর্ণ চিত্রনাট্য বলতে কারও আপত্তি থাকলেও, এর আঙ্গিক ও ফোটোগ্রাফিক

দৃশ্যময়তা অবশ্যই মৌলিক, যদিও এটিই প্রথম ভারতীয় মৌলিক চিত্রনাট্য হিসেবে কোনও কোনও গ্রন্থকারের দাবি মেনে ওঠা যায় না। 'The Child'-এর মধ্যে স্বসম্পূর্ণ চিত্রনাট্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল, একথা বরং বলা ভাল। এরও এক বছর আগে ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তপতী' নাটকের চিত্রনাট্যরূপ দিয়েছিলেন। কবিতা হিসেবে তো' বটেই, নৃত্যনাট্যরূপেও 'শিশুতীর্থ' আমাদের কাছে সুপরিচিত। কিন্তু কবিতাটির প্রেরণার উৎস আসলে সেই 'The Child' যেটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন জর্মনের ম্যুনিখের কাছে একটি গ্রামীণ পরিপ্রেক্ষিতে। ১৯৩০ সালে ম্যুনিখ সফর কালে রবীন্দ্রনাথ 'প্যাশান প্লে' নামক একটি সুদীর্ঘ নাটক দেখেন, যার বিষয়বস্তু ছিল যীশুর জীবনের শেষ অধ্যায়। এই নাটকটি 'The Child' সৃষ্টির অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। জর্মনের বিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক UFA (Universum Film Aktiengesellschaft)-এর কর্তাব্যক্তিদের অনুরোধে ২৬ জুলাই, ১৯৩০ এ রবীন্দ্রনাথ 'The Child'-এর প্রথম খসড়া করেছিলেন। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা গেছে এর ছ'টি রূপান্তর আছে। প্রথমটি রচনার চারমাস পরেই ন্যু-ইয়র্কে কবি এটি আবৃত্তি করেন। এতেই প্রমাণিত, আসলে কবিতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ 'The Child' কে দেখতে চেয়েছিলেন ; একটি বিষয়ে আমরা তাই নিঃসংশয় : 'The Child' কবির প্রথম মৌলিক ইংরাজী কবিতা। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় 'The Child' এর ছ'টি লেখন-পুনর্লেখন যত্নসহকারে সংরক্ষিত আছে। প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ অংশ টাইপ করা, বাকি দু'টি হাতে লেখা। এর মধ্যে পঞ্চমটি কবির স্বহস্তলিখিত। কোনও রচনাতেই সময়কাল স্পষ্টভাবে উল্লেখিত নেই। ষষ্ঠ রচনাটি 'The Child' শিরোনামে কবির পূর্ণ আস্থা ও সন্তুষ্টি নিয়ে প্রকাশিত হয়। প্রথম লেখা দু'টি শিরোনামবিহীন, তৃতীয়টির শিরোনাম ছিল 'He is eternal, he is newly born,' চতুর্থটির 'The Newcomer' এবং পঞ্চমটির 'The Babe'.

সাম্প্রতিক এক বিশ্লেষণে শ্রীমতী সুতপা ভট্টাচার্য[২] বলেছেন '···The Child লেখা হয়েছিল ফিল্ম-এ গ্রহণযোগ্য রচনার ফরমাসে। মাথায় চলচ্চিত্র ভাবনা ছিল বলেই হয়ত যা বর্ণনার বিষয়, তাকেও ছবির পর ছবি দিয়েই ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। 'The Child'-এ স্পর্শাতীত সময়কে স্পর্শযোগ্য করে তুলতে

২ তাঁর প্রবন্ধ 'রাত কত হল', শারদীয় পরিচয় ১৩৮৭

চাইছেন দৃশ্যে আর শব্দে আর পরিমিত রচনায়।...'রেখার কবিতায়ন' যদি হয় তাঁর ছবি, তবে শিশুতীর্থ-এর এ অংশ তাঁর শব্দের চিত্রায়ণ।'

নিপীড়িত মানুষের মুক্তির যে প্রগতিবার্তা 'The Child' বা 'শিশুতীর্থে' বিধৃত, তা' শুধু যীশুর জীবনকেন্দ্রিক হয়ে ওঠেনি। 'প্যাশান প্লে' তাঁর অনুপ্রেরণা ছিল ঠিকই, কিন্তু বৃহত্তর পরিপার্শ্বে কবি যখন একে দাঁড় করান, তখন যীশু নন, বাংলা কবিতায় বুদ্ধদেবও নন,—নবজাতক সেই শিশুটিই আমাদের যাবতীয় সুখ ও আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়, 'আদিকাল থেকে মানব ইতিহাসের যাত্রা—নবজন্মের তীর্থে। বুদ্ধদেব একদিন শিশুরূপে দেখা দিয়েছিলেন, এনেছিলেন নবজন্ম। মানুষ তাকিয়ে আছে শিশুর দিকে।'[৩]

'The Child'-এ-ই কবির কন্ঠস্বর প্রথম বিধৃত করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন UFA প্রযোজকগোষ্ঠী। কবি এ ছবির জন্য গান ও আবৃত্তি করেছেন এবং ১৯৩১ সালে, কালীশ মুখোপাধ্যায়[৪] জানিয়েছেন, ছবিটি কলকাতায় প্রদর্শিত হয়েছিল। চলচ্চিত্রের সঙ্গে 'The Child'-এর প্রথম রচনাটির সম্পর্ক গভীরতম। সেটার প্রকাশক ছিলেন লণ্ডনের অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন কোং—এখন অবশ্য দুষ্প্রাপ্য। শিরোনামবিহীন 'The Child'-এর প্রথম রচনার অংশবিশেষ নীচে দেওয়া হল, যা বিষয়টিকে প্রাঞ্জলতর করবে বলে ধারণা রাখা যায়।

"They ask, what is the time ?
No answer comes.

The night is deep in the valley. The sky overcome by clouds. The things around are incongruous, they are a noise, the refuse of time's regrets and rejections, fruitless failures and reckless attempts—the bridge that is broken, the canal dry and gaping, the huts deserted, scattered bricks and rafters, the temple unfinished, tenanted by bats, trees uprooted and rotting, marble steps leading to blankness. Some manacine shadows here and

৩. রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড, ৪০৯-৪১০ পৃষ্ঠা, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৪. বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস, ১১৫ পৃষ্ঠা

they are darker than night ; are they cast by a meaningless life or some formless death ? The lurid red glow that waxes and wanes on the rim of horizon—is it a threat from neighbouring planet or an elemental hunger lacking the sky ?

The men gathered there are vague, like torn pages of an epic. While grouping in groups or single their torch light absurdly tattoos their faces producing pictures or frightfulness. A continual hum rises in air like bubbling hot volcanic mud, a mixture of sinister whispers, rumours and slanders of derision and growls. The maniacs suddenly strike their neighbours on suspicion and a bubble of indiscriminate fights bursts forth echoing from hill. The women weep and wail, they cry that their children are lost. While others are defiant in ribaldry, with raucous laughter and bare limbs unshrinkingly loud for they think that nothing matters."[৫]

চলচ্চিত্র : তাঁর মৃত্যুর পর

১৯৪৪-এ পশুপতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শেষ রক্ষা' নাটকটি নিয়ে একটি ফিল্ম তোলেন। কাহিনীটির মজা শেষ পর্যন্ত বিধৃত ছিল ছবিটিতে, কিন্তু একই কাহিনী নিয়ে শংকর ভট্টাচার্য ১৯৭৭-এ রসোত্তীর্ণ ছবি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অভিনয়, চলচ্চিত্র আঙ্গিক ও টেকনিকের উন্নতি, পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি—এসবের তুলনামূলক ব্যাপ্তি নবীনতর 'শেষ রক্ষা' ছবিতে লভ্য। তবুও ঐতিহাসিক কারণেই পশুপতিবাবুর 'শেষরক্ষা' রবীন্দ্র তথা বাংলা চলচ্চিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেয়ে আসছে—আসবেও। কিন্তু কবির উপলব্ধির কাছাকাছি পৌঁছে দুঃসাহসিক প্রয়াসে মধু বসু যখন সর্বাধিক আলোচিত ও অভিনন্দিত উপন্যাস 'শেষের কবিতা' নিয়ে ছবি করেন, তখন অপার বিস্ময়ের উদ্রেক না হয়ে পারে না। ১৯৫৩ সালে মধুবাবু ছবিটি নির্মাণ করেন। আঙ্গিক ও চলচ্চিত্রগত বিশিষ্টতা ছাড়াও ছবিটির কাব্যময়তা ও লিরিকাল মেজাজ

৫. কৃতজ্ঞতা : চলচ্চিত্রের স্রষ্টারা (২) রজত রায়ের গ্রন্থ, পৃঃ ২০৬-২০৭

অনায়াসে বিদগ্ধ দর্শকমণ্ডলীর প্রশংসা পেয়ে যায়। লাবণ্য ও অমিতের চরিত্রায়ণ আধুনিকতম অভিনয়শৈলীর পরিবাহী—উচ্চশিক্ষিত উচ্চবিত্ত সমাজের খোলস ছিঁড়ে বেরিরে আসা মহৎ প্রেম এখানে ত্যাগের সমীকরণে মহীয়ান।

দেবকী বসু একজন প্রতিভাধর পরিচালক। রবীন্দ্রকবিতা অবলম্বনে তিনটি ছোট ছোট ছবি তৈরী করে তিনি তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় রেখেছিলেন ১৯৬১ সালে 'অর্ঘ্য'র মাধ্যমে। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রদ্ধার্ঘ 'অর্ঘ্য' ছবিটি আসলে কবির তিনটি কালজয়ী কবিতার চিত্ররূপ ঃ অভিসার, পূজারিণী ও বিসর্জন। অভিনবত্ব তো' ছিলই, দেবকী বসুর চিত্রভাষা-র ব্যবহার, প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি, মূল কাহিনীর প্রতি আনুগত্য এবং পরিমিতিবোধ উত্তরকালের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। নীতীন বসু আরেক-জন উল্লেখ্য চলচ্চিত্রকার যিনি রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান' ও 'যোগাযোগ' উপন্যাস অবলম্বনে ছবি করেছিলেন। প্রথমটি জনপ্রিয় না হলেও দ্বিতীয়টি জনসমাদর-লাভে সমর্থ হয়েছিল, যদিও 'যোগাযোগে'র জটিল বিষয় চলচ্চিত্রে বিধৃত করে জনসমাদর অর্জন করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বরং নীতীনের 'মিলন'—'নৌকাডুবি'র হিন্দীরূপ সেদিক থেকে দারুণ সফল ছিল। কাহিনীর সহজ আবেদন ও সুপরিচালনা ছবিটিকে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছিল।

উল্লেখযোগ্য অন্যান্য পরিচালক যাঁরা রবীন্দ্রকাহিনী নিয়ে ছবি করেছেন তাঁদের মধ্যে পার্থপ্রতিম চৌধুরী 'শুভা ও দেবতার গ্রাস' ছবিটির জন্য সুধীজনের প্রশংসা পেয়েছেন। দু'টি ভিন্নধর্মী কাহিনীর থীমগত আন্তর্সমতা উপস্থাপনায় শ্রীচৌধুরী যথেষ্ট সফল—মেলোড্রামার হাত থেকে বাঁচিয়ে সন্তর্পণে সৃষ্টকর্মটিকে সাজিয়ে তুলেছিলেন। ছবিটির চিত্রধর্মিতা ও প্রয়োগকুশলতা উল্লেখনীয়। সঙ্গীত বরং ছবিটির খানিক ক্ষতি করেছে, ভি, বালসারার উচ্চগ্রাম আবহ ছবিটির নিটোল ফ্রেমিং-য়ের সঙ্গে বেমানান ঠেকেছে।

আমরা একটু খতিয়ে দেখলে বুঝতে পারব, চলচ্চিত্র-কাহিনী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের গল্প-কবিতা-উপন্যাস অন্তত তিনজন বিশ্বমানের ভারতীয় পরি-চালককে প্রেরণা দিয়েছে। অবশ্যই প্রথম নামটি সত্যজিৎ রায়ের, যাঁর রবীন্দ্র চলচ্চিত্রায়ণ প্রায়শ বিতর্কের সূচনা করেছে। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছিল 'তিন কন্যা' ছবির মধ্য দিয়ে। পোষ্টমাষ্টার, মণিহারা ও সমাপ্তি—তিনটি অনবদ্য ছোট গল্পের চারিত্রিক সমধর্মিতা সত্যজিৎকে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রে রূপান্তরের প্রেরণা দিয়েছিল। সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের ডাইমেনশনে

যে নিরাপদ ও ঈপ্সিত দূরত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সত্যজিতে এসে তা' বাস্তবায়িত। 'তিন কন্যা' ছবি থেকে সত্যজিৎ সঙ্গীত পরিচালনা করতে শুরু করেন এবং এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে বেছে নেওয়ার পরিকল্পনায় তিনি অসফল নন। ধ্বনি, আবহ ও শাব্দিক অনুষঙ্গের পরিমিত ব্যবহারে সত্যজিৎ আবহ-সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও জন্ম দিলেন এক নতুন আবহ-ভাষার, যার সমতুলনা পরে তাঁর ছবিতেও দুর্লভ। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পের নানান ক্ষেত্রে তাঁর অপ্রতিহত দক্ষতা সত্যজিতের চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বটি গড়ে তুলেছে। ইতালী ও ফরাসী চলচ্চিত্র-কারদের প্রাগ্রসর টেকনিকের সঙ্গে তাঁর গভীর মননশীলতা তাই সৃষ্টি করে উঠতে পারে 'চারুলতা' ছবির, রবীন্দ্রনাথের বড় গল্প 'নষ্টনীড়' যার ভিত্তিভূমি। তিনি অন্য অনেকের মত শুধু বোঝা বয়ে চলেন না, তাই নিজের কিছুও থেকে যায় অনিবার্যভাবে, দুই স্রষ্টার চিন্তার সমীকরণে জন্ম নেয় মহৎ আরেক সৃষ্টি, আর চলচ্চিত্র মাধ্যমটিই তো তাই, দৃশ্য ও শ্রাব্য নানান্ টেকনিকের সুষম প্রয়োগ ঘটিয়ে অনায়াসে মুদ্রিত অক্ষরের চেয়ে আমাদের মনে রেখাপাত করে বেশি। শিল্পী তথা স্রষ্টাকে স্বাধীনতা দিতে হয়—কুজিনেৎসেভ এমনতরো স্বাধীনতা নিয়েছিলেন সেই কবে—যখন তিনি 'হ্যামলেট', 'কিং লীয়র'-এর মত বিশ্বপ্রিয় নাট্যকাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ করেছিলেন। ঋত্বিক ঘটক সরাসরিই বলেছেন, শেক্সপীয়রের নাট্যকাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণে সোভিয়েত পরিচালকদের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি। কোনও মহৎ সৃষ্টির ইন্টারপ্রিটেশনই দেশ-কালভেদে অভিন্ন নয়। বৃটিশ চিন্তাধারায় কৌলীন্যের যে অহংকার, শেক্সপীয়র চলচ্চিত্রায়ণেও তার খামতি পড়ে না। তাই সাধারণেরা থেকে যান অগোচরে—রাজ-রাজড়ার ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, স্বার্থ হিংসাদ্বেষ প্রেমই মুখ্য প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে। কুজিনেৎ-সেভরা তা করেন না—তাই লীয়রের শুরুতে অসংখ্য পদচিহ্ন পর্দা জুড়ে এগোয়, শাসককুলের সংকট যে জনজীবনেও অনিবার্য বিপর্যয় ডেকে আনে, অস্তিত্বের সংকট তখন তাদের বিপথগামী করে তুলতে পারে; আবার সত্য এটাই, তা তাদের বৃহৎ সংগ্রামের দিকেও নিয়ে যেতে পারে।

সত্যজিৎ এক অর্থে সে গৌরবময় ধারার অনুসারী। সাহিত্য ও চলচ্চিত্র যেহেতু ভিন্নতর শিল্পমাধ্যম, তখন ইন্টারপ্রিটেশনের পরিমিত স্বাধীনতা থাকা উচিত। মহৎ শিল্পস্রষ্টামাত্রেই গৌরবসমন্বিত এবং পরিমিতিবোধের অধিকারী, সত্যজিৎ তার ব্যতিক্রম নন। 'চারুলতা'য় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মননশীল গভীরতা শেষ দৃশ্যটিতেই বিধৃত। 'নষ্টনীড়' গল্পের শেষে চারুকে ভূপতি

মহীশূরে বেড়াতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছেন। চারু প্রত্যাখ্যান করছেন ঃ 'না থাক্।' এই দু'টি শব্দেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, চিত্রকাব্যে সত্যজিৎ তা' ফুটিয়ে তুলেছেন ফ্রীজ শটের মাধ্যমে—চারু ভূপতির হাতে হাত মিলল না। সত্যজিতের নিজের ভাষায়, 'আজকের মত ঘর ভেঙে গেছে, বিশ্বাস ভেঙে গেছে, ছেলেমানুষী কল্পনার জগৎ থেকে রূঢ় বাস্তবের জগতে নেমে এসেছে দু'জনেই। এটাই বড় কথা। এটাই 'নষ্ট নীড়ে'র থীম।' বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা পরিচালকের সম্মান সত্যজিৎ আবার অর্জন করলেন এ ছবির মাধ্যমে। 'ছবিটি জীবনের প্রতিরূপ। সেই জাতির রুচি, স্নিগ্ধতা, আন্তরিক হৃদ্যতা ও শোভনতার ছবি' বলেছিলেন এরিখ শর্টার, 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকার খ্যাতনামা চিত্রসমালোচক। সত্যজিৎ স্বয়ং তাঁর স্বাধীনতা নেওয়ার বিতর্কে যোগ দিয়ে বলেছিলেন, অত্যন্ত আন্তরিক প্রত্যয়ে 'If I were to make it again, I would do it just the same.' বৈয়াকরণিকের নিক্তিমাপা বিচার শিল্পসৃষ্টির জন্য নয়। শেষবিচারে, রসোত্তীর্ণতা তার মানদণ্ড। সে অর্থে 'ঘরে বাইরে' ছবিতে সত্যজিৎ তেমন স্বাধীন হয়ে ওঠেন নি। 'One of my most serious films. অনেকদিন পর একটা খাঁটি ট্র্যাজেডি করা গেল, অমোঘ ট্র্যাজেডি'—ছবিটি সম্পর্কে স্রষ্টার অভিমতেই প্রত্যক্ষ হয়ে রয়েছে বিষয়টির প্রতি তাঁর আনুগত্য। 'ঘরে-বাইরে' লন্ডনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে, 'ম্যাজেস্টিক ফিল্ম,' 'ইনটেলিজেন্ট চেম্বর মুভি', 'ফ্যাসিনেটিং পিস্ অভ্ ক্লাসিকাল এন্ড হিউম্যানিস্ট্ সিনেমা' ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত ছবিটি কিন্তু স্বদেশে পুনরপি বিতর্কের ঝড় তুলেছে। হয়ত এটা জাতির সাংস্কৃতিক চেতনার লক্ষণ। সন্দীপ-বিমলা-নিখিলেশ-এর জটিল মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক জীবনবাদ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ—ঐতিহাসিক এমন পটভূমিটি সত্যজিৎ অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারেন। এ ছবিতে যা প্রশ্নের আকার নেয় তা হচ্ছে, প্রেমকাহিনী ও রাজনৈতিক উপন্যাসের যুগ্ম-মিশ্রণে ছবিটির যে ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছে—কোন্‌টির তাতে প্রাধান্য পাওয়া উচিত ছিল ? ভারসাম্য রাখার চেষ্টা ছবিটিকে অনাবশ্যক শ্লথ করেছে। বৃটিশ রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের চিত্রণে পরিচালকের পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন ছবিটিকে ভারাক্রান্ত করত এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। এই প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসটিকে ঘিরেও ছিল। সন্দীপের মত আপাত দেশপ্রেমিক লড়াকু যুবকের স্খলন দেখিয়ে পরিচালক সুস্থ নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন কি না সে নিয়েও

বিতর্ক আছে। এটা ঠিকই, সত্যজিতের 'ঘরে-বাইরে' ছবি নিয়ে আমাদের প্রত্যাশা খানিক বেশি ছিল। সত্যজিতের তৎকালীন মারাত্মক অসুস্থতা হয়ত সেই অপূর্ণতার উৎস। ছবিটি বার্লিনের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত হলেও পুরস্কৃত হয় নি।

রবীন্দ্রকাহিনী নিয়ে তিনটি ছবি করেছেন তপন সিংহ। 'কাবুলিওয়ালা' বিশ্বপিতৃহৃদয়ের মর্মবাণী তুলে ধরেছে। তপনবাবু ছবিতে নিটোল গল্প বলতে ভালবাসেন। নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টি, কিছু গান, কিছু সিনেমাটিক প্রয়োগকুশলতা—এ সব মিলিয়ে তাঁর কিছু ছবি বিশ্বমানের কাছাকাছি, এতে কোন সন্দেহ নেই, 'কাবুলিওয়ালা'য় রবিশংকর সেরা সংগীত পরিচালকের মুকুটটি অর্জন করেছিলেন ১৯৫৬ সালে। ছবি বিশ্বাস অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন মুখ্য ভূমিকায়। 'ক্ষুধিত পাষাণ' তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি। এক নির্জন পরিত্যক্ত প্রাসাদভূমি সংগীতের অনাবিল মাধুর্যে, চিত্রকল্প তথা দৃশ্যসৌকর্যে, ক্যামেরার ভাষায় যেমন করে ছবিটির মুখ্য চরিত্র হয়ে ওঠে, তা' পরিচালকের স্বচ্ছ ও সরল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পটি নিয়ে তপনবাবু অনবদ্য একটি ছবি করেছিলেন। এখানেই তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে সংগীত পরিচালক হিসেবে, সাফল্যও আসে। নদী, আকাশ, প্রান্তর—প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মাঝে এল সেই উদাসীন সরল কিশোর। সে ধরা দেয় না কোনও কিছুতেই। তার অন্তরের টান যেন লুকিয়ে আছে সেই সব গহীন অরণ্যচ্ছায়া নদীর উজানে—রবীন্দ্রনাথের নস্টালজিয়াকে তপনবাবু আন্তরিক দক্ষতায় তুলে ধরেন ছবিতে। এটা সত্য, তপনবাবুর উনত্রিশটি শিল্পকর্মের মধ্যে রবীন্দ্রকাহিনী-নির্ভর এই তিনটি ছবি বিশেষ সমাদৃত, কি দেশে কি বিদেশে।

'স্ত্রীর পত্র' আর 'মালঞ্চ'—রবীন্দ্রকাহিনী নিয়ে পূর্ণেন্দু পত্রীর ছবি দুটি স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবি রাখে। অবশ্যই 'স্ত্রীর পত্র' পরিচালকের এ যাবৎকালের সেরা সৃষ্টি। এর দৃশ্যসজ্জা যেমন কাল নিরূপণে সহায়ক হয়েছিল, তেমনই চলচ্চিত্রের আঙ্গিক সৃষ্টি করেছিল তাঁর চিত্রীর দৃষ্টি। সংলাপে বাহুল্য নেই কিন্তু গভীরতা আছে। মৃণাল তেমনই এক নারী চরিত্র যার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পুরুষশাসিত সমাজের মুখোস খুলে দিতে চেয়েছিলেন। পূর্ণেন্দুও যথেষ্ট সফল হয়েছেন। মেল-শোভিনিজম-এর বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। এই ছবিতে অ্যানিমেশন রীতির প্রয়োগ সম্ভবত ভারতীয়

চলচ্চিত্রে নতুন ঘটনা। তুলনায় প্রবীণতর সৃষ্টি 'মালঞ্চ' খানিকটা স্টেল, যদিও পরিচালকের সংযম ও মাত্রাবোধ, পরিচ্ছন্নরীতির কোনও অভাব নেই ছবিটিতে।

খ্যাতনামা আরও যাঁরা রবীন্দ্রকাহিনী চলচ্চিত্রায়ণে অল্পবিস্তর সাফল্য লাভ করেছেন তাঁরা হলেন অজয় কর, অরুন্ধতী দেবী এবং দুটি চিত্রপরিচালকগোষ্ঠী 'অগ্রদূত' ও 'অগ্রগামী'। অজয় করের 'মাল্যদান' ছবিটি বাঙালীর কোমল হৃদয়াবেগকে আপ্লুত করে; মেলোড্রামাধর্মী ছবিটি আগাগোড়া জনমনোরঞ্জনে সফল হয় বটে কিন্তু চলচ্চিত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না বরং অরুন্ধতী দেবী 'মেঘ ও রৌদ্র' ছবিটিতে সিনেমার অনেক কাছাকাছি চলে আসেন। ব্যঞ্জনাময় দৃশ্যকল্প তথা সুরের মূর্ছনা ছবিটিতে প্রাণসঞ্চার করেছে। অগ্রগামী 'নিশীথে' ছবিটিতে বাণিজ্যিকভাবে সফল, চলচ্চিত্রের গুণাবলীও সেখানে উপস্থিত, বিশেষত রাত্রির কায়াহীন শূন্যতা আর অন্ধকারাচ্ছন্ন পটভূমি উপস্থাপনায়, ফোটোগ্রাফী এখানে মুখর হয়ে উঠেছে। 'অগ্রদূতে'র 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' সেক্ষেত্রে পুরোপুরি বাণিজ্যনির্ভর, এখানে হেয়ারস্টাইল অবিকৃত রেখে উত্তমকুমার ভৃত্যের ভূমিকায় অবলীলায় অভিনয় করে যান। তবুও শেষ দৃশ্যে যেখানে বৃদ্ধ রাইচরণ কাঁপা হাতে কপাল ঢেকে সূর্যাস্ত দেখছে, তা' আমাদের ভাল না লেগে পারে না, তার একাকীত্বের অসহায় বেদনার অংশীদার হয়ে পড়ি আমরা।

এই বাংলার আরও দু'জন বিশ্বখ্যাত পরিচালক রবীন্দ্রকাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে মনোযোগী হন নি; ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেন। মৃণাল সেন তবুও সাত রঙীলের 'ইচ্ছাপূরণ' ছবিটি করে প্রয়াসের স্বাক্ষর রেখেছেন, ঋত্বিক তাও করে যান নি, যদিও রবীন্দ্রসঙ্গীতের[৬] অসাধারণ ব্যবহারে তাঁর প্রায় সব ছবি সমৃদ্ধ। 'ইচ্ছাপূরণ' আমাদের তেমন ভাল লাগে না, কেন না মৃণালের ছবি তৈরীর তদানীন্তন জটিল দৃষ্টিকোণ গল্পটির রসমাধুর্য ও সারল্যকে বিঘ্নিত করেছে। ঋত্বিক কোনও ছবি করেন নি তাঁর আজীবন পথদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের কাহিনী কেন্দ্র করে। এটা অবশ্যই আমাদের দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনার থলিটিকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। যুগল এই সংমিশ্রণ হয়ত এনে দিত সেই সৃষ্টি, যা দেখার জন্য

৬. ফিল্মে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার অনেকেই করেছেন: প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্র বলে তা এখানে আলোচিত হল না।

উপভোগ করার জন্য, শেখার জন্য আমরা দশ মাইল হাঁটতেও রাজি আছি।

ভারতীয় ভাষায় নির্মিত রবীন্দ্রকাহিনীভিত্তিক একটি চলচ্চিত্রপঞ্জি সংযোজিত হল। তালিকাটি অবশ্যই এ কথা জানান দেবে, রবীন্দ্রনাথের কাহিনী নিয়ে যত ছবি হয়েছে, তা' বিশ্বের অন্য কোনও সাহিত্যিকের বেলায় হয় নি। তাঁর গল্প কবিতা উপন্যাস আজো সমান আবেদন রাখে, রেখেও যাবে চিরকাল, চলচ্চিত্র শিল্পের সেখানে বড় ভূমিকা আছে। সেটা হচ্ছে, রবীন্দ্রকাহিনী আপামর জনমানসে দ্রুত পেঁছে দেওয়া। বর্তমানের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সুসংহত গণমাধ্যমটির কাছে কবির ১২৫তম জন্মবর্ষে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্রকাহিনী ভিত্তিক চলচ্চিত্র তালিকা

বাংলা

	চলচ্চিত্রের নাম	পরিচালনা	নির্মাণকাল
১।	মানভঞ্জন (নির্বাক)	নরেশ মিত্র	১৯২৩
২।	বিচারক (নির্বাক)	শিশির ভাদুড়ি	১৯২৮
৩।	গিরিবালা (নির্বাক)	মধু বোস	১৯৩০
৪।	ডালিয়া (নির্বাক)	মধু বোস	১৯৩০
৪।	বিসর্জন (নির্বাক)	ওরিয়েন্ট পিকচার্স	১৯৩২
৬।	নটীর পূজা	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯৩২
৭।	নৌকাডুবি (নির্বাক)	নরেশ মিত্র	১৯৩২
৮।	চিরকুমার সভা (নির্বাক)	প্রেমাংকুর আতর্থী	১৯৩২
৯।	গোরা	নরেশ মিত্র	১৯৩৮
১০।	চোখের বালি	সতু সেন	১৯৩৮
১১।	শোধবোধ	সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়	১৯৩৯-৪০ ?
১২।	শেষ রক্ষা	পশুপতি চট্টোপাধ্যায়	১৯৪৪
১৩।	নৌকাডুবি	নীতিন বসু	১৯৪৭
১৪।	দৃষ্টিদান	নীতিন বসু	১৯৪৮
১৫।	শেষের কবিতা	মধু বোস	১৯৫৩

১৬।	মালঞ্চ	প্রফুল্ল রায়	১৯৫৩
১৭।	বউ ঠাকুরাণীর হাট	নরেশ মিত্র	১৯৫৩
১৮।	চিত্রাঙ্গদা	হেমচন্দ্র চন্দ্র ও সৌরেন সেন	১৯৫৫
১৯।	চিরকুমার সভা	দেবকী বসু	১৯৫৬
২০।	যোগাযোগ	নীতিন বসু	১৯৫৭